

অনুবাদ

অতল পৃথিবী

অনীশ দাস অপু সম্পাদিত

অনুবাদ

অতল পৃথিবী

সম্পাদনাঃ অনীশ দাস অপু

স্বর্ণকীট এবং *হিচ-হাইকার* পাঠকপ্রিয়তা অর্জনের ধারাবাহিকতায়
অনুবাদ গল্পপ্রিয় পাঠকদের জন্য
এবারের উপহার *অতল পৃথিবী*।
বলাবাহুল্য এ বইটিতেও বরাবরের মতই
বিশ্বসেরা লেখকদের সেরা গল্পটিই স্থান পেয়েছে।
আর জীবনধর্মী গল্পের পাশাপাশি রহস্য-রোমাঞ্চ,
হরর-সায়েন্স ফিকশন কোনও কিছুরই ঘাটতি নেই।
প্রতিটি গল্পই আপনাকে ভাবাবে, ভাল লাগবে।
আশা করছি *অতল পৃথিবী* সহজেই আপনার
অতল মনের তল স্পর্শ করতে পারবে!



সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

অনুবাদ

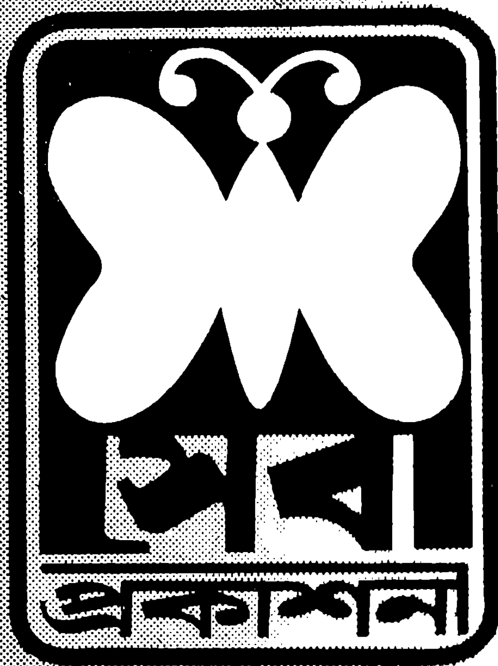
অতল পৃথিবী

অনীশ দাস অপু সম্পাদিত





সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-3242-X



তিরাশি টাকা

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ২০১৩

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

ATAL PRITHIBI
A Collection of short stories
Edited by: Anish Das Apu

সূচি

ভূমিকা

অতল পৃথিবী'র জন্য গল্প বাছাই করার ব্যাপারে কাজী শাহনূর হোসেন একদিন টেলিফোনে আমাকে অনুরোধ করেন। আমি একটা জিনিস লক্ষ করেছি, কোন বই তাঁর ভাল লেগে গেলে বা বইটি পাঠকপ্রিয়তা পেলে তিনি হলিউড ছবির মত সেগুলোর সিকুয়েল তৈরিতে উৎসাহী হয়ে ওঠেন। আর তাঁর আগ্রহ এবং উৎসাহ খুব সহজেই আমার ভেতরে সংক্রামিত হয়। আর এ কারণেই সেবা থেকে এ পর্যন্ত আমার সম্পাদিত ডজনখানেক হরর বই বেরিয়েছে, অনুবাদ সংকলনও এ নিয়ে বেরুল তিনটে। *অতল পৃথিবী*ও পাঠক হৃদয় জয় করতে পারলে যে ভবিষ্যতে এ ধরনের আরও কয়েকটি বই আসবে তা বলাবাহুল্য। অবশ্য পাঠকদের মুগ্ধ করার মত চমৎকার চমৎকার সব গল্পের কোনই অভাব নেই এ সংকলনটিতে। আশা করা যায় *স্বর্ণকীট* এবং *হিচ-হাইকার*-এর মত *অতল পৃথিবী*ও সহজেই পাঠকদের অতল মনের তল স্পর্শ করতে পারবে!

এ বইতে যেসব লেখকের লেখা বাছাই করা হয়েছে, স্ব স্ব ক্ষেত্রে তাঁরা প্রায় সকলেই জগদ্বিখ্যাত। দু'একজন লেখক আমাদের পাঠকদের কাছে অচেনা মনে হলেও তাঁদের গল্পগুলো বিশ্বখ্যাত লেখকদের লেখার চেয়ে গুণে-মানে কোন অংশেই কম নয়! প্রসঙ্গত জি.ডি খোসলার *সোহ্নী শাহ যখন রেগে যায়* কিংবা জেসি কুভরিয়ার-এর *দাগী আসামী* অথবা এরানদো তাজেশ-এর *শুধুই...* ফেনা গল্পগুলোর কথা উল্লেখ করা যায়। তিনটি গল্পই আমার কাছে মনে হয়েছে অসাধারণ। পাঠকদেরও ভাল লাগবে বলেই আশা করি।

ব্রিটিশ কবি লর্ড আলফ্রেড টেনিসন কবি এবং নাট্যকার হিসেবেই বিখ্যাত ছিলেন বলে জানতাম। তিনি যে একজন দারুণ গল্পকারও—এ পরিচয়টি জানা ছিল না। তাঁর *এনোক আর্ডেন* পড়ে রীতিমত অভিভূত আমি। অনুবাদক মোঃ জার্জিস আলীকে ধন্যবাদ দিতেই হয় এই চমৎকার গল্পটি অনুবাদ করার জন্য। আর ধন্যবাদ দেব লেখক কাজী শাহনূর হোসেনকে যিনি গল্পটি আমাকে পড়ার জন্য অনুরোধ না করলে আমি হয়তো পড়তাম না! কারণ *অতল পৃথিবী*'র জন্য সমস্ত গল্পই যখন নির্বাচন করা হয়ে গেছে সে সময় আমার হাতে আসে *এনোক আর্ডেন*। আমি একজন বিখ্যাত লেখকের লেখা বাদ দিয়ে সেখানে সসম্মানে জায়গা করে

দিয়েছি কবি সাহেবকে।

আমি ফিকশন পড়ে হাসতে এবং কাঁদতে পছন্দ করি। আর আমার চোখে জল এনে দিয়েছে গী *দ্য মোপাসাঁ*'র *চার্লির বুড়ো ঘোড়া* এবং সাদাত হাসান মান্টোর *পাগল বিনিময়*। পাঠক, উর্দু সাহিত্যের অন্যতম কথা সাহিত্যিক মান্টো তাঁর মাত্র বিয়াল্লিশ বছরের জীবনে শতাধিক যে ছোট গল্প রচনা করে গেছেন তার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত গল্পটি হলো দেশ বিভাগ নিয়ে *পাগল বিনিময়।* পড়ুন, খুব ভাল লাগবে।

আমি চাই একটি লেখা পড়া শেষে পাঠকের মাঝে নানা অনুভূতি খেলা করবে। কখনও তিনি মুগ্ধ হবেন, কখনও বিমোহিত, আবার কখনও বা চমকিত। আর যেসব গল্প আমাকে এ অনুভূতিগুলো দ্বারা সিঞ্চিত করেছে সেসব গল্পই এ সংকলনে স্থান পেয়েছে। আপনারা চমকে যাবেন জুল ভার্নের টাইটেল গল্পটি পড়ে, দারুণ চমক খাবেন ও' হেনরী'র '*বিশ বছর পর*'-এর উপসংহারে, রোমাঞ্চ জাগাবে হেলেন নেলসন-এর *সাক্ষী*, উইলিয়াম এফ নোলান-এর হরর সায়েন্স ফিকশন *ওরা* কিংবা আগাথা ক্রিস্টির *ভয়*। আইজাক আসিমভের *হারানো রোবট* যে আপনাদের খুবই চমৎকার লাগবে তা গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি। খুশবন্ত সিং-এর *বিষ্ণুর চিহ্ন* নিশ্চয় আপনাদেরকে মুগ্ধ করবে। আর স্যর আর্থার কোনান ডয়েল এবং আলফ্রেড হিচককের রহস্য গল্প দু'টির কথা না-ইবা উল্লেখ করলাম। আসলে বইটির সবগুলো গল্পই এত চমৎকার, পড়া শেষে তৃপ্তির ঢেকুর তুলবেন, সন্দেহ নেই!

ও, হ্যাঁ, একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। বিশ্বখ্যাত অ্যাডভেঞ্চার-থ্রিলার ও হরর লেখক ডেনিস হুইটলির বই অনুবাদের কাজটি শুরু করে দিয়েছি। তাঁর বেস্টসেলার অ্যাডভেঞ্চার উপন্যাস *দ্য ফেবুলাস ভ্যালি* অবলম্বনে *রত্ন উপত্যকা* প্রথমে আসবে। তারপর আপনারা পাবেন হুইটলির বিশ্ব কাঁপানো হরর উপন্যাস–*দ্য ডেভিল রাইডস আউট*। পরবর্তীতে যে বইগুলো পাবেন তা ক্রমান্বয়ে জানিয়ে দেয়া হবে। তবে আপনাদের আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। কারণ আমার হরর কাহিনি *অশুভ কুয়াশা* ও *ভ্যাম্পায়ার স্টোরিজ* বই দুটি এ মুহূর্তে সেবা'র পাইপ লাইনে রয়েছে। এ দু'টি বই প্রকাশ হওয়ার পরে ডেনিস হুইটলির উল্লিখিত বই দুটো পাবেন, কথা দিচ্ছি! ভাল থাকুন সকলে।

অনীশ দাস অপু

এনোক আর্ডেন

লেখক পরিচিতি

লর্ড আলফ্রেড টেনিসন ১৮০৯ সালে ইংল্যাণ্ডের লিংকনশায়ারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রিনিটি কলেজ থেকে শিক্ষাজীবন শেষ করেন। ১৮২৯ সালে তাঁর কাব্যচর্চা শুরু হয়। পরবর্তীতে তিনি কবি, নাট্যকার ও দার্শনিক হিসাবে খ্যাতির উচ্চশিখরে আরোহণ করেন। তিনি আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ও প্রখর বুদ্ধিমত্তার অধিকারী ছিলেন।

তিনি প্রথম দিকে গীতিকাব্য লেখা শুরু করেন। পরবর্তীতে বিভিন্নমুখী কবিতা, কাব্য-মহাকাব্য ও নাটক রচনা করেন। তাঁর কাব্য গ্রন্থের মধ্যে– The princess, In Memoriam, Maud, Idylls of The King, Enoch Arden, ulysses, The Lady of Shallot, The palace of Art প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। নাটকের মধ্যে–Queen Mary, Harold, Becket উল্লেখযোগ্য।

১৮৮৪ সালে তিনি House of Lords-এর সভ্য মনোনীত হন। তাঁকে Baron Tennyson of Fresh water and Aldsworth খেতাবে ভূষিত করা হয়।

১৮৯২ সালের ৬ অক্টোবর এই মহাকবি মৃত্যুবরণ করেন।

এক

সাগরের দীর্ঘপাড় ভেঙে ভেঙে বিশাল গহ্বর সৃষ্টি হয়েছে। আর গহ্বরে জমা হয়েছে ঢেউয়ের ফেনা আর হলুদ বালি। সাগর

সৈকত থেকে কিছু দূরে পোতাশ্রয়। জেটির উপর লাল ছাদ। সাগরের বিশাল বিশাল ঢেউ আছড়ে পড়ছে সাগর সৈকতে। বন্দর থেকে একটি লম্বা রাস্তা উঠে এসেছে। সেই রাস্তা শহরের উপর দিয়ে উপরে পাহাড়ের দিকে চলে গেছে। রাস্তার উপরে উঁচু টাওয়ার যুক্ত বিশাল আকৃতির উইণ্ডমিল। মিলের ওপাশ থেকে একটা উঁচু পাহাড় আকাশে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে একটি প্রাচীন গির্জা। তারপর বিশাল হিজল বন। হেমন্তকালে হিজল গাছের ফল ঝরে পড়ে। তারপর বসন্তের আগমনে গাছগুলো আবার সবুজ কচি পাতায় ভরে ওঠে। বনের দিকে চোখ পড়লে মনে হয়, পাহাড়ের কোলে সবুজ বেষ্টনি ঘিরে রেখেছে।

আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে এই সাগর সৈকতে তিনটি পরিবারের তিনটি ছেলে মেয়ে একসাথে খেলাধুলা করত। এনি লি; এই শহরের সবচেয়ে সুন্দরী বালিকা। ফিলিপ রয়; মিলমালিকের একমাত্র পুত্র। এনোক আর্ডেন; একজন মৃত নাবিকের একমাত্র পুত্র। সাগর থেকে ভেসে আসা বোতল, বিয়ার ক্যান, ছেঁড়া জাল, ভাঙা তক্তা, ভাঙা নোঙর, দড়ি-দড়া, এসব জিনিস ছিল তাদের খেলার সামগ্রী। এসব জিনিস দিয়ে তারা ঘর-বাড়ি বানাত; সাগরের বিশাল ঢেউ এসে সে সব ঘর-বাড়ি ভেঙে দিয়ে যেত; ওরা তিনজন এসব দেখত আর আনন্দ উপভোগ করত।

খাড়া পাড়ের নীচে একটি বিশাল গুহা। এর মধ্যে ছেলে-মেয়ে তিনটি জাহাজের ভাঙাচোরা তক্তা, রশি, জাল ও অন্যান্য জিনিস একত্রিত করে একটি বাড়ি তৈরি করত। একদিন বাড়ির মালিক হত এনোক আর্ডেন; পরের দিন হত ফিলিপ; আর এনি প্রতিদিন হত গৃহকর্ত্রী। একবার এনোক সাতদিন ধরেই গৃহকর্তা সাজল। সে বলল, ‘এবাড়ি আমার। আর এনি আমার ছোট্ট বউ।’

'আমারও বাড়ি!' ফিলিপ প্রতিবাদ করে উঠল, 'তুই সরে যা! এবার আমার পালা।'

কিন্তু এনোক গায়ের জোরে সেদিনও কর্তা হলো। ফিলিপের সুন্দর নীল চোখ বেয়ে অশ্রু ধারা গড়িয়ে পড়ল। সে চেঁচিয়ে বলল, 'এনোক, আমি তোকে ঘৃণা করি!'

ফিলিপের কান্না দেখে এনি ছুটে এল। সে ফিলিপের দুহাত জড়িয়ে ধরল। আবেগভরা গলায় বলল, 'আমার জন্য তোরা দুজন ঝগড়া করিস নে, ভাই! আমি তোদের দুজনের বন্ধু। আমি পালাক্রমে দুজনেরই বউ সাজব।' তারপর দুজনার ঝগড়া বিবাদ মিটিয়ে দিল।

দুই

তারপর প্রায় এক যুগ কেটে গেছে। সোনালি কৈশোরের সে সব মধুময় দিনগুলোর কথা এখন শুধুই স্মৃতি। সেদিনের সেই তিনটি কিশোর-কিশোরী এখন যৌবনে পদার্পণ করেছে। এনি লি প্রস্ফুটিত গোলাপের মত পূর্ণ যুবতী; সে আগের চেয়ে আরও দীর্ঘাঙ্গী ও সুন্দরী হয়েছে। ফিলিপ রয় পূর্ণ যুবক; তার নীল চোখ ও গোলাপী মুখ; দেখতে খুব সুদর্শন। এনোক আর্ডেন দেখতে তার বাবার মত হয়েছে। দীর্ঘদেহী; পেশীবহুল বলিষ্ঠ শরীর; সব মিলিয়ে পৌরুষদীপ্ত শক্তিশালী যুবক।

এনোক ও ফিলিপ দুজনই এনিকে ভালবাসত। দুজনের হৃদয়ের মণিকোঠায় এনির সুন্দর মুখচ্ছবি ছাপা হয়েছিল। এনোক প্রথমে তার ভালবাসার কথা এনিকে জানাল। কিন্তু ফিলিপ ভালবাসত নীরবে। চিরলাজুক ফিলিপ কোনওদিন তার মনের কথা এনিকে জানাতে পারল না। অন্যদিকে এনির–এনোক ও

ফিলিপ–দুজনের প্রতিই ছিল গভীর মমতা। সত্যি বলতে কী, এনোকের চেয়ে ফিলিপের প্রতিই তার অনুরাগ ছিল বেশি। কিন্তু তা সত্ত্বেও, সে এনোক আর্ডেনকেই ভালবাসল।

এনোক আর্ডেন ভাবল: ঢের হয়েছে; আর সমুদ্র মন্থন নয়। এবার সংসারী হতে হবে। তার আগে প্রয়োজন একটি বাড়ি। আর সেজন্য অনেক অর্থ দরকার।

সে এক ধনী সওদাগরের জাহাজে নাবিকের চাকরি জোগাড় করল। বছর খানেক বাদে ফিরে এল। এবার সে বাড়ি তৈরির কাজে মনোযোগ দিল। মাস ছয়েকের মধ্যে তার বাড়ি তৈরি সম্পন্ন হলো। সে একটা বড় নৌকা কিনল। তারপর কিনল একটি সাদা ঘোড়া। একজন বোটম্যান হিসাবে খ্যাতি ছিল; একজন অশ্বচালক হিসাবে খ্যাতি ছিল আরও বেশি। শহরের সব মানুষের দৃষ্টি এনোক আর্ডেনের দিকে। সব মানুষ তাকে ভালবাসে; তাকে নিয়ে গর্ববোধ করে। সবার মুখে একটি নাম: নাবিক এনোক আর্ডেন! দীর্ঘদেহী বলিষ্ঠ মানুষটি যখন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায়, সবাই সপ্রশংস দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থাকে। বন্ধুরা অভিবাদন জানায়: 'হাই, এনোক আর্ডেন!'

হেমন্তকালের এক মনোরম সন্ধ্যায় যুবক যুবতীরা সবাই জড় হলো হিজল বনের ধারে। সবাই মেতে উঠেছে বিবাহ উৎসবে। বিয়ের জন্য একটি উঁচু বেদী তৈরি করা হয়েছে। এনোক আর্ডেন ও এনি লি হাতে হাত ধরে বেদীর উপর বসে আছে। চারদিকে মশাল ও মোমবাতি জ্বলছে। সে আলোয় প্রেমিক-প্রেমিকার সুখী হাস্যোজ্জ্বল মুখ আলোকিত হয়ে উঠেছে। যুবক-যুবতীরা উল্লাসে ফেটে পড়েছে। কেউ বাদ্যযন্ত্র বাজাচ্ছে। বাজনার তালে তালে সবাই গাইছে বিয়ের গান। ফিলিপ বনের ভিতরে দাঁড়িয়ে সব দৃশ্য লক্ষ করল। তার হৃদয়ের মাঝখানে ব্যর্থ-বেদনা আর্তনাদ করে উঠল। সে সবার অলক্ষে চুপিচুপি বাড়ি ফিরে গেল।

আর এভাবেই আনন্দ উৎসবের মধ্য দিয়ে এনোক-এনির বিয়ে সম্পন্ন হলো। আর সেই আনন্দের মধ্য দিয়েই দীর্ঘ সাতটি বছর অতিবাহিত হলো। মধুময় সাতটি বছর! সাতটি বছর অতিবাহিত হলো সুখ, সমৃদ্ধি ও পরিতৃপ্তির মধ্য দিয়ে।

তাদের দুজনের পারস্পরিক ভালবাসার মধ্যে সুখের দিনগুলো কেটে গেল। প্রথমে এল একটি কন্যা সন্তান; তারপর এল আরেকটি পুত্র সন্তান। স্ত্রী, পুত্র ও কন্যা সন্তানকে নিয়ে পরম সুখ শান্তির মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হলো সাতটি বছর।

এনোক আর্ডেন সর্বদা ব্যবসায়িক কাজে নিয়োজিত থাকত। সাগরে তার নৌকা আর স্থলপথে তার ঘোড়া এই ব্যবসার কাজে লাগত। সে ছিল শক্তিশালী ও কষ্টসহিষ্ণু। এত পরিশ্রম করেও সে বিন্দুমাত্র ক্লান্তি বোধ করত না। কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে সে বেশ উন্নতি করেছিল।

এরপর এল পরিবর্তনের পালা। বন্দর থেকে দশ মাইল উত্তরে এনোক একটি গুদাম তৈরি করেছিল। জাহাজ থেকে বিভিন্ন দ্রব্য কিনে এনে সে গুদামে রাখত। এরপর সেখান থেকে শহরের বিভিন্ন ব্যবসায়ীর দোকানে সরবরাহ করত। একদিন সে নৌকা থেকে মালামাল নামানোর কাজ তদারকি করছিল। এমন সময় হঠাৎ পা পিছলে পড়ে গেল। তার ডান পা-টা গুরুতর আঘাত পেল। লোকেরা ধরাধরি করে তাকে বাড়িতে পৌঁছে দিল। দীর্ঘ এক বছর তাকে বিছানায় শুয়ে শুয়ে কাটাতে হলো। এনি সব সময় তার সেবা-শুশ্রূষা করতে লাগল। কিন্তু এক বছর বসে থাকার ফলে ব্যবসা বাণিজ্যের অনেক ক্ষতি হলো। ঠিক এমনি সময়ে তার আরেকটি রুগ্নশিশু জন্ম নিল। একে তো সে নিজে অসুস্থ; তার উপর এই রুগ্ন শিশুটির চিকিৎসা করা তার পক্ষে বেশ দুঃসাধ্য মনে হলো।

এনোক আর্ডেন বেশ অসহায় বোধ করতে লাগল। ধর্মভীরু মানুষটি প্রায়ই বিধাতার কাছে প্রার্থনা করতে লাগল। একদিন

রাতে সে একটি স্বপ্ন দেখল তার স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েরা দুরবস্থায় পতিত হয়েছে। তাদের রুগ্ন ও অনাহারক্লিষ্ট শরীর। তার স্ত্রী ছেলেমেয়ের জন্য লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করছে। সে তখন প্রার্থনা করল, 'হে বিধাতা, তাদের এ দুরবস্থা থেকে বাঁচাও! আমার যা হয় তাই হোক, তবু এরা যেন সুখে থাকে।' এরপর তার স্বপ্ন ভেঙে গেল।

পরদিন সকালে একজন ধনী সওদাগর তার বাড়িতে এলেন। তিনি জানালেন, তাঁর জাহাজটি ইংল্যাণ্ড থেকে চীন পর্যন্ত আসা যাওয়া করবে। তিনি একজন দক্ষ নাবিকের সন্ধান করছেন। এনোক আর্ডেনকে তিনি তাঁর জাহাজে সারেঙ হিসাবে নিয়োগ দিতে চান। এনোক রাজি হয়ে গেল। সওদাগর জানালেন, কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তাঁর জাহাজ এ বন্দর থেকেই যাত্রা শুরু করবে। এনোক বেশ খুশি হলো। সে ভাবল, তার প্রার্থনা মঞ্জুর হয়েছে।

এবার সে নতুন ভাবনায় জড়িয়ে পড়ল। তার অবর্তমানে তার স্ত্রী ও ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের কী হবে? কে তাদের দেখাশুনা করবে? এনোক বিছানায় শুয়ে বিস্তারিত ভেবে চিন্তে একটি পরিকল্পনা তৈরি করল। তার সেই প্রিয় বোট–যেটিকে সে হৃদয় দিয়ে ভালবাসত–বিক্রি করতে হবে। দীর্ঘ সাতটি বছর এই বোটে চড়ে সাগরে ঘুরে বেড়িয়েছে; পেশাগত কাজে ব্যবহার করেছে; উত্তাল ঢেউয়ের মধ্যে পাড়ি জমিয়েছে এদিক সেদিক। আর তার সবচেয়ে প্রিয় সাদা ঘোড়াটি যার পিঠে চড়ে বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে বেড়িয়েছে। কখনও নিজ প্রয়োজনে, কখনও ব্যবসার কাজে ঘোড়ায় চড়ে বহু দূর-দূরান্তে ছুটে বেড়িয়েছে। সেটিও বিক্রি করতে হবে। বোট ও ঘোড়া বিক্রির সমস্ত অর্থ দিয়ে তার বাড়িতে একটি দোকান তৈরি করবে। এনি এখন থেকে দোকানে বেচা-কেনার কাজ করে সংসার চালাবে। এনোক নিশ্চিন্ত মনে জাহাজে উঠবে। তারপর তিন বছর জাহাজের চাকরি করে ফিরে আসবে। তাদের তখন সচ্ছলতা আসবে। এমনকী তারা ধনী হয়ে যাবে।

তাদের ছেলে-মেয়েরা স্কুলে যাবে এবং শিক্ষিত হবে। তখন মনের মত একটি বড় বোট তৈরি করা যাবে। সুন্দর একটি ঘোড়া কিনে ফেলবে। আর এভাবেই এনোক দৃঢ় সংকল্প করে ফেলল।

এনি তার রুগ্ন শিশুটিকে সেবা করছে। সে তার সন্তানকে স্বামীর কোলে তুলে দিল। এনোক বাচ্চাটিকে আদর করতে লাগল। তার সর্বাঙ্গে হাত বুলাতে লাগল। কিন্তু সে কিছুতেই সব কথা এনিকে খুলে বলতে পারল না। পরদিন সকালে সে এনিকে সব কথা খুলে বলল। সব কথা শুনে এনি বিষণ্ন হয়ে গেল। সে বারবার এনোককে বোঝাতে লাগল; বিদেশে না যাওয়ার জন্য অনেক অনুরোধ উপরোধ করল; চোখের জলে গাল ভাসাল। সে তার রুগ্ন শিশুর কথা এবং আর দুটি ছেলে-মেয়ের কথা বলে তাকে বারবার নিষেধ করল। তার অনেক হাতে-পায়ে ধরল। কিন্তু শত অনুরোধ ও সহস্রবার অশ্রুবর্ষণেও এনোক আর্ডেনকে দৃঢ় সংকল্প থেকে টলানো সম্ভব হলো না।

এনোক এবার দোকানের মালসামগ্রী কেনার কাজে মনোযোগী হলো। সে তার বাড়ির রাস্তার পাশের কামরাটিতে দোকান বানাল। অনেক শেলফ তৈরি করল। সব মালামাল শেলফে সাজিয়ে রাখল। কয়েকদিন যাবৎ সে একাজেই ব্যস্ত থাকল। কয়েকদিন কঠোর পরিশ্রমের পর দোকান তৈরির কাজ সম্পন্ন হলো।

এনোক আর্ডেন ছিল ধর্মভীরু মানুষ। সে তার স্ত্রী ও ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের জন্য সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করল। তারপর সে শান্তভাবে বলল, 'এনি, বিধাতার কৃপায় এবারের সমুদ্রযাত্রা আমাদের সবার জন্য মঙ্গল বয়ে আনবে। আমাদের জন্য বয়ে আনবে সুখ ও সমৃদ্ধি। তুমি তোমার মন খুশি রাখো। আমি অবশ্যই ফিরে আসব।' তার ছোট বাচ্চাটির দোলনা দোলাতে দোলাতে বলল, 'এই ছোট সুন্দর বাচ্চাটির প্রতি আমার গভীর মমতা ও ভালবাসা রইল। ঈশ্বর তার মঙ্গল করুন। আমি

বিদেশ থেকে এসে তাকে বিভিন্ন দেশের মজার গল্প শোনাব এনি, তুমি একটু প্রফুল্ল হও। মনটাকে শান্ত করো।'

এনি তার স্বামীর সব কথা শুনল। শুধুমাত্র কান দিয়েই সব কথা শুনল; কিন্তু সব কথার মর্মার্থ তার হৃদয়ে পৌঁছল কিনা বোঝা গেল না। অবশেষে সে তার স্বামীকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'ওগো স্বামী, তুমি জ্ঞানী মানুষ। তোমার বুদ্ধিমত্তা, তোমার প্রজ্ঞা আমি ভাল করেই জানি। কিন্তু আমি তোমার মুখের দিকে আর তাকাতে পারছি না। আমার হৃদয় ভেঙে খান খান হয়ে যাচ্ছে।'

'ঠিক আছে,' এনোক বলল, 'তুমি আমাকে ভাল করে দেখো। এনি, জাহাজটি যখন এ বন্দর থেকে ছাড়বে, তুমি একটি দূরবীন দিয়ে আমার দিকে তাকাবে। আমি জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে থাকব। তুমি আমাকে দেখতে পাবে।'

তারপর বিদায়ের মুহূর্তে এনোক বলল, 'এনি, আমার বউ, উৎফুল্ল হও। মন প্রশান্ত রাখো। আমার ছেলে-মেয়েদের প্রতি যত্ন নেবে। সবকিছু পরিপাটি করে রাখবে। কারণ, আমি অবশ্যই ফিরে আসব। আমার জন্য দুশ্চিন্তা কোরো না। আর যদি দুশ্চিন্তা আসেই, তবে তুমি নিজেকে বিশ্ব প্রতিপালকের উপর সমর্পণ করে দেবে। এ বিশ্বের যা কিছু আছে, সবকিছু তাঁরই নিয়ন্ত্রণে। আমি যদি তাঁর নাগালের বাইরে যেতে চাই, তবে কি তা পারব? এ সাগর তাঁরই সৃষ্টি। এ সাগর তাঁর। তিনিই এ সাগর সৃষ্টি করেছেন।'

এনোক আর্ডেন তার শক্ত বাহু দুটি স্ত্রীর কাঁধের উপর রাখল। ছেলে-মেয়েকে আদর করল। ছোট বাচ্চাটি ঘুমাচ্ছিল। এনি তুলতে গেল। এনোক বলল, 'ওকে জাগিয়ো না। ও ঘুমাচ্ছে, ঘুমাক।' শিয়রের কাছে গিয়ে আলতো ভাবে বাচ্চাটির কপালে চুমু দিল। এনি ছোট বাচ্চাটির মাথার উপর থেকে একগুচ্ছ চুল কাঁচি দিয়ে কেটে এনোকের হাতে দিল। এনোক চুলগুচ্ছ তার বুক পকেটে রেখে দিল। তারপর সে দ্রুতপায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে

গেল।

পরদিন জাহাজ বন্দর ছাড়ল। এনি তার স্বামীর কথা অনুযায়ী দূরবীন দিয়ে জাহাজের ডেকের দিকে তাকাল। হয়তো অশ্রুর প্লাবনে তার দু'চোখ ঝাপসা হয়েছিল; হয়তো তার হাত দুটি কাঁপছিল; সে কিছুই দেখতে পেল না। এনোক সে সময়ে ডেকেই দাঁড়িয়ে ছিল। জাহাজ বন্দর ত্যাগ করল। যতক্ষণ জাহাজ দেখা যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত এনি জাহাজের মাস্তুল ও পালের দিকে নির্নিমেষ চেয়ে রইল।

তিন

এনোক আর্ডেন বাড়ি থেকে বিদায়ের পর বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হয়ে গেল। স্বামী সাগরে যাওয়ার পর থেকে এনির মুখের হাসি নিভে গেছে। স্বামীর বিদায়কালীন কথাগুলো এনির মনে পড়ে। সে তাকে স্মরণ করে আর চোখের জলে বুক ভাসায়। তার ছোট বাচ্চাটি ক্রমাগত অসুস্থ হয়ে পড়তে লাগল। দোকানের বেচা-কেনা, বাচ্চাদের দেখাশুনা, সংসারের কাজকর্ম ও রুগ্ন শিশুটির যত্ন নেওয়া–সব কাজ একসঙ্গে সামলানো এনির পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে পড়ল। বিশেষত, ব্যবসার কাজটি তার জন্য সবচেয়ে জটিল ও দুঃসাধ্য মনে হতে লাগল। একে তো মেয়ে মানুষ, সে মিথ্যা কথা বলতে পারত না; তার উপর সে ছিল স্বল্পভাষিণী। কাজেই দোকানের বেচা-কেনার কাজ তার পক্ষে কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে উঠল।

তার রুগ্ন শিশুটির জন্য বেশি প্রয়োজন ছিল মায়ের সার্বক্ষণিক সান্নিধ্য ও সেবাযত্ন। দোকানের বেচা-কেনার কাজ, রান্না-বান্না ও সংসারের অন্যান্য কাজকর্ম বাচ্চাটির নিবিড় পরিচর্যার ক্ষেত্রে

অন্তরায় হয়ে উঠল। বাচ্চাটি ক্রমাগত অসুস্থ হয়ে পড়ল। মা তার সাধ্যমত চেষ্টা করল সারিয়ে তুলতে; কিন্তু খাঁচার পাখি যেমন খাঁচা ছেড়ে পালায়, ঠিক তেমনি সেই রুগ্ন শিশুটির আত্মা ইহলোক ছেড়ে পরলোকে গমন করল। তার পরদিন এনি তাকে কবরের বিছানায় শুইয়ে দিল।

এনোক আর্ডেনের সমুদ্রযাত্রার পর ফিলিপ এ পর্যন্ত এনিদের বাড়িতে যায়নি। ফিলিপ নিজের মিল ও ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত থাকত। কিন্তু সে যখন এনির ছোট বাচ্চাটির মৃত্যু সংবাদ শুনল তখন নিজেকে আর স্থির রাখতে পারল না। সে ভাবল, এ সময় এনিকে সান্ত্বনা দেওয়া কর্তব্য।

ফিলিপ যখন এনির বাড়িতে গেল তখন বাইরের ঘরটি নিস্তব্ধ ছিল। সে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করল। দরজায় করাঘাত করল। কেউ সাড়া দিল না। সে দরজা খুলে দ্বিতীয় কামরায় ঢুকল। এনি জানালার দিকে মুখ করে বসে ছিল। ফিলিপ তার মুখের দিকে তাকাল। সারা মুখখানাতে গাঢ় বেদনার ছাপ; সন্তান হারানোর বেদনা তাকে নির্বাক করে রেখেছে। সে এতটাই শোকাচ্ছন্ন ছিল যে ফিলিপের আগমন সে টেরই পেল না। কিছুক্ষণ এভাবেই কাটল। তারপর জানালার দিকে মুখ ঘুরিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। ফিলিপ সান্ত্বনার স্বরে বলল, 'এনি, আমি এসেছি তোমাকে কয়েকটি কথা বলার জন্য।' এনি কোনও জবাব দিল না। সে উদাস হয়ে বাইরের দিকে চেয়ে থাকল।

'আমি এসেছি তোমার সাথে কিছু দরকারি কথা বলার জন্য,' ফিলিপ নরম সুরে বলল। 'এনোক তোমার স্বামী। তুমি আমাদের দুজনের মধ্যে তাকেই পছন্দ করেছিলে। সে আমার চেয়ে উত্তম মানুষ। কিন্তু সে আজ জাহাজে চড়ে দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে নাবিক মানুষ; সাগরে-সাগরে ঘুরে বেড়ানো তার নেশা। কিন্তু, আজ তার একটি বাচ্চা মারা গেল; আর দুটি ছেলে-মেয়ের লেখাপড়া বন্ধ। আর তোমার এই অসহায় অবস্থার জন্য সে কি

একটুও দায়ী নয়? সে যখন ফিরে এসে দেখবে, তার ছোট বাচ্চাটি মারা গেছে, তার দুটি ছেলে-মেয়ের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গেছে, সে কি মনে কষ্ট পাবে না?

'এনি, আমি তোমার কাছে মিনতি করছি–তুমি আমাকে তোমার এই বিপদের দিনে একটু সাহায্য-সহযোগিতা করার অনুমতি দাও। তুমি জান, আমি সচ্ছল ও ধনী মানুষ। তোমাদের এই দুঃসময়ে কিছুটা উপকার করতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করব। তোমার ছেলে-মেয়ের লেখাপড়ার দায়িত্ব আমার উপর ছেড়ে দাও। আর এনোক যখন ফিরে আসবে, তখন না হয় এসব পরিশোধ করে দেবে।'

তখন এনি ফিলিপের দিকে ফিরে বলল, 'আমি কীভাবে তোমার দিকে তাকাব! আমি এতটাই ভেঙে পড়েছি–আমার দুঃখ আমাকে এতটা কাতর করে রেখেছে যে আমি তোমার সাথে স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে পারিনি। আমি এজন্য দুঃখিত। আমি তোমার মহানুভবতায় মুগ্ধ হচ্ছি। আমি চিরকৃতজ্ঞ হয়ে থাকব। তবে এনোক ফিরে এসে তোমার সব ঋণ পরিশোধ করে দেবে।'

তখন ফিলিপ বলল, 'তুমি তা হলে আমাকে অনুমতি দিচ্ছ?' এনি তার অশ্রু ভেজা চোখে ফিলিপের দিকে তাকাল। তার চোখদুটিতে নিষ্পাপ করুণাকাতর দৃষ্টি ছাড়া আর কিছু ছিল না। অবশেষে সে সম্মতিসূচক মাথা দোলাল।

এরপর ফিলিপ এনির ছেলে-মেয়েকে স্কুলে ভর্তি করে দিল। তাদের বই-খাতা সব কিনে দিল। লেখাপড়ার যাবতীয় খরচ সে বহন করতে লাগল। শহরের লোকজন যাতে কোনও জল্পনা-কল্পনা করার সুযোগ না পায়, ফিলিপ এজন্য এনির সাথে দেখা সাক্ষাৎ করত না। কোনও কিছু পাঠানোর প্রয়োজন হলে সে এনির ছেলে-মেয়েদের মাধ্যমে পাঠাত। সে প্রায়ই তার বাগানের ফলমূল, শাকসব্জী ও বিভিন্ন জাতের গোলাপ ফুল ছেলে-মেয়েদের কাছে পাঠিয়ে দিত। তার মিল থেকে আটার বস্তা ও অন্যান্য

প্রয়োজনীয় সামগ্রী কর্মচারীদের মাধ্যমে এনির বাড়িতে পাঠিয়ে দিত।

ফিলিপ কখনও এনির কাছে নিজের দুর্বলতার কথা প্রকাশ করত না। তার ভয় ছিল—এনি পাছে তার টাকা পয়সা, খাদ্য সামগ্রী ও অন্যান্য উপহার ফিরিয়ে দেয়। দৈবাৎ দেখা হলে, সে শুধু কুশল বিনিময় করত। আর এনি বিনম্রভাবে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাত।

ফিলিপ ক্রমাগত এনোক আর্ডেনের ছেলে-মেয়ে দুটির প্রিয়পাত্র হয়ে উঠল। ফিলিপের সংসারে আপন বলতে কেউ ছিল না। সে তখন পর্যন্ত বিয়ে করেনি। তার হৃদয়ে যে শূন্যতা ছিল, এনির ছেলে-মেয়ে দুটি সে শূন্যতা পূরণ করে দিল। ছেলে-মেয়ে দুটির প্রতি ছিল তার গভীর মমতা। প্রতিদিন সে ছেলে মেয়েকে দেখতে স্কুলে যেত। কী অপরিসীম সে টান! কী অজানা সে আকর্ষণ! অপর দিকে ছেলে-মেয়ে দুটি ফিলিপকে আপন করে নিল। তাদের কাছে সে ছিল পিতা-মাতার পরে সবচেয়ে আপনজন। ফিলিপকে দেখলেই তারা চেঁচিয়ে বলত, 'হাই, ফিলিপ আংকেল!' মাঝে মাঝে তারা ফিলিপের মিলে গিয়ে হাজির হত। তারা আবদারের সুরে বলত, 'আংকেল, চলো না আমরা পাহাড়ের ওদিকটায় ঘুরে আসি।' ফিলিপ সময় পেলে ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে হিজল বনের ধারে কিংবা সাগর সৈকতে বেড়াতে যেত। আর এভাবেই ক্রমাগত ফিলিপ ছেলে-মেয়ে দুটির সর্বেসর্বা হয়ে উঠল। তাদের বাবার কথা আর বেশি মনে পড়ে না। আর পড়লেও বাবার চেহারা অনেকটা ঝাপসা ও অস্পষ্ট। ফিলিপই এখন তাদের কাছে সব; তাদের একমাত্র স্বজন ও আপনজন। আর এভাবেই দশটি বছর কেটে গেল।

চার

দশ বছর আগে এনোক আর্ডেন জাহাজে চড়ে সমুদ্রযাত্রা করেছিল। তারপর দশ বছর অতিবাহিত হয়েছে। তার কোনও সংবাদ পাওয়া যায়নি। একটা চিঠি পর্যন্ত নয়। যে সব নাবিক তার সঙ্গে গিয়েছিল, তাদেরও কোনও সংবাদ পাওয়া যায়নি। বন্দরের সব মানুষের কাছে এনোক আর্ডেন একজন মৃত মানুষ ছাড়া আর কিছুই না। সব মানুষের ধারণা, এনোক আর্ডেন জাহাজডুবিতে মারা গেছে। বেঁচে থাকলে একটা খোঁজ অবশ্যই পাওয়া যেত।

হেমন্ত কালের এক বিকেলে এনির ছেলে-মেয়ে দুটি অন্যান্য মানুষের সঙ্গে হিজল বনে ফল কুড়াতে গেল। তারা তাদের মাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল। ছেলে-মেয়ে দুজন তাদের প্রিয় ফিলিপ কাকুকে সঙ্গে করে নিয়ে এল। প্রথমে ফিলিপ রাজি হয়নি। তখন ছেলেটি ধরল ফিলিপের এক হাত; মেয়েটি ধরল অন্যহাত। ফিলিপ অনেকটা নিরুপায় হয়েই ওদের সঙ্গে যেতে রাজি হলো। তবে সে যদি জানত যে এনি এসেছে ওদের সঙ্গে, তা হলে কিছুতেই সে রাজি হত না। কিন্তু অর্ধেক পথ পার হওয়ার পর এনি ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ল। সে বলল, 'না, বাপু, আমি আর হাঁটতে পারছি না। আমাকে একটু বিশ্রাম নিতে দাও।' কাজেই, ফিলিপ এনির সঙ্গে সেখানেই থেকে গেল। ছেলে-মেয়ে দুটি গেল হিজল বনের দিকে।

ফিলিপের মনে পড়ল আজ থেকে সতেরো বছর আগের সেই দিনটির কথা। এই হিজল বনের ধারেই বসেছিল মেলা। সেটিও ছিল ফল কুড়ানোর মৌসুম। আর সেই আসরে এনি আর এনোক

দুইজনে বিয়ের বেদীতে বসেছিল। তার বুকের ভিতর থেকে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল। ফিলিপ এনিকে বলল, 'এনি, তুমি কি ক্লান্ত বোধ করছ?'

এনি ফিলিপের দিকে তাকাল; কিন্তু সে কোনও জবাব দিল না। ফিলিপ এবার সোজাসুজি তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আজ তোমাকে একটি সত্যি কথা বলব। এনোকের জাহাজটি অনেক বছর আগে ডুবে গিয়েছিল। অন্যান্য নাবিকের সাথে এনোক সেই জাহাজডুবিতে মারা গিয়েছিল। আমি অনেক আগেই এ খবর পেয়েছিলাম। কিন্তু আমি এ দুঃসংবাদ তোমাকে দিতে পারিনি। কারণ, আমি জানতাম, তুমি এ শোক সামলাতে পারবে না। তা ছাড়া তোমার ছেলে-মেয়ের কথা ভেবেও বলিনি এতদিন।

'এনি, তুমিই বল—আর কতদিন এভাবে থাকবে? এনি, আমার মনে একটি স্বপ্ন বাসা বেঁধে আছে। আমি শুধু তোমার প্রতীক্ষায় ছিলাম। আজ তোমাকে সব কথা বলব। আমি ছোটবেলা থেকেই তোমাকে ভালবেসে এসেছি। কিন্তু কখনও তা প্রকাশ করিনি। কারণ তুমি এনোককে ভালবেসে বিয়ে করলে। আর দেখো, আমি আজও বিয়ে করিনি। শুধু তোমার জন্য।

'আজ দশ বছর হয়ে গেল। এনোক কি আবার ফিরে আসবে? ফিরে আসার কোনও সম্ভাবনাই নেই। তার চেয়ে এসো, আমরা দুজন বিয়ে করে ফেলি।

'আমি তোমার ছেলে-মেয়েকে খুবই ভালবাসি। আমার বিশ্বাস, ওরা আমাকে ওদের বাবার মতই ভালবাসে। আমি তোমাকে আমার হৃদয় দিয়ে ভালবাসব। আমার এ সংসারে আপন বলতে কেউ নেই। তোমরাই আমার একান্ত আপনজন। তা ছাড়া, আমি তোমাকে সেই ছোটবেলা থেকে ভালবেসে এসেছি।'

এনি এবার বেশ শান্ত গলায় বলল, 'তুমি আমাদের বাড়িতে এসেছিলে মহান সৃষ্টিকর্তার একজন ফেরেশতা হিসেবে। ঈশ্বর

তোমার মঙ্গল করুন। তিনি তোমাকে আমাদের উপকারের জন্য ন্যায্য পুরস্কার দান করবেন। ফিলিপ, তুমিই বলো, একটি মেয়ে কি এক জীবনে দুজন পুরুষকে ভালবাসতে পারে? আমি তো এনোককেই ভালবেসেছি। তুমি এসব কী বলছ? এনোক যদি ফিরে আসে, আমি তখন কী করব? তুমি আমাকে আর একটি বছর সময় দাও। আমি এক বছর অপেক্ষা করে দেখি, সে ফিরে আসে কিনা। তারপর আমি সম্মতি দেব।'

'ওহ্, এক বছর অপেক্ষা!' ফিলিপ ব্যথিত গলায় বলল। 'ঠিক আছে, এক বছর কেন, আমি সারাজীবন তোমার অপেক্ষায় থাকব।'

'আমি তোমাকে কথা দিলাম। আমি তোমার কাছে ওয়াদাবদ্ধ হয়ে থাকলাম। এক বছর পর তোমার ইচ্ছামত আমি চলব।'

'আমিও তোমার কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে থাকলাম।' ফিলিপ জবাব দিল।

আর এভাবেই ফিলিপ ও এনি দুজনে পরস্পরের সঙ্গে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলো। তারপর ফিলিপ এনিকে সঙ্গে নিয়ে হিজল বনের দিকে গেল। ছেলে-মেয়ে দুটি বনের ভিতর ফল কুড়াচ্ছিল। তারা দুজন ওদের সঙ্গে একত্রিত হলো। তারপর রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এনির বাড়ির দিকে রওনা হলো। কিছুক্ষণের মধ্যে বাড়িতে পৌঁছে গেল।

ফিলিপ এনির বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে এনির হাতখানা ধরে বলল, 'এনি, আমি যখন পাহাড়ের নীচে দাঁড়িয়ে তোমাকে আমার ভালবাসার কথা বলেছিলাম তখন ছিল আমাদের দুজনের একটি দুর্বল মুহূর্ত। আমি ভুল করেছি। আমি তোমার কাছে অঙ্গীকারাবদ্ধ; তবে তুমি এ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তোমার উপর জোর খাটিয়ে আমি কিছুই চাই না।' তখন এনি অশ্রুভারাক্রান্ত গলায় বলল, 'আমি তোমার বাগদত্তা। শুধু এক বছর পর আমাদের বিয়ে হবে।'

এনি বাগদত্তা হওয়ার কথা বলেছিল ক্ষণিকের এক দুর্বল মুহূর্তে। কিন্তু যখন সে সংসারের কাজের মধ্যে ডুবে গেল, তখন মনে হলো সব যেন স্বপ্নের মধ্যে ঘটে গেছে। ছেলে-মেয়েদের দেখাশুনা এবং সংসারের প্রাত্যহিক কাজকর্মের মধ্য দিয়ে কখন যে এক বছর পার হয়ে গেল, সে বুঝতেই পারল না। তার অঙ্গীকারের কথাও মনে এল না। আর এভাবেই এক হেমন্ত থেকে আরেক হেমন্ত এসে গেল। আবার হিজল বনের পাশে দুজনের সাক্ষাৎ হলো। ফিলিপ কিছু বলার আগেই এনি বলল, 'আমাকে আর এক বছর সময় দাও।' ফিলিপ কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'তোমার যখন সময় হবে, এনি, ঠিক তখনই হবে।' ফিলিপের জন্য মমতায় মনটা ভরে গেল এনির। আর এভাবেই আরও একটি বছর পার হয়ে গেল।

এদিকে শহরের লোকজনের মধ্যে কানাঘুষা চলতে লাগল। কেউ কেউ বলতে লাগল যে, ফিলিপ এনিকে প্রেমের ফাঁদে ফেলেছে। কেউ কেউ এনিকে দোষ দিল। মোটকথা, অধিকাংশ মানুষ দুজনের প্রেম কাহিনি নিয়ে কানাকানি করতে লাগল। কিন্তু ফিলিপ এবং এনির মনের কথা কেউ জানতে পারল না। তাদের সততা ও ধৈর্যের পরীক্ষা বিষয়ে কেউ কিছু জানল না।

একদিন এনি প্রায় সারারাত ঘুমাতে পারল না। সে বিধাতার কাছে বারবার প্রার্থনা করল। এখন সে কী করবে? সে বিড়বিড় করে বলল, 'আমার এনোক, তুমি কি বেঁচে আছ? নাকি সত্যি সত্যি হারিয়ে গেছ?' তারপর সেই নিশুতি রাতে গাঢ় অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইল। সে বিছানা থেকে উঠে আলো জ্বালল। তাকের উপর থেকে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ হাতে নিল। ধর্মগ্রন্থ খুলে ডান হাতের একটি আঙুল একটি পৃষ্ঠায় রাখল। তারপর দেখল তার ডান হাতের আঙুলের নীচে লেখা আছেঃ 'পাম গাছের নীচে।' সে এই বাক্যটির কোনও অর্থ বুঝতে পারল না। সে ধর্মগ্রন্থ যথাস্থানে রেখে আবার বিছানায় শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণের মধ্যে সে ঘুমিয়ে

পড়ল।

পরদিন সকালে এনি ফিলিপকে ডেকে আনল। সে অনেকটা আবেগভরা গলায় বলল, 'আমাদের দুজনের বিয়েতে বাধা কোথায়?'

'তা হলে, আমাদের কোনও বাধাই আর নেই!' ফিলিপ আনন্দ ও উত্তেজনার স্বরে বলল।

'তবে আজই হোক!' এনি সম্মতি দিল।

আর এভাবেই দুজনের বিয়ে সম্পন্ন হলো। বিয়ের পর ফিলিপ এনি ও তার ছেলে মেয়েকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেল। প্রথম দিকে এনির মনে একটি দ্বিধা, সংকোচ কাজ করছিল। একটি শংকা তার মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল। কীসের শংকা, কীসের ভয়? সে এর কোনও জবাব পেল না। বছর খানেক পর সে একটি কন্যা সন্তানের মা হলো। তার ভিতরে মাতৃত্ব জেগে উঠল। এখন সে ফিলিপের কন্যার জননী। সে পুরোপুরি ফিলিপের স্ত্রী হয়ে উঠল। এখন ফিলিপই তার সর্বেসর্বা; তার স্বামী।

পাঁচ

এতদিন কোথায় ছিল এনোক আর্ডেন? এনোকের জাহাজটি ভালমত যাত্রা শুরু করল। আবহাওয়া ছিল অনুকূল; সাগর ছিল শান্ত; জাহাজটি বন্দরে বন্দরে ঘুরে অবশেষে চীন দেশের বন্দরে পৌঁছল। বছর খানেকের মধ্যে বিভিন্ন দেশ ঘুরে আবার ইংল্যাণ্ডে ফিরে এল। এভাবে তিন বছর ধরে জাহাজটি সারা পৃথিবীর বিভিন্ন বন্দরে বন্দরে ঘুরল। এনোক আর্ডেন তিন বছরের চুক্তিতেই জাহাজে চাকরি নিয়েছিল। এবার বাড়ি ফেরার পালা।

এনোক বিভিন্ন বন্দরে নেমে ছেলে-মেয়েদের জন্য জামাকাপড় ও খেলনাসামগ্রী কেনা শুরু করল। জাহাজটি তখন চীন সাগর থেকে রওনা হয়েছে। কয়েকদিন বেশ শান্ত আবহাওয়ার মধ্যেই অতিবাহিত হলো। হঠাৎ দুর্যোগ নেমে এল। প্রথমে কালো মেঘ দেখা গেল। তারপর প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়া। সঙ্গে প্রবল বৃষ্টি। সাগরে প্রচণ্ড ঢেউ উঠল। চারদিকে ঘন অন্ধকার নেমে এল। জাহাজের পাল ছিঁড়ে গেল; মাস্তুল ভেঙে গেল। জাহাজ কোন্‌দিকে যাচ্ছে, কিছুই বোঝা গেল না। তারপর প্রচণ্ড জোরে একটা ধাক্কা। জাহাজটি ভেঙে গেল। সবার আর্তচিৎকার ভেসে এল। কে কোথায় ডুবে গেল কিছুই বোঝা গেল না। এনোক আর্ডেন এবং আরও দুজন নাবিক একটা বড় তক্তা ধরে ভেসে চলছিল। প্রচণ্ড ঢেউ তাদের এগিয়ে নিয়ে চলল। এভাবে কতক্ষণ ছিল মনে নেই। হঠাৎ তাদের পায়ের সঙ্গে মাটির স্পর্শ পেল। এখন সকাল হয়ে গেছে। চারদিকে ভোরের আলো ফুটে উঠেছে। তারা দেখল যে তারা একটি দ্বীপে এসে উঠেছে। তারা তিনজন দ্বীপটি ঘুরে ঘুরে দেখল। কোথাও কোনও জনমানুষের সাড়া পাওয়া গেল না। এটি ছিল একটি জনমানবশূন্য দ্বীপ। তবে দ্বীপটিতে প্রচুর গাছপালা ছিল। তাতে বিভিন্ন জাতের ফল। খুবই পুষ্টিকর ও সুস্বাদু ফল।

দ্বীপের একপাশে ছিল একটি খাড়া পাহাড়। তারা পাহাড়ের ঢালে নিজেদের থাকার জন্য একটি ঘর বানাল। গাছের ডাল ও লতাপাতা দিয়ে তারা এঘর তৈরি করল। গাছের ফল হলো তাদের আহার। আর নারকেল গাছ থেকে ডাব পেড়ে তৃষ্ণা নিবারণ করত। মাঝে মাঝে সাগর থেকে মাছ ধরত। সেই মাছ পুড়িয়ে খেত। পাহাড়ের একটি ঝর্না থেকে পানি সংগ্রহ করত। তিনজনের মধ্যে একজন ছিল বয়সে কনিষ্ঠ। দুর্যোগের রাতে সে প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিল। প্রায় পাঁচ বছর যাবৎ সে ভুগল। তারপর

একদিন সে চির বিদায় নিল। এখন মাত্র দুজন বেঁচে রইল।

তারা দুজন প্রতিদিন অপেক্ষা করত কোনও জাহাজ সেদিকে আসে কিনা। এভাবে অপেক্ষা করতে করতে আরও পাঁচটি বছর কেটে গেল। তাদের গায়ের জামাকাপড় ছিঁড়ে গেল। এখন তারা দুজন গাছের ছাল ও পাতা দিয়ে নিজের শরীর আবৃত করে রাখল। চুল-দাড়ি বড় বড় হয়ে গেছে। মনে হয় তারা যেন আদিম যুগের বনমানুষ।

একদিন তারা দেখল একটি বড় গাছ পড়ে আছে। তারা ভাবল গাছটাকে গড়াতে গড়াতে তাদের ঘরটার কাছে নিয়ে যাবে। এটার কাঠ দিয়ে আগুন জ্বালানো হলে, শীত নিবারণ করা যাবে। দুজন মিলে বহু কষ্টে গাছটি গড়াতে শুরু করল। নীচে একটি বড় গর্ত ছিল। হঠাৎ গাছটি সমেত তারা গর্তের ভিতর পড়ে গেল। এনোক আর্ডেন একপাশে সরে গেল। কিন্তু তার সঙ্গীটি সরার সুযোগ পেল না। গাছটি তার গায়ের উপর পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে সে মারা গেল। এরপর এনোক আর্ডেন একাকী হয়ে গেল। সে খুব নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ল। একে তো নির্জন দ্বীপ; তার উপর সম্পূর্ণ একা। হঠাৎ সে ঈশ্বর প্রদত্ত সতর্কবাণী শুনতে পেল: 'অপেক্ষা করো।'

এনোক আর্ডেন হঠাৎ দৌড়তে লাগল। তারপর পাহাড়ের উপর উঠতে লাগল। পাহাড়ের উপরে উঠে ওপাশে তাকাল। সে অবাক হয়ে দেখল ওপাশে রয়েছে সবুজ বিস্তীর্ণ প্রান্তর। কিন্তু কোনও মানুষজন চোখে পড়ল না। তার ওপাশে বিশাল সাগর। সাগরের বিশাল বড় বড় ঢেউ আছড়ে পড়ছে সৈকতে। সারাদিন সে প্রতীক্ষায় রইল; কিন্তু কোনও জাহাজের দেখা পাওয়া গেল না।

এরপর থেকে সে প্রতিদিন পাহাড়ের চুড়োয় উঠে সাগরপানে তাকিয়ে থাকত। সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত প্রতীক্ষায় থাকত। এনোকের নিজের অতীতের কথা স্মরণে এল। তার নিজের

বন্দরের সাগর সৈকত; সৈকত থেকে উঠে আসা রাস্তা; রাস্তার উপরে মিল; পাহাড়ের কোল ঘেঁষে সবুজ হিজল বন; রাস্তার পাশে তার প্রিয় বাড়ি; তার ছোট ছোট তিনটি ছেলে-মেয়ে খেলাধুলা করছে; তার স্ত্রী এনি উদাস নয়নে চেয়ে রয়েছে; গাছ থেকে ঝরে পড়ছে অনেকগুলো ঝরা পাতা আর সেগুলো স্তূপীকৃত হচ্ছে।

প্রতিদিনের মত সেদিনও এনোক আর্ডেন সাগরের পানে চেয়ে অতীত স্মৃতি রোমন্থন করছিল। সাগরের ঢেউ তার কানে অভূতপূর্ব ধ্বনি বাজিয়ে তুলছিল। তারপর ঘটল এক অদ্ভুত ঘটনা। একটি জাহাজ দ্বীপটির কাছে নোঙর করল। কয়েকজন নাবিক জাহাজ থেকে নেমে এল। তারা পাহাড়ের উপরে উঠল। আসলে তারা পানির ঝরনার খোঁজ করছিল। হঠাৎ তারা এনোক আর্ডেনকে দেখতে পেল। তারা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল।

তারা দেখল, লম্বা চুল-দাড়িওয়ালা ও গাছের লতাপাতা ও বাকল পরা একজন বনমানুষ দাঁড়িয়ে আছে। সে তখন বিড়বিড় করে কী যেন বলছিল। রোদে পোড়া বাদামী চেহারা ও লম্বা চুলদাড়িওয়ালা মানুষ দেখে তারা তাকে নির্জন দ্বীপের আদিম মানুষ মনে করল। যা হোক, সে তাদের মিঠা পানির ঝরনা দেখিয়ে দিল। জাহাজের লোকজন তার কাছে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করল। এনোক আর্ডেন তখন নিজের দুঃখের কাহিনি শোনাল। সে জানাল, সে একজন নাবিক। তার জাহাজের নাম 'Good Fortune'। সে সেই জাহাজ থেকে বেঁচে যাওয়া এক হতভাগ্য নাবিক। তার সব দুঃখের কথা শুনে তারা তার প্রতি সহানুভূতিশীল হলো। তারা তাকে নিয়ে তাদের জাহাজে উঠাল। তারা তাকে কিছু জামা-কাপড় দিল। খেতে দিল গরম খাবার।

জাহাজের ক্যাপ্টেন এনোক আর্ডেনের সব কথা শুনে তার জাহাজে করে তাকে দেশে পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিল। জাহাজটি ছিল অন্যদেশের। দীর্ঘদিন সাগর পাড়ি দিতে দিতে

প্রায় বছর খানেক পর সেটি ইংল্যাণ্ড গিয়ে পৌঁছল। সে অবশেষে নিজের বন্দরে অবতরণ করল। জাহাজের লোকজন এই দুর্ভাগ্যপীড়িত মানুষটির প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে তার সব কর ও শুল্ক পরিশোধ করে দিল। কিছু নগদ টাকা পয়সা তাকে দিয়ে দিল।

ছয়

এনোক আর্ডেন যখন নিজের বন্দরে নামল তখন কেউ তার সঙ্গে কোনও কুশল বিনিময় করল না; কেউ কোনও অভিবাদন জানাল না। সে বুঝতে পারল কেউ তাকে চিনতে পারেনি। আর চেনার কথাও নয়। দীর্ঘ বিশ বছর পর সে ফিরে এসেছে। হঠাৎ তার নিজের বাড়ির কথা মনে পড়ল। বাড়ি—কার বাড়ি—তার কি আদৌ কোনও বাড়ি ছিল?

হেমন্তকালের এক বিকেলে সে নিজের শহরে ফিরে এসেছে। পড়ন্ত বিকেলের আলোয় উদ্ভাসিত ছিল চারদিক। রাস্তার দুপাশের গাছপালা থেকে হলুদ পাতা ঝরে পড়ছিল। পাখিরা ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে বেড়াচ্ছিল আর গাছে এসে বসছিল। কিছুক্ষণ আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে। বৃষ্টির পানি গাছের পাতা থেকে ঝরে ঝরে মাটিতে পড়ছিল। রাস্তাটি ক্রমশ নিচু হতে শুরু করল। এনোক আর্ডেন রাস্তা দিয়ে হাঁটতে লাগল। তার মনে তখন অনেক আশা-দুরাশা দোলায়িত হচ্ছিল। অবশেষে সে তার বহুদিনের স্মৃতিবিজড়িত নিজের বাড়িটির সামনে গিয়ে হাজির হলো। কিন্তু সে তার বাড়িতে কোনও সাড়া শব্দ পেল না। তার ছেলে-মেয়েদের কলকণ্ঠের আওয়াজ ভেসে এল না। সে নিজে নিজেই বিড়বিড় করে বলল: ওরা সব কোথায় গেছে? ওরা বেঁচে আছে তো?

আশপাশে কোনও মানুষের দেখা পেল না। কাকে জিজ্ঞেস করবে? সে জানত না, এনোক আর্ডেন অনেক আগেই মৃত মানুষে পরিণত হয়েছে এ শহরের লোকজনের কাছে।

এনোক আর্ডেন আবার বন্দরে ফিরে গেল। সে অনেক আগে একটি বৃদ্ধ মানুষকে হোটেল চালাতে দেখেছিল। এনোক সেখানেই গেল। সেই বৃদ্ধ মানুষটি মারা গেছে। তার বিধবা স্ত্রী এখন সেই বাড়িতে হোটেল চালায়। মহিলার নাম মিরিয়াম লেন।

মিরিয়াম লেন খুবই চমৎকার ভদ্রমহিলা। মার্জিত কথাবার্তা ও সদাচরণের জন্য তার সুখ্যাতি ছিল। এনোক আর্ডেন সেই বাড়ির একটি কামরা ভাড়া নিল। দীর্ঘ সমুদ্র যাত্রার পর সে ফিরে এসেছে। শরীর অবসাদ ও ক্লান্তিতে অবসন্ন। মন হতাশাগ্রস্ত। শরীর ও মনের ক্লান্তি দূর করার জন্য পূর্ণ বিশ্রাম প্রয়োজন। শুধু খেয়ে দেয়ে ও ঘুমিয়ে কয়েকদিন কেটে গেল তার।

মিরিয়াম লেন খুব সরল প্রকৃতির মহিলা ছিল। সে মানুষের সঙ্গে গল্পগুজব করতে ভালবাসত। সে এনোক আর্ডেনকে বন্দরের অনেক মানুষের নানান ঘটনা শোনাত। এভাবেই একদিন সে এনোক আর্ডেনের পরিবারের কাহিনি তার কাছে বর্ণনা করল। দীর্ঘদিনের ব্যবধানে এনোক আর্ডেনের চেহারা অনেক বদলে গেছে। তা ছাড়া, বিভিন্ন দুর্ভোগের কারণে শরীর ক্ষীণকায় ও দুর্বল হয়ে গেছে। বার্ধক্য ও দুর্ভাগ্য তাকে নতজানু করেছে। মোট কথা সে এনোককে মোটেই চিনতে পারেনি।

সে একদিন এনোককে তার পরিবারের সব ঘটনা খুলে বলল। কীভাবে তার ছোট বাচ্চাটি মারা গেল; কীভাবে তাদের অভাবের সংসারে ফিলিপ সাহায্য করতে এল; তার ছেলে-মেয়ে দুটিকে স্কুলে পাঠানোর ব্যবস্থা করল। দীর্ঘদিন ধরে তার স্ত্রী এনিকে প্রেম নিবেদন করল; এনির ধীর সম্মতি; অবশেষে ফিলিপের সঙ্গে এনির বিয়ে। সব কথা, সব ঘটনা মিরিয়াম লেন বিস্তারিত বলল তাকে।

এনোক আর্ডেন তার পরিবারের সব কথা, সব ঘটনা পরম ধৈর্যসহকারে শুনে গেল। কোনওরকম উত্তেজনা, রাগ-বিদ্বেষ, অভিমান বা ঈর্ষা প্রকাশ পেল না তার চেহারায়। সব কাহিনি বলার পর, মিরিয়াম লেন খেদোক্তির স্বরে বলল, 'হতভাগ্য এনোক আর্ডেন! বেচারা এভাবেই চিরদিনের জন্য নিরুদ্দেশ হয়ে গেল!!'

এনোক আর্ডেন তার ঘাড় ঝাঁকিয়ে ব্যথাক্লিষ্ট স্বরে বিড়বিড় করে বলল, 'গৃহত্যাগী হয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল!'

এনোক আর্ডেনের শেষবারের মত এনির মুখখানা দেখার প্রবল বাসনা হলো। সে ভাবল, 'আমি শুধু একবার তার মুখখানা দেখব; তারপর চিরদিনের জন্য এদেশ ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাব।'

একদিন বিকেল বেলা সে হাঁটতে হাঁটতে পাহাড়ের দিকে গেল। সে পাহাড়ের উপর উঠে বসল। তখন তার অতীত জীবনের হাজারও স্মৃতি মনের পর্দায় ভেসে উঠতে লাগল। বাল্যকাল থেকে শুরু করে যৌবনের সব কথা, সব ঘটনা একে একে মনে পড়ল। বিশেষত, বিবাহিত জীবনের সাতটি বছরের স্মৃতি বারবার মনে পড়ল। সে এবার নীচের দিকে দৃষ্টি ফেলল। ফিলিপের বিশাল বাসগৃহ তার চোখে পড়ল। আধুনিক ডিজাইনের বিশাল অট্টালিকা। বাড়ির সামনে রাস্তা। রাস্তা ও বাড়ির মাঝে একটি প্রশস্ত ফুলবাগান। বাড়ির সামনে একটি প্রকাণ্ড গেট। পিছনের দিকে একটি ছোট দরজা; এ পথেই আবর্জনা ফেলা হয়। পিছনের দিকে দেয়াল দিয়ে ঘেরা। দেয়ালের মধ্যে চির সবুজ বৃক্ষ।

এনোক আর্ডেন সামনের রাস্তা দিয়ে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করতে পারত। কিন্তু সে ইচ্ছা করেই পিছনের দরজা দিয়ে প্রবেশ করল। তারপর দেয়ালের উপর উঠে বসল। বাড়ির ভিতরে সবগুলো কামরা তার দৃষ্টি গোচর হচ্ছে।

এনোক আর্ডেন ফায়ার প্লেসের কামরার দিকে তাকাল। সে দেখতে পেল ফিলিপ একটি সোফায় বসে আছে। তার কোলে একটি বাচ্চা; বাচ্চাটি তার নিজের কন্যা। তার পিছনে আরেকটি বিশ-বাইশ বছরের সুন্দরী মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে শিশুটির দিকে একটি ফিতায় বাঁধা খেলনা দোল খাওয়াতে লাগল। শিশুটি হঠাৎ হাত বাড়িয়ে সেটি ধরে ফেলল। এবার সে খিলখিল করে হেসে ফেলল। মেয়েটি বেশ লম্বা ও সুন্দরী; লাল রিবন দিয়ে চুল বাঁধা; দেখতে ঠিক এনির মত হয়েছে। এনোক বুঝতে পারল যে মেয়েটি তার ঔরসজাত কন্যা। এবার ওদের মা এগিয়ে এল। বাচ্চাটিকে কোলে তুলে চুমু খেল। সবাই একসঙ্গে হেসে উঠল। দেখেই বোঝা গেল, বেশ প্রাণবন্ত হাসি খুশি ও সুখী পরিবার। আরেকটি যুবক ঘরে ঢুকল। দীর্ঘ, বলিষ্ঠ ও সুদর্শন; এনোক বুঝতে পারল যে সে তারই পুত্র। তার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ফিলিপের পরিবারে বেশ আনন্দময় পরিবেশেই আছে।

এনোক আর্ডেন মিরিয়াম লেনের কাছে সব কথা আগেই শুনেছিল। এখন সে নিজের চোখে সব দেখল। শোনা কাহিনির চেয়ে নিজের চোখে দেখা ঘটনা অনেক বেশি শক্তিশালী ও ক্রিয়াশীল হয়। তার বুকের ভিতর প্রচণ্ড যন্ত্রণা মোচড় দিয়ে উঠল। একটি তীক্ষ্ণ আর্তনাদ তার গলা থেকে বেরিয়ে আসছিল। বহু কষ্টে সে নিজেকে নিবৃত্ত করল। সে ধীরে ধীরে বাইরে বেরিয়ে এল। তার দুচোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল। সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। সে হাঁটার শক্তি হারিয়ে ফেলল। সে তখন নির্জীবের মত পথের উপর বসে পড়ল।

এনোক আর্ডেন নতজানু হয়ে প্রার্থনা করল:

'হে সর্বশক্তিমান বিধাতা, তুমি আমাকে সেই নির্জন দ্বীপেই রেখে দিলে না কেন? কেন তুমি আমাকে ফিরিয়ে আনলে? নিজের বিবাহিতা স্ত্রী, পুত্র, কন্যা অন্যের গৃহে বসবাস করছে, এ যন্ত্রণা আমি কীভাবে সহ্য করব? হে পরমেশ্বর, আমাকে আর কিছুদিন

একাকী থাকার শক্তি দাও! আমার স্ত্রী, আমার পুত্র-কন্যা কেউ যেন জানতে না পারে আমি বেঁচে আছি। কেউ যেন জানতে না পারে আমি ফিরে এসেছি। আমি অনেক দূরে কোথাও চলে যাব আমার এ মুখ কাউকে দেখাব না!'

এনোক যখন বন্দরের সেই ঘরটিতে ফিরে এসেছে, তখন চারদিকে গাঢ় অন্ধকার নেমে এসেছে। তার জীবনের অন্ধকার তার চেয়ে আরও বেশি কালো। এনোক বিছানায় শুয়ে ভাবতে লাগল: সে একা মানুষ; কোনও ভাবে তার জীবন কেটে যাবে। সে কোনও কাঠমিস্ত্রিরও সহকারী হতে পারে; নৌকার কাজে লাগতে পারে; কোনও জেলের জাল বোনার কাজ করতে পারে। একটা মানুষের আহার কোনভাবে জুটে যাবে।

কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে নিদারুণ ক্লান্তি ও অবসাদ তাকে ঘিরে ধরল। হতাশা, আত্মগ্লানি ও মানসিক পীড়া তাকে কাতর করে ফেলল। সে বুঝতে পারল, সে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে এসেছে। সে মিরিয়াম লেনকে কাছে ডাকল। শান্তভাবে বলল, 'ভদ্রে, আমি আপনাকে কিছু বলতে চাই। বিষয়টি খুবই গোপনীয়। পবিত্র ধর্মগ্রন্থ হাতে করে আপনাকে শপথ করতে হবে–আমার মৃত্যুর আগে আপনি একথা কাউকে বলতে পারবেন না।'

'মারা যাবেন! কী বলছেন আপনি?'

'হ্যাঁ। আপনি পবিত্র ধর্মগ্রন্থ হাতে নিয়ে শপথ করুন!'

মিরিয়াম লেন ভয়ে ভয়ে ধর্মগ্রন্থ হাতে নিয়ে শপথ করল।

তখন এনোক আর্ডেন তার ধূসর চোখ দুটি তার উপর নিবদ্ধ করে বলল, 'আপনি এই শহরের এনোক আর্ডেনকে চিনতেন?'

'এনোক আর্ডেন? অনেক আগে থেকেই তাকে চিনতাম। সে যখন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেত তখন মনে হত, শহরের সবচেয়ে লম্বা ও শক্তিশালী মানুষ!'

'হ্যাঁ, আমিই সেই এনোক আর্ডেন।'

'আপনি...এনোক আর্ডেন? অসম্ভব! সে আপনার চেয়ে অন্তত একফুট উঁচু ছিল।'

'হ্যাঁ, বিধাতা আমাকে খাটো ও নতজানু করে দিয়েছেন। আমার দুর্দশা, আমার নিদারুণ দুঃখ আমাকে ক্ষীণকায় ও দুর্বল করে ফেলেছে।'

এরপর এনোক আর্ডেন তার জাহাজ যাত্রা থেকে শুরু করে জাহাজডুবির ঘটনা, নির্জন দ্বীপে দীর্ঘকাল কাটানো, অবশেষে নির্জন দ্বীপ থেকে পরিত্রাণ, ফিরে আসা, ফিলিপের বাড়িতে তার স্ত্রী ও পুত্র কন্যাদের দর্শন—সব ঘটনা একে একে খুলে বলতে লাগল। মিরিয়াম লেন সব কথা শুনে খুবই ব্যথিত ও মর্মাহত হলো। তার দুচোখ বেয়ে অশ্রুর প্লাবন নামল। তারপর কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলল, 'মিস্টার আর্ডেন, আপনি আপনার ছেলে মেয়ের সাথে দেখা করছেন না কেন? ওরা তো আপনারই সন্তান! আমি যাব আর আসব...আপনি একটু অপেক্ষা করুন...আমি ওদেরকে আপনার কাছে নিয়ে আসছি।'

এনোক আর্ডেন বৃদ্ধা মহিলাকে তার শপথের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলল, 'আমাকে শেষ মুহূর্তে বিরক্ত করবেন না। আগে আমার সব কথা শুনুন! আমার মৃত্যুর পর তাকে বলবেন যে আমি মারা গেছি। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাকে ভালবেসেছি; তার জন্য প্রার্থনা করেছি; তার জন্য আশীর্বাদ করেছি।'

কিছুক্ষণ বিরতি নিয়ে আবার বলতে লাগল:

'আমার মেয়েকে বলবেন, আমি তার জন্য আশীর্বাদ করেছি; তার জন্য প্রার্থনা করেছি। আমার ছেলেকে বলবেন, আমি তার জন্য আশীর্বাদ করেছি ও প্রার্থনা করেছি ফিলিপকে বলবেন, আমি তার জন্য আশীর্বাদ করে যাচ্ছি; সে আমার পুত্র-কন্যাকে সযতনে রেখেছে। আমার পরিবারের প্রতি সঠিক দায়িত্ব পালন করেছে। আমার মৃত্যুর পর আমার ছেলে-মেয়ে যেন আমাকে একবার দেখে যায়; কারণ আমি ওদের বাবা।'

এরপর তার জামার পকেট থেকে একগুচ্ছ চুল বের করল। আবার, ধীরে ধীরে অথচ ধীর, স্থির, শান্ত গলায় বলল, 'এনি আমাদের ছোট মেয়েটির মাথার এক গোছা চুল আমার বিদায়ের দিনে দিয়েছিল; আমি সেই চুল পরম যত্নে নিজের কাছেই এতকাল রেখেছি। এ চুলের গোছা এনিকে দেবেন। হয়তো এ চুল দেখে সে কিছুটা সান্ত্বনা পাবে; তা ছাড়া এ চুলগুচ্ছ আমার একমাত্র স্মারক চিহ্ন; এ চুলের গুচ্ছ দেখলেই সে বুঝতে পারবে, আমিই তার হারিয়ে যাওয়া স্বামী।'

এনোক আর্ডেন মিরিয়াম লেনকে বারবার শপথ করাল। তাকে অনুরোধ করল, সে যেন তার কথা মত কাজ করে। সে যথাসাধ্য এনোকের কাছে থেকে সেবাযত্ন করতে লাগল। প্রায় সারারাত তার কাছে চুপচাপ বসে রইল।

এভাবে আরও তিনদিন, তিন রাত্রি কেটে গেল। এনোকের শরীর নিশ্চল, নিস্পন্দ হয়ে গেল। তার দুচোখ বুজে এল। তারপর সে হঠাৎ উঠে বসল। তার দুবাহু প্রসারিত করে উচ্চস্বরে বলল, 'জাহাজ! একটি জাহাজ! আমি বেঁচে গেলাম!!' তারপর তার শরীর এলিয়ে পড়ল। আর এভাবেই একজন মানুষের বীর আত্মা শান্তভাবে বেরিয়ে গেল।

এনোক আর্ডেনের মৃত্যুসংবাদ পরদিন সকালে শহর ও বন্দরের সব মানুষ জানতে পারল। তারা সবাই গভীর শ্রদ্ধা ও মর্যাদা সহকারে তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করল। বন্দরের উপর রচিত হলো তার শেষ সমাধি।

মূল লর্ড আলফ্রেড টেনিসন
রূপান্তর মোঃ জার্জিস আলী

কপার বীচ রহস্য

ডেইলি টেলিগ্রাফের বিজ্ঞাপনের পাতাটা একপাশে সরিয়ে রেখে শার্লক হোমস বলল, 'বরাবরই আমি লক্ষ করেছি, ওয়াটসন, চাঞ্চল্যকর কেসগুলোর চেয়ে ছোটখাট কেসের রিপোর্টেই তুমি গুরুত্ব দিয়েছ বেশি। কিন্তু পরে ভেবে বুঝতে পেরেছি, আপাতদৃষ্টিতে তুচ্ছ হলেও সেসব কেসেই আমার ডিডাকশন আর লজিক্যাল সিনথেসিসের বেশি সুযোগ ছিল।'

'তবু,' হেসে বললাম আমি, 'কেস রিপোর্টে রোমাঞ্চকর ঘটনার প্রাধান্য দিই, এই অভিযোগ তো আমি এড়াতে পারিনি।'

'একটা ভুল তুমি করো বোধহয়,' বলে সময় নিয়ে লম্বা চেরিউড পাইপটা ধরাল সে–'একটা ভুল তুমি করো বোধহয় রঙ চড়ানোর চেষ্টা করে। রিপোর্টে শুধু প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো লিখতে হয়, রঙ চড়ানোর সুযোগ সেখানে নেই।'

'আসলে রিপোর্টে তোমাকে সবসময় আমি পুরো গুরুত্ব দিই,' বললাম ঠাণ্ডা স্বরে। কারণ, মাঝেসাঝে আত্মপ্রাধান্য দেয়া আমার বন্ধুটির অনন্য বৈশিষ্ট্য।

'না, এটা স্বার্থপরতা কিংবা আত্মগর্ব নয়,' আমার চিন্তাধারা ধরে ফেলতে একটুও অসুবিধে হলো না হোমসের। 'শিল্পের জন্যে আমি পুরো গুরুত্ব দাবি করতে পারি, কারণ, শিল্প একটা নৈর্ব্যক্তিক বস্তু। অপরাধপ্রবণ। যুক্তি-নির্ভর নয়। সুতরাং অপরাধের চেয়ে যুক্তির ওপরেই তোমার বেশি জোর দেয়া উচিত।'

প্রথম বসন্তের একটা ঠাণ্ডা সকালে নাস্তার পর আমরা

বসেছিলাম বেকার স্ট্রিটের পুরানো একটা ঘরে। মেটে রঙের বাড়ির সারির ফাঁকে ফাঁকে ঝুলে আছে ঘন কুয়াশা, জানালাগুলো ঝাপসা। গ্যাসের আলো গিয়ে পড়েছে টেবিলের সাদা কাপড় আর চিনেমাটির পাত্রের ওপর। সারাটা সকাল চুপচাপ অনেকগুলো সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনের পাতা পড়েছে শার্লক হোমস, তারপর সমালোচনা শুরু করেছে আমার সাহিত্যের।

বেশ কিছুক্ষণ পাইপ টানার পর আবার সে বলল, 'তোমাকে অভিযুক্ত করা যায় না। রিপোর্টে অপরাধসংক্রান্ত আলোচনা খুব বেশি থাকে না তোমার। বোহেমিয়ার রাজাকে আমার সাহায্য, মিস মেরী সাদারল্যাণ্ডকে নিয়ে সেই স্মরণীয় অভিজ্ঞতা, বাঁকা ঠোঁটঅলা লোকটার সমস্যা কিংবা সেই চিরকুমারের ঘটনা–সবগুলো কেসই ছিল আইনের সীমানার বাইরে। কিন্তু ঘটনার রোমাঞ্চকর অংশ এড়াতে গিয়ে তুমি বোধহয় তুচ্ছ জিনিসের ওপর জোর একটু বেশি দিয়ে ফেলছ।'

'শেষটা হয়তো ওরকম হচ্ছে,' জবাব দিলাম আমি, 'কিন্তু আমার সূক্ষ্ম পদ্ধতি যেমন নতুন, তেমনি আকর্ষণীয়।'

'আরে দূর, সাধারণ মানুষ কী কিছু লক্ষ করে যে তুমি সূক্ষ্ম পদ্ধতি ব্যবহার করবে? যারা দাঁত দেখে তাঁতি বা বাম হাতের বুড়ো আঙুল দেখে কমপোজিটর চিনতে পারে না, তাদের জন্যে বিশ্লেষণ করার কোনও অর্থ হয়? তবে তুচ্ছ জিনিস নিয়ে নাড়াচাড়া করায় তোমাকে আমি দোষ দিতে পারি না। বড় বড় কেসের দিন তো আর নেই, এখন যতসব ছোটখাট কারবার। মানুষ, বিশেষ করে অপরাধী মানুষ তাদের অবিশ্বাস্য কর্মতৎপরতা আর মৌলিকত্ব হারিয়েছে। এমন কেস আসে আজকাল যে হাতে নেয়ার আগ্রহই জাগে না। তবে আজ সকালে পাওয়া এই চিঠিটার মধ্যে বোধহয় আগ্রহের কিছু আছে। পড়ে দেখো!' দলা পাকানো একটা কাগজ সে ছুঁড়ে দিল আমার দিকে।

গত রাতে মণ্টেগ প্লেস থেকে পাঠানো চিঠিটা নিম্নরূপ:

শ্রদ্ধেয় মি. হোমস,

আপনার পরামর্শ নেয়া আমার বিশেষ প্রয়োজন। গভর্নেসের চাকরির জন্যে একটা প্রস্তাব পেয়েছি। বুঝতে পারছি না, প্রস্তাবটা গ্রহণ করব কিনা। আগামীকাল সাড়ে দশটায় দেখা করব আপনার সঙ্গে, যদি কোনও ঝামেলায় না পড়ি।

আপনার বিশ্বস্ত
ভায়োলেট হান্টার।

'মেয়েটিকে তুমি চেন?' জানতে চাইলাম আমি।

'না।'

'এখন সাড়ে দশটা বাজে।'

হ্যাঁ। আর বেলটা যে মেয়েটিই বাজাচ্ছে, তাতে আমার কোনও সন্দেহ নেই।'

'হয়তো তুমি যতটা ধারণা করেছ, তার চেয়েও মজার হবে কেসটা। সেই নীল চুনির কথা নিশ্চয় ভুলে যাওনি, ঝোঁকের মাথায় নেয়া হয়েছিল কেসটা, কিন্তু আস্তে আস্তে কেমন আকর্ষণীয় হয়ে উঠল। এই কেসের ক্ষেত্রেও সেরকম হতে পারে।'

'আপাতত তা-ই আশা করা যাক! তবে শিগ্‌গিরই আমাদের সন্দেহ দূর হয়ে যাবে।'

তার কথা বলার মাঝেই দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল একজন যুবতী। পরনে সাধারণ কিন্তু পরিষ্কার পোশাক; উজ্জ্বল, প্রাণবন্ত মুখে টিট্টিভ পাখির ডিমের মত ঈষৎ হলদে ফুটকি

'আপনাদের নিশ্চয় খুব অসুবিধেয় ফেললাম,' হোমসকে দাঁড়াতে দেখে বলল সে, 'কিন্তু আমি পড়েছি এক অদ্ভুত অবস্থায়। বাবা-মা বা আত্মীয়স্বজন কিছুই নেই আমার। তাই ভাবলাম, দয়া করে আপনারা যদি এ-ব্যাপারে একটা পরামর্শ দেন।'

'বসুন, মিস হান্টার। আপনার সাহায্যে আসতে পারলে খুশিই হব আমি।'

বুঝতে পারলাম, মেয়েটিকে পছন্দ হয়েছে হোমসের।

অনুসন্ধানী চোখে মেয়েটিকে দেখল সে কিছুক্ষণ, তারপর আধবোজা চোখে তৈরি হয়ে বসল তার গল্প শোনার জন্যে।

'পাঁচ বছর আমি গভর্নেস ছিলাম,' শুরু করল সে, 'কর্নেল স্পেন্স মানরোর পরিবারে। কিন্তু দু'মাস আগে নোভা স্কশিয়ার হ্যালিফ্যাক্সে চাকরি পেয়ে পরিবার নিয়ে কর্নেল চলে গেছেন আমেরিকা। তারপর বিজ্ঞাপন দিলাম আমি, জবাব দিলাম বিজ্ঞাপনের, কিন্তু নতুন কোনও চাকরি পেলাম না। জমানো সামান্য টাকা দ্রুত শেষ হয়ে যেতে লাগল। চিন্তায় পড়ে গেলাম।

'ওয়েস্টঅ্যাওয়ে নামে গভর্নেসদের একটা সুপরিচিত এজেন্সি আছে ওয়েস্ট এণ্ডে। চাকরির খোঁজে সপ্তাহে একবার করে সেখানে যাই। প্রতিষ্ঠাতার নাম ওয়েস্টঅ্যাওয়ে হলেও আসলে সেটার দেখাশোনা করে মিস স্টপার। সে বসে নিজের অফিসে, পাশের একটা ঘরে অপেক্ষা করে মেয়েরা। লেজার দেখে সে এক এক করে মেয়েদের ডাকে, আর তারপর বিবেচনা করে, কার জন্যে কোন্ চাকরিটা উপযুক্ত হতে পারে।

'গত সপ্তাহে যথারীতি সেখানে গিয়ে দেখি, মিস স্টপারের পাশে বসে আছে বিশালকায় এক মানুষ। মুখে হাসি, ভারি চিবুক থলথল করছে চর্বিতে, চোখে চশমা। প্রত্যেকটি মেয়েকে দেখছিল সে মনোযোগ দিয়ে, আমাকে চোখে পড়তেই লাফ দিয়ে উঠে ঘুরল মিস স্টপারের দিকে:

"ইনিই, এঁর চেয়ে ভাল আর কাউকে আমি আশা করতে পারি না। চমৎকার! চমৎকার!" এমন অমায়িক ভঙ্গিতে কথা বলছিল সে, শুনতে ভালই লাগছিল আমার।

' "আপনি একটা চাকরি খুঁজছেন, মিস?" জানতে চাইল সে।

' "জী, স্যর।'

' "কত বেতন চান?"

"কর্নেল স্পেন্স মানরো আমাকে মাসে চার পাউণ্ড করে দিতেন।"

' "ইস! বিশ্রী, কী বিশ্রী ব্যাপার!" হাত দুটো শূন্যে ছুঁড়ল সে। "এত আকর্ষণীয়া, যোগ্যতাসম্পন্ন একজন মহিলাকে কীভাবে এত কম বেতন দিতে পারে মানুষ?"

' "আমার যোগ্যতা, স্যর, আপনি যত ভাবছেন ততটা বোধহয় নয়," বললাম আমি। "অল্পস্বল্প ফ্রেঞ্চ জানি, সামান্য জার্মান, গান আর ছবি আঁকা।"

' "ইস্! যথেষ্ট, যথেষ্ট! আসল কথা, আপনার আচরণ একজন মহিলার মত কিনা? যদি না হয়, তা হলে আপনি একজন বাচ্চাকে গড়ে তোলার উপযুক্ত নন। কারণ, এরাই একদিন দেশের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। কিন্তু যদি হয়, কীভাবে একজন ভদ্রলোক আপনাকে তিন অঙ্কের নীচে বেতন দেয়ার কথা চিন্তা করতে পারে? আমি আপনাকে, ম্যাডাম, বছরে দেব একশো পাউণ্ড।"

'ভেবে দেখুন, মি. হোমস, বর্তমান পরিস্থিতিতে এরকম একটা চাকরির প্রস্তাব আমার কাছে কতখানি। আমার চোখ-মুখে ফুটে ওঠা অবিশ্বাসের ভাব লক্ষ করে পকেট-বুক খুলে একটা নোট বের করল সে।

"নতুন কোনও মহিলাকে চাকরি দিলে অর্ধেক বেতন অগ্রিম দেয়া আমার অভ্যেস, যাতে দু'একটা কাপড় কেনা বা পথখরচার ব্যাপারে তাঁকে কোনও অসুবিধেয় পড়তে না হয়।"

'মনে হলো, এরকম বিবেচক মানুষের সঙ্গে আমার আগে কখনও দেখা হয়নি। তবু পুরো ব্যাপারটার মধ্যে কেমন যেন একটা অস্বাভাবিকতা, তাই রাজি হবার আগে আরেকটু বাজিয়ে নিতে চাইলাম।

' "স্যর, কোথায় থাকেন জানতে পারি কি?" বললাম আমি।

"হ্যাম্পশায়ার। চমৎকার গ্রাম্য জায়গা। কপার বীচেস, উইনচেস্টার থেকে পাঁচ মাইল দূরে। খুব ভাল লাগবে আপনার।"

' "আমার কাজটা কী হবে, স্যর? জানতে পারলে খুব খুশি

হতাম।”

“একটা ছেলে—ছ’বছরের ছটফটে একটা ছেলে। ওহ্, স্যাণ্ডেল দিয়ে যদি তার আরশোলা মারা একবার দেখতেন! ফট! ফট! ফট! আপনি চোখের পলক ফেলার আগেই তিনটে শেষ!” হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ল সে।

‘ছেলেটার আনন্দ পাবার ধরন আমাকে একটু চমকে দিয়েছিল। কিন্তু তার বাবার হাসির ধরন দেখে মনে হলো, সে হয়তো রসিকতা করছে।

“তা হলে ছেলেটার দেখাশোনা করাই আমার একমাত্র দায়িত্ব?’ জানতে চাইলাম।

“না, ইয়াং লেডি, এটাই আপনার একমাত্র দায়িত্ব নয়। আমার স্ত্রীর প্রত্যেকটা কথা শোনাও আপনার দায়িত্বের মধ্যে পড়বে। তাতে নিশ্চয় আপনার কোনও অসুবিধে হবে না?”

“তাঁর কাজে লাগতে পারলে খুশিই হব আমি।”

“বেশ। আমরা একটু খেয়ালী মানুষ, তবে মন আমাদের নরম। আমরা যদি কোনও পোশাক দিয়ে সেটা আপনাকে পরতে বলি, কিছু মনে করবেন কি?”

“না,” বেশ অবাক হয়ে জবাব দিলাম আমি।

“কিংবা নির্দিষ্ট কোনও জায়গায় যদি বসতে বলি, তা হলে কি রাগ করবেন?”

“না, না।”

“যদি বলি, আমাদের কাজে যাবার আগে আপনার চুলগুলো কেটে ছোট করতে হবে?”

‘নিজের কানকে আমি বিশ্বাস করতে পারলাম না। দেখতেই পাচ্ছেন, মি. হোমস, কী সুন্দর আমার চুল, চেস্টনাটের মত পিঙ্গল ছোপ থাকায় সবাই খুব পছন্দ করে। এগুলো কেটে ফেলার কথা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি না।

“আপনার এই কথা মেনে নেয়া অসম্ভব,” বললাম আমি।

আগ্রহী চোখে আমাকে লক্ষ করছিল সে, কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে যেন তার মুখের ওপর থেকে একটা ছায়া সরে গেল।

"কিন্তু এই ব্যাপারটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এটা আমার স্ত্রীর খেয়াল। আর জানেনই তো, মেয়েদের মাথায় একবার খেয়াল চাপলে তা না নামানো পর্যন্ত শান্তি নেই। তা হলে, ম্যাডাম, চুল আপনি কাটবেন না?'

' "জি না, স্যর, সম্ভব নয়,' বললাম আমি দৃঢ়স্বরে।"

"বেশ, আলোচনার তা হলে এখানেই শেষ। এই একটা ব্যাপার ছাড়া সত্যিই আপনাকে পছন্দ হয়েছিল আমার। মিস স্টপার, আর কয়েকজন মেয়েকে তো দেখতে হয় তা হলে।"

'এতক্ষণ কাগজপত্র নিয়ে ব্যস্ত ছিল মহিলা, আমাদের কোনও কথাতেই যোগ দেয়নি। কিন্তু এবার এমন কড়া চোখে তাকাল আমার দিকে যে সন্দেহ হলো, আমি রাজি না হওয়ায় বড়সড় একটা কমিশন তার হাতছাড়া হয়ে গেল।

"আপনি কি চান, আমাদের খাতায় আপনার নাম থাক?" জানতে চাইল সে।

"নিশ্চয়, মিস স্টপার।"

"কিন্তু চমৎকার প্রস্তাবও আপনি যেভাবে প্রত্যাখ্যান করছেন, তাতে নাম রেখে কোনও লাভ আছে বলে তো মনে হয় না। এরকম প্রস্তাব পাবার আশা আর করতে পারেন না আপনি। বিদায়, মিস হান্টার।" টেবিলের ওপরে রাখা একটা ঘণ্টা বাজাল সে, সঙ্গে সঙ্গে ভৃত্য এসে আমাকে দরজা দেখিয়ে দিল।

'মি. হোমস, ঘরে গিয়ে যখন দেখলাম, কাবার্ডে রয়েছে অতি সামান্য খাবার আর টেবিলের ওপর পড়ে রয়েছে বাকি কয়েকটা বিল, তখন মনে হলো, কাজটা ভুল করলাম না তো? যদি ওই মানুষগুলো সত্যি খেয়ালীই হয়, সেই খেয়ালের জন্যে তো তারা উপযুক্ত মূল্য দিতে চাইছে। ইংল্যাণ্ডের খুব কম গভর্নেসই বছরে একশো পাউণ্ড পায়। আর এই চুলই বা আমার কী কাজে লাগবে?

আজকাল অনেকেই চুল ছোট করছে। পরদিন মনে হলো, বোধহয় ভুলই করেছি, আর তার পরদিন ভুল সম্বন্ধে নিশ্চিত হলাম। যখন কেবল ভাবছি যে এজেন্সিতে গিয়ে খোঁজ নেব, চাকরিটা এখনও আছে কিনা, সেই সময় এই চিঠি পেলাম ভদ্রলোকের কাছ থেকে। চিঠিটা আপনাদের পড়ে শোনাচ্ছিঃ

কপার বীচেস, উইনচেসটার।

প্রিয় মিস হাণ্টার,

দয়া করে মিস স্টপার আপনার ঠিকানা দিয়েছেন আমাকে। আপনি কি আপনার সিদ্ধান্তটা বদল করেছেন? আমার স্ত্রী চাইছে, আপনিই আসুন এখানে। কারণ, আমার মুখে বর্ণনা শুনে সে খুব পছন্দ করেছে আপনাকে। আমরা আপনাকে ত্রৈমাসিকে ৩০ পাউণ্ড, অর্থাৎ বছরে ১২০ পাউণ্ড দিতে রাজি আছি। আমার স্ত্রী বিদ্যুৎ-নীল রঙের একটা পোশাক ভালবাসে। সে চায়, সকালবেলা বাড়িতে আপনি ওই পোশাকটা পরে থাকবেন। অবশ্য পোশাকটা আপনাকে কিনতে হবে না। আমাদের মেয়ে এলিসের (বর্তমানে ফিলাডেলফিয়ায়) ওই রঙের একটা পোশাক আছে, যা আপনার গায়ে ঠিক মানিয়ে যাবে মনে হয়। পোশাক পরা ছাড়া আমাদের কথামত এখানে-ওখানে একটু বসে থাকা—তাতে আপনার তেমন অসুবিধে হবার কথা নয়। আমাদের খেয়ালে তাল দিয়ে চলতে আপনার যাতে খারাপ না লাগে, সেজন্যেই বেতন বাড়াবার সিদ্ধান্ত নিলাম আমরা। আপনার চুল কাটার ব্যাপারটাতে অবশ্য খুব খারাপই লাগছে, যা সুন্দর চুল আপনার, কিন্তু কোনও উপায় নেই, আমার স্ত্রীর এই কথাটা মানতেই হবে আপনাকে। ছেলেটাকে দেখাশোনার ব্যাপারটা সহজই হবে আপনার পক্ষে। সব জানিয়ে লিখলাম। দয়া করে আসার চেষ্টা করবেন, আমি ডগকার্ট নিয়ে উইনচেসটারে অপেক্ষা করব। আপনার ট্রেনের সময় হচ্ছে—

আপনার বিশ্বস্ত,

জেফরো রিউক্যাসল।

‘এই চিঠিটা পাবার পর আমি প্রায় মনস্থির করে ফেলেছি, মি. হোমস। তবু ভাবলাম, চূড়ান্ত পদক্ষেপ নেয়ার আগে আপনার পরামর্শটা একবার নেয়া প্রয়োজন।’

‘মিস হান্টার, আপনি মনস্থির করে ফেললে আমার আর কী বলার আছে?’ হোমস হাসল।

‘আপনি কি আমাকে প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করতে বলবেন?’

‘এরকম পরিস্থিতিতে আমার কোনও বোনকে দরখাস্ত করতে বলতাম না আমি।’

‘আপনি কী বলতে চান, মি. হোমস?’

‘আহ্, আমার হাতে কোনও ডেটা নেই, তাই কিছু বলতে পারছি না। হয়তো আপনি নিজেই একটা কিছু ভেবেছেন এ-বিষয়ে।’

‘সম্ভাব্য একটা মাত্র সমাধানের কথাই মনে হচ্ছে আমার। মি. রিউক্যাসল একজন যথার্থ ভাল মানুষ। সে তার ছিটগ্রস্ত স্ত্রীকে উন্মাদ আশ্রমে পাঠাতে চায় না বলেই তাকে এমন হাসিখুশি মেজাজে রাখতে চায়। তার ধারণা, মহিলাকে খেয়ালমত যা খুশি তা-ই করতে দিলে তার উন্মাদনাটা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার সুযোগ পাবে না।’

‘হ্যাঁ, এটা একটা সম্ভাব্য ব্যাখ্যা—ঘটনাটা সবদিক থেকে বিবেচনা করলে এটাকেই সবচেয়ে বাস্তব মনে হয়। তবু বাড়িটার পরিবেশ একজন যুবতীর পক্ষে সুবিধের মনে হচ্ছে না।’

‘কিন্তু টাকা, মি. হোমস, টাকাটা!’

‘হ্যাঁ, বেতনটা ভাল—একটু বেশিরকমের ভাল। সেটাই আমার অস্বস্তির কারণ। বছরে ৪০ পাউণ্ডেই যেখানে গভর্নেস পাওয়া সম্ভব, সেখানে কেন তারা ১২০ পাউণ্ড খরচ করবে? এর পেছনে নিশ্চয় বিশেষ কোনও কারণ আছে।’

‘এখানে আসার আগে ভেবেছি, পরিস্থিতিটা খুলে বললে প্রয়োজনে আপনাদের সাহায্য আমি চাইতে পারব। আপনারা

পেছনে আছেন জানলে মনে অনেকটা শক্তি পাব আমি।'

'ওহ্‌, সে-ব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। গত কয়েক মাসের মধ্যে আপনার সমস্যাটাতেই একটা নতুনত্ব খুঁজে পাচ্ছি। যদি কোনও সন্দেহ জাগে আপনার, কিংবা কোনও বিপদ...'

'বিপদ! কী বিপদের আশঙ্কা করছেন আপনি?'

গম্ভীর মুখে মাথা নাড়াল হোমস। 'বিপদ কী যদি বুঝতেই পারতাম, তা হলে সেটা আর বিপদ থাকত না। যা-ই হোক, দিনে কিংবা রাতে আপনার একটা টেলিগ্রাম পেলেই সাহায্যের জন্যে ছুটে যাব আমরা।'

'এটুকুই আমার জন্যে যথেষ্ট।' চেয়ার থেকে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল সে, মুখ থেকে সরে গেছে উদ্বেগের ছায়া। 'এখন শান্ত মনে হ্যাম্পশায়ারে যেতে পারব আমি। এক্ষুণি চিঠি লিখব মি. রিউক্যাসলকে, চুল কেটে ফেলব আজরাতে, আর আগামীকাল রওনা দেব উইনচেস্টারের উদ্দেশে।' হোমসকে আর দু'একটা কৃতজ্ঞতার কথা বলে, আমাদের বিদায় জানিয়ে চলে গেল সে।

'আর যা-ই হোক,' বললাম আমি, 'এই মহিলা অন্তত নিজের দায়িত্ব নিতে সমর্থ।'

'দায়িত্ব নেয়ার প্রয়োজন পড়বে আমাদের,' গম্ভীর মুখে বলল হোমস; 'বুঝতে যদি ভুল না হয় আমার, অল্প দিনের মধ্যেই ডাক আসবে।'

আমার বন্ধুটি ভুল ভবিষ্যদ্বাণী করেনি। পনেরো দিন কেটে গেছে। এর মধ্যে প্রায়ই ভেবেছি, কী বিচিত্র অভিজ্ঞতার মুখোমুখিই না হতে হচ্ছে মেয়েটিকে। অস্বাভাবিক বেতন, অদ্ভুত শর্ত, হালকা কাজ—সবকিছুই একটা অস্বস্তিকর ধারণার জন্ম দেয়। তবে এটা সত্যিই খেয়াল নাকি ষড়যন্ত্র, মানুষটা সদাশয় নাকি ভয়ানক, বুঝে ওঠা সম্ভব হয়নি আমার পক্ষে। ওদিকে মাঝেমধ্যেই আধঘণ্টা ধরে ভুরু কুঁচকে বসে থেকেছে হোমস, আমি বিষয়টার উল্লেখ করলেই যেন উড়িয়ে দিতে চেয়েছে হাত নেড়ে। 'ডেটা! ডেটা! ডেটা!' বলে

উঠেছে অধৈর্য হয়ে। 'কাদা ছাড়া আমি ইট তৈরি করতে পারি না।' কখনও বিড়বিড় করে বলেছে, তার কোনও বোনেরই এই পরিস্থিতিতে চাকরি নেয়া উচিত হত না।

অবশেষে এক গভীর রাতে টেলিগ্রাম পেলাম আমরা। তখন কেবল উঠে পড়তে চাইছিলাম আমি, আর হোমস তৈরি হচ্ছিল তার রাতভর গবেষণার জন্যে। প্রায়ই সে গবেষণা করে এরকম। রাতে ওকে ছেড়ে যাই আমি, সকালে নাস্তা করতে এসে দেখি, একইভাবে সে উপুড় হয়ে আছে টেস্ট-টিউব আর বাকযন্ত্রের ওপর। নজর বুলিয়েই সে ছুঁড়ে দিল আমার দিকে।

'গাইডে ট্রেনের সময় দেখো,' বলল সে, তারপর আবার নিমজ্জিত হলো গবেষণায়।

তারটা সংক্ষিপ্ত কিন্তু জরুরী।

আগামীকাল দুপুরে উইনচেসটারের ব্ল্যাক সোয়ান হোটেলে আসবেন। দয়া করে আসবেন। আমি আর কিছু ভাবতে পারছি না।

হাণ্টার।

'তুমি যাবে আমার সঙ্গে?' চোখ তুলে জানতে চাইল হোমস।

'আমার সেরকমই ইচ্ছে।'

'তা হলে গাইড দেখো।'

'সাড়ে ন'টায় একটা ট্রেন আছে,' গাইড দেখে বললাম আমি। 'উইনচেস্টারে পৌঁছুবে সাড়ে এগারোটায়।'

'এটাতেই কাজ হবে। তা হলে আজরাতের মত অ্যাসিটোন বিশ্লেষণ বাতিল করা যাক।'

পর দিন বেলা এগারোটায় উইনচেস্টারের কাছাকাছি পৌঁছে গেলাম আমরা। সারাক্ষণই সকালের সংবাদপত্রে মুখ গুঁজে ছিল হোমস, কিন্তু ট্রেন হ্যাম্পশায়ার পেরতেই সেগুলো রেখে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে লাগল। বসন্ত দিনের হালকা নীল আকাশ, ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ ভেসে যাচ্ছে পশ্চিম থেকে পুবে। উজ্জ্বল সূর্যের আলো, প্রকৃতিতে ছড়ানো একটা আনন্দের ভাব যেন উদ্যম বাড়িয়ে দিচ্ছে

মানুষের। পুরো গ্রামাঞ্চল আর অলডারশট পর্বতমালা ঘিরে নতুন পাতার ফাঁকে ফাঁকে চোখে পড়ছে ছোট ছোট খামারবাড়ির লাল আর ধূসর ছাদ।

'কী তাজা আর সুন্দর, তাই না?' বললাম আমি, বেকার স্ট্রিটের গুমোট কুয়াশা থেকে বেরিয়ে এখানে এসে মনটা সত্যিই যেন ভরে যাচ্ছিল।

কিন্তু হোমস মাথা নাড়াল গম্ভীর ভঙ্গিতে।

'জানো, ওয়াটসন, আমার মত মানুষের একটা বিশ্রী অভ্যেস আছে। আমরা যেদিকেই তাকাই না কেন, নিজের কথাই সর্বপ্রথম মনে আসে। ছড়ানোছিটানো ওই বাড়িগুলোর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হতে পারছ তুমি। কিন্তু সৌন্দর্যের বদলে আমি দেখছি ওগুলোর নির্জনতা, ভাবছি, শাস্তি পাবার ভয় না করে কী সহজে অপরাধ করা যাবে এখানে।'

'হায় ঈশ্বর!' বললাম আমি।

'ওগুলো আমাকে সবসময়েই আতঙ্কিত করে। অভিজ্ঞতা থেকে এটা এখন আমার বিশ্বাস, ওয়াটসন, লণ্ডনের জঘন্যতম গলিগুলোর চেয়েও বেশি অপরাধ সংঘঠিত হয় এই শান্ত সুন্দর গ্রামাঞ্চলে।'

'তুমি কিন্তু আমাকেও আতঙ্কিত করছ!'

'এর কারণ খুব স্পষ্ট। শহরের সর্বত্র আইনের হাত না পৌঁছুলেও সেখানে রয়েছে জনমতের চাপ। এমন জঘন্য পরিস্থিতি সেখানকার কোনও গলিতেই নেই, যেখানে অত্যাচারিত শিশুর চিৎকার কিংবা মাতালের ঘুসির শব্দ প্রতিবেশির সহানুভূতি আকর্ষণ করে না। আইন সেখানে এত কাছে যে অভিযোগ পেলেই তা কার্যকর হয়ে ওঠে, আসামীর কাঠগড়া আর অপরাধের মাঝে সেখানে একটামাত্র ধাপের ব্যবধান। কিন্তু এখানকার বাড়িগুলো আর অধিবাসীদের দেখো, এদের বেশিরভাগই আইন সম্বন্ধে অজ্ঞ। বছরের পর বছর এখানে ঘটছে নৃশংস সব ঘটনা। যে-মেয়েটি আমাদের সাহায্য চেয়েছে সে যদি উইনচেস্টারে থাকত, তা হলে

আমি কোনও ভয়ই পেতাম না। কিন্তু ওই গ্রামের পাঁচ মাইল পথই এটাকে বিপজ্জনক করে তুলেছে। তবু এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে ব্যক্তিগতভাবে সে এখনও হুমকির সম্মুখীন হয়নি।'

'না। আমাদের সঙ্গে দেখা করার জন্যে সে যদি উইনচেস্টারে আসতে পারে, প্রয়োজনে সে চলেও যেতে পারবে।'

'অবশ্যই। সে-স্বাধীনতা তার আছে।'

'তা হলে এখানে ঘটনাটা কী? তুমি কি কোনও ব্যাখ্যা দিতে পারছ না?'

'সাতরকম ব্যাখ্যা ভেবেছি আমি। কিন্তু তারমধ্যে কোন্‌টা সঠিক, নতুন তথ্য না পাওয়া পর্যন্ত বলতে পারব না। ওই যে ক্যাথেড্রালের টাওয়ার, শিগগিরই মিস হাণ্টারের বক্তব্য শুনতে পাব আমরা।'

'ব্ল্যাক সোয়ান' হাই স্ট্রিটের নামকরা হোটেল, স্টেশনের মোটামুটি পাশেই বলা চলে। আমাদের জন্যে একটা সিটিং-রুম ভাড়া করে অপেক্ষা করছিল মেয়েটি, লাঞ্চ সাজানো ছিল টেবিলে।

'আপনারা আসায় ভীষণ খুশি হলাম,' তার গলায় আন্তরিক সুর, 'কিন্তু সত্যিই ভাবতে পারছি না, এখন আমার কী করা উচিত। আপনাদের অমূল্য পরামর্শ আমার বিশেষ প্রয়োজন।'

'এখানে আসার পর কী ঘটল বলুন।'

'বলব। যা বলার তাড়াতাড়িই বলতে হবে। মি. রিউক্যাসলকে কথা দিয়ে এসেছি, তিনটের আগেই ফিরে যাব। আজ সকালেই শহরে আসার জন্যে ছুটি নিয়েছি আমি, তবে আসার কারণ সে জানে না।'

'ঘটনাগুলো ঠিকমত গুছিয়ে বলুন,' শোনার জন্যে হোমস স্থির হয়ে বসল।

'প্রথম কথা, মি. রিউক্যাসল আর তার স্ত্রী আমার সঙ্গে কোনও খারাপ ব্যবহার করেনি। কিন্তু আমি তাদের বুঝতে পারছি না, তাই মনে একটা অস্বস্তি থেকে যাচ্ছে।'

'কী বুঝতে পারছেন না?'

'তাদের আচরণের কারণ। আমি এখানে এসে নামার পর একটা ডগ-কার্টে করে মি. রিউক্যাসল আমাকে নিয়ে গেল কপার বীচে। নিজের বাড়ির খুব প্রশংসা করেছিল সে, কিন্তু আসলে বাড়িটা সুন্দর নয়। হোয়াইটওয়াশ করা বড় একটা চৌকোনা ব্লক, কিন্তু যেখানে-সেখানে দাগ আর ছাতা পড়া। বাড়িটার তিন পাশে বন, বাকি এক পাশে একটা জমি ঢালু হয়ে নেমে গেছে সাউদাম্পটন হাই রোডে। রাস্তাটা একটা বাঁক নিয়ে চলে গেছে সদর দরজার একশো গজ দূর দিয়ে। বাড়ির সামনের জমি মি. রিউক্যাসলের হলেও বনভূমির মালিক লর্ড সাউদারটন। হলঘরের সামনে কপার বীচের সারি থাকায় জায়গাটার ওরকম নামকরণ হয়েছে।

'সন্ধেয় স্ত্রী আর ছেলের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিল মি. রিউক্যাসল। বেকার স্ট্রীটে আমরা যে-ধারণা করেছিলাম, সেটা সত্যি নয়, মি. হোমস। মিসেস রিউক্যাসল পাগল নয়। ফ্যাকাসে মুখের এক মহিলা সে, বেশির ভাগ সময় চুপচাপ থাকে, বয়স স্বামীর চেয়ে অনেক কম। বছর তিরিশেক বয়স হবে তার, যেখানে মি. রিউক্যাসলের পঁয়তাল্লিশের কম নয়। তাদের কথাবার্তায় বুঝতে পেরেছি, বিপত্নীক মি. রিউক্যাসলের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে সাত বছর আগে; এই পক্ষের একটাই সন্তান, প্রথম পক্ষের একমাত্র মেয়ে চলে গেছে ফিলাডেলফিয়ায়। মি. রিউক্যাসল আমাকে গোপনে বলেছে, মেয়েটি তার সৎমাকে সহ্যই করতে পারত না। আমি ভেবে দেখেছি, মেয়েটির বয়স বিশ বছরের কম হবে, এই বয়েসী একটি মেয়ের বাবার তরুণী স্ত্রীকে সহ্য না করারই কথা।

'মিসেস রিউক্যাসল এক অদ্ভুত মহিলা, সজীব কোনও ভাবই তার মধ্যে নেই। তবে স্বামী আর ছোট ছেলেটির প্রতি টান আছে তার। মি. রিউক্যাসলও স্ত্রীর প্রতি সহানুভূতিশীল, তাকে আনন্দে

রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করে। মোট কথা, তাদেরকে সুখী দম্পতি বলা যেতে পারে। কিন্তু গোপন কী যেন একটা কষ্ট আছে মহিলার। প্রায়ই গভীর চিন্তায় ডুবে যায় সে, মুখটা তখন ভীষণ বিষণ্ন হয়ে যায় তার। বার দুই আমি তাকে কাঁদতেও দেখেছি। কখনও কখনও ভেবেছি, গোপন এই কষ্ট বোধহয় তার ছেলেকে নিয়ে, কারণ, এত ছোট কোনও ছেলেকে আমি ওভাবে নষ্ট হয়ে যেতে দেখিনি। বয়সের তুলনায় বিরাট তার মাথা। জীবনে সে মনে হয় মাত্র দুটো জিনিসই শিখেছে–নিষ্ঠুরতায় উন্মত্ত হওয়া আর মুখ গোমড়া করে থাকা। দুর্বল প্রাণীর প্রতি নিষ্ঠুরতা তার সবচেয়ে বড় আনন্দ। ইঁদুর, ছোট ছোট পাখি, কীটপতঙ্গকে কীভাবে কষ্ট দিতে হবে, সে-ব্যাপারে সে রীতিমত উদ্ভাবনী শক্তির অধিকারী। তবে বজ্জাত এই ছেলেটাকে নিয়ে আর কথা না বলাই বোধহয় ভাল, মি. হোমস, আমাদের গল্পের সঙ্গে তার সম্পর্ক খুবই অল্প।'

'আপনার কাছে প্রাসঙ্গিক মনে হোক কিংবা অপ্রাসঙ্গিক,' বলল আমার বন্ধুটি, 'আমি পুরো গল্প শুনতে চাই।'

'গুরুত্বপূর্ণ কিছুই যেন এড়িয়ে না যায়, সেদিকে আমি লক্ষ রাখব। ওই বাড়িতে প্রথমে আমার কাছে অস্বস্তিকর ঠেকেছে ভৃত্যদের আচরণ। মাত্র দু'জন ভৃত্য রয়েছে, তারা স্বামী-স্ত্রী। লোকটার নাম টলার, অসভ্য চালচলন, চুল আর গোঁফ ধূসর রঙের, সারা দিন গা থেকে বেরুচ্ছে মদের গন্ধ। যে দু'বার তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, দু'বারই পাঁড় মাতাল ছিল সে, অথচ মি. রিউক্যাসল যেন তা লক্ষই করল না। তার স্ত্রী কথা, শক্তসমর্থ, প্রায় সারাক্ষণই মিসেস রিউক্যাসলের মত মুখ বন্ধ করে থাকে। এই দম্পতিকে দেখলেই অস্বস্তি হবে। সৌভাগ্যের বিষয়, বেশিরভাগ সময়ই আমার কাটে নিজের ঘর আর নার্সারিতে। এই ঘরদুটো রয়েছে পাশাপাশি, বিল্ডিঙের এক কোনায়।

'কপার বীচে যাবার পর প্রথম দুটো দিন ভালভাবেই কাটল আমার। তৃতীয় দিন সকালে নাস্তার পরপরই মিসেস রিউক্যাসল

নেমে এসে ফিসফিস করে কী যেন বলল স্বামীর কানে কানে।

'ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ,' বলেই মি. রিউক্যাসল ঘুরল আমার দিকে। 'আমাদের খেয়ালমত চুল কেটে ফেলায় আমরা আপনার ওপর খুব খুশি হয়েছি। তবে চুল কাটার পরেও আপনার সৌন্দর্য এতটুকু কমেনি। এবার আমরা আপনাকে বিদ্যুৎ-নীল রঙের পোশাকে দেখতে চাই। পোশাকটা আপনার ঘরে বিছানার ওপর রাখা আছে। যান। পরে আসুন। আমরা খুব খুশি হব।'

'নীলের অদ্ভুত শেড দেয়া একটা পোশাক পেলাম বিছানার ওপর। পশমী, দামি পোশাক, কিন্তু ব্যবহৃত। পোশাকটা এমনভাবে ফিট করল গায়ে, যেন ওটা আমার জন্যেই তৈরি করা। আমাকে দেখে খুব আনন্দিত হলো মি. আর মিসেস রিউক্যাসল, কিন্তু সে-আনন্দে যেন ছিল সূক্ষ্ম একটা ভান। বসেছিল তারা ড্রয়িং-রুমে। বাড়ির পুরো সামনের অংশ জুড়ে প্রকাণ্ড সেই ঘর, লম্বা তিনটে জানালা নেমে এসেছে মেঝে পর্যন্ত। পেছনদিক করে একটা চেয়ার বসানো মাঝের জানালাটার কাছে। ওই চেয়ারেই বসতে বলা হলো আমাকে। তারপর পায়চারি করতে করতে মি. রিউক্যাসল জুড়ে দিল মজার সব গল্প। এমন গল্প আমি কখনও শুনিনি, হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরার জোগাড়। রসবোধ বলতে কোনও বস্তু মিসেস রিউক্যাসলের নেই, কোলে হাত রেখে বসে রইল সে বিষণ্ন মুখে। ঘণ্টাখানেক পর হঠাৎ গল্প থামিয়ে মি. রিউক্যাসল বলল, দিনের কাজ শুরু করার সময় হয়েছে, পোশাক পাল্টে এডওয়ার্ডকে নিয়ে আমি নার্সারিতে যেতে পারি।

'দিন দুই পর এই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলো। সেই পোশাক পরে বসলাম আমি জানালার কাছে, তারপর গল্প শুনে লুটিয়ে পড়লাম হাসতে হাসতে। মজার গল্পের যেন অফুরন্ত ভাণ্ডার রয়েছে মি. রিউক্যাসলের কাছে, বলার ভঙ্গিটিও অপূর্ব। গল্প শেষে একটা উপন্যাস আমার হাতে দিয়ে সে পড়তে বলল জোরে জোরে। চেয়ারটা সামান্য ঘুরিয়ে নিতে বলল, যেন আমার ছায়া

বইয়ের ওপর না পড়ে। মিনিট দশেক পড়লাম আমি, একটা অধ্যায়ের কেবল মাঝামাঝি গেছি, হঠাৎ একটা বাক্যের মাঝখানে পড়া থামিয়ে আমাকে পোশাক পাল্টাতে বলল সে।

'বুঝতেই পারছেন, মি. হোমস, অদ্ভুত এসব আচরণের কারণ জানার জন্যে কতটা কৌতূহল হচ্ছিল আমার। সবসময় তারা সতর্ক থাকত, যেন আমার মুখ জানালার দিক থেকে ঘোরানো থাকে। পেছনে কিছু একটা হচ্ছে ভেবে কৌতূহলে ফেটে পড়লাম আমি, কিন্তু জানার কোনও উপায় খুঁজে পেলাম না। পরে একটা বুদ্ধি খেলল মাথায়। আমার আয়নাটা ভেঙে গিয়েছিল, তারই একটা টুকরো লুকিয়ে নিলাম রুমালের ভেতরে। পরের বার হাসতে হাসতে একসময় রুমালটা তুলে ধরলাম মুখের সামনে। কিন্তু আয়নার প্রতিবিম্ব হতাশ করল আমাকে। পেছনে কিচ্ছু নেই।

'কিন্তু বেশিক্ষণ হতাশ থাকতে হলো না। আবার রুমালটা তুলে ধরতেই দেখলাম, ধূসর সুট পরা, ছোট ছোট দাড়িঅলা একজন মানুষ সাউদাম্পটন রোডের ওপর দাঁড়িয়ে এদিকেই তাকিয়ে আছে। রাস্তাটা গুরুত্বপূর্ণ, সবসময় লোক যাতায়াত করে। এই মানুষটা দাঁড়িয়েছিল জমির রেলিংয়ে ভর দিয়ে। রুমালটা নামাতেই দেখি, মিসেস রিউক্যাসল তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে আছে আমার দিকে। একটা কথাও সে বলল না আমাকে, তবু নিশ্চিত হলাম, আমার কৌশল সে ধরে ফেলেছে। ঝট করে উঠে দাঁড়াল সে।

"জেফরো," বলল মহিলা, "বাজে একটা লোক রাস্তায় দাঁড়িয়ে মিস হান্টারের দিকে তাকিয়ে আছে।"

"আপনার বন্ধু নাকি, মিস হান্টার?" জানতে চাইল মি. রিউক্যাসল।

"না। এখানকার কাউকে চিনি না আমি।"

"সর্বনাশ! সত্যিই বাজে লোক! আপনি যান তো, লোকটাকে তাড়িয়ে দিয়ে আসেন।"

"ওদিকে না তাকালেই তো ঝামেলা মিটে যায়।"

"না, না, কিছু না বললে প্রতিদিন আসতেই থাকবে। দয়া করে একটু উঠে চলে যেতে বলেন।"

"আমি উঠে তাকে চলে যাবার ইশারা করলাম, সঙ্গে সঙ্গে জানালার পাল্লা লাগিয়ে দিল মিসেস রিউক্যাসল। শেষ এই ঘটনাটা ঘটেছে এক সপ্তাহ আগে। তারপর আমাকে আর জানালার কাছে বসতে হয়নি, পরতে হয়নি সেই নীল পোশাক, মানুষটাকেও আর দেখিনি রাস্তায়।'

'বলে যান,' বলল হোমস। 'আপনার গল্পটা খুব মজার হবে মনে হচ্ছে।'

'এবার যে-ঘটনাটা বলব, তা বিচ্ছিন্ন মনে হলেও অন্য ঘটনাগুলোর সঙ্গে তার কোথায় যেন একটা যোগসূত্র আছে। প্রথম দিন কপার বীচে আসার পরপরই মি. রিউক্যাসল আমাকে নিয়ে গেল রান্নাঘরের পাশের ছোট্ট একটা আউটহাউসে। কাছে যেতেই কানে এল শেকলের ঝনঝনানি আর বড় একটা জানোয়ারের চলাফেরার শব্দ।

"দেখুন, মিস হান্টার," দরজার দুটো তক্তা সামান্য ফাঁক করে বলল মি. রিউক্যাসল। "সুন্দর না এটা?"

'তক্তার ফাঁকে চোখ লাগাতে আমি দেখতে পেলাম আগুনের মত গনগনে দুটো চোখ, আর অন্ধকারের মাঝে অস্পষ্ট একটা শরীর।

"ভয় পাবেন না," আমাকে চমকে উঠতে দেখে বলল মি. রিউক্যাসল। "এটা কার্লো, আমার ম্যাস্টিফ। আমার বললাম ঠিকই, কিন্তু একমাত্র সহিস টলারই এটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। দিনে মাত্র একবারই খাবার দিই কার্লোকে, ফলে ব্যাটা একেবারে রাক্ষস হয়ে থাকে। রাতে শেকল খুলে দেয় টলার, তখন কেউ সামনে পড়লে তার আর রক্ষা নেই। ভুলেও রাতে বাইরে বেরোবেন না, জীবন নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে।"

'অযথা মি. রিউক্যাসল আমাকে সাবধান করে দেয়নি। দু'রাত পর বেডরুমের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিলাম রাত দুটার সময়। চমৎকার রাত, জোছনায় সামনের লন দিনের মত হয়ে আছে। হঠাৎ লক্ষ করলাম, কী যেন একটা পায়চারি করছে কপার বীচের ছায়ায়। একটু পর আলোয় বেরিয়ে আসতেই বুঝলাম, ওটা কী। প্রকাণ্ড এক কুকুর, প্রায় বাছুরের সমান, তামাটে আভা গায়ে, কালো নাক, চোয়াল দুটো ঝুলে আছে। ধীরে ধীরে লন পেরিয়ে ওটা হারিয়ে গেল উল্টো পাশের ছায়ায়। নিঃশব্দ এই প্রহরীকে দেখে ছমছম করে উঠল আমার আত্মা।

'এবার বলব অদ্ভুত এক অভিজ্ঞতার কথা। আপনি জানেন, আমি চুল কেটে ফেলেছিলাম লণ্ডনে। কাটার পর চুলের গোছাটা রেখে দিয়েছিলাম ট্রাঙ্কের তলায়। একরাতে এডওয়ার্ড ঘুমাবার পর আমি ঘরের আসবাবগুলো দেখছিলাম, আর ফাঁকে ফাঁকে টুকিটাকি জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখছিলাম। ঘরে ছিল পুরানো একটা চেস্ট অভ ড্রয়ারস, ওপরের ড্রয়ার দুটো ছিল খোলা আর শূন্য, নীচেরটায় তালা দেয়া। আমার লিনেনগুলো গুছিয়ে রাখতেই দুটো ড্রয়ার ভরে গেলে। তখনও অনেক জিনিস বাকি, তাই তৃতীয় ড্রয়ারটায় তালা থাকায় বিরক্ত হলাম মনে মনে। ভাবলাম, এটায় হয়তো তালা লাগানো হয়েছে অনিচ্ছাকৃতভাবে, সুতরাং আমার চাবিগুলো দিয়ে একটু পরীক্ষা করে দেখি। প্রথম চাবিটাই লেগে গেল ঠিকঠাক, টেনে খুলে ফেললাম ড্রয়ার। মাত্র একটা জিনিসই ছিল ড্রয়ারে, কিন্তু কী জিনিস, সেটা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। ড্রয়ারে ছিল আমার চুলের গোছাটা।

'হাতে নিয়ে গোছাটা ভালভাবে পরীক্ষা করলাম। চেস্টনাটের মত পিঙ্গল রঙ, একইরকম ঘন। কিন্তু তারপরেই চিন্তার অস্বাভাবিকতাটা ধরা পড়ল আমার কাছে। আমার চুল কীভাবে ড্রয়ারে তালাবদ্ধ থাকতে পারে? কাঁপা কাঁপা হাতে আমি ট্রাঙ্ক খুললাম, জিনিসপত্রগুলো বের করলাম, চুলের গোছাটা ঠিকই পড়ে

আছে তলায়। পাশাপাশি গোছা দুটো মিলিয়ে দেখলাম। অবিকল এক। ব্যাপারটা অদ্ভুত না? অনেক ভেবেও এর কোনও অর্থ খুঁজে পেলাম না আমি। চুলের গোছাটা আবার রেখে দিলাম ড্রয়ারে, কিন্তু কথাটা জানালাম না কাউকে। কারণ, তালা দেয়া একটা ড্রয়ার খুলে ভুল করে ফেলেছি আমি।

'পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা আমার খুব একটা মন্দ নয়, তাই বাড়িটার একটা চিত্র মনে এঁকে নিতে অসুবিধে হলো না। বাড়িটার একটা অংশে যতদূর সম্ভব কেউ থাকে না। টলারদের কোয়ার্টার থেকে ওখানে যাবার একটা দরজা থাকলেও সেটা সবসময় তালাবদ্ধই থাকে। একদিন আমি সিঁড়ি দিয়ে উঠছি, এমন সময় চাবি হাতে ওই দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল মি. রিউক্যাসল। হাসিখুশি, আমুদে যে-মানুষটাকে আমি চিনি, তার সঙ্গে এর কোনও মিল নেই। গালদুটো লাল, রাগে কোঁচকানো ভ্রূ, কপালের শিরাগুলো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে উত্তেজনায়। তালা লাগিয়ে আমার পাশ দিয়ে দ্রুত নেমে গেল সে, একটা কথাও বলল না।

'কৌতূহল আরও বেড়ে গেল আমার। তাই বাইরের জমিতে হাঁটতে হাঁটতে আমি এমন একটা জায়গায় এলাম, যেখান থেকে সেই অংশের জানালাগুলো দেখা যায়। এক সারিতে চারটে জানালা, তিনটে ভীষণ নোংরা, চতুর্থটা বন্ধ। জানালাগুলোয় যে অনেকদিন কারও হাত পড়েনি, তা এক নজরেই বোঝা যায়। মাঝেমাঝে ওদিকে তাকাচ্ছি আর পায়চারি করছি, এমন সময় হাসিমুখে, স্বাভাবিক চেহারায় এগিয়ে এল মি. রিউক্যাসল।

"কথা না বলায় নিশ্চয় অভদ্র ভেবেছেন আমাকে? ব্যবসায়িক একটা চিন্তায় ডুবে ছিলাম তখন।"

'তাকে আশ্বস্ত করলাম যে আমি কিছু মনে করিনি। তারপর বললাম, "আপনার এদিকটায় মনে হয় ফাঁকা কয়েকটা ঘর আছে, তার মধ্যে একটার আবার জানালা বন্ধ করা।"

"ফোটোগ্রাফি আমার অন্যতম প্রিয় শখ," বলল সে। "ওটাকে

তাই ডার্ক-রুম বানিয়েছি। কিন্তু আপনার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা দেখছি অসাধারণ! চুপচাপ থাকেন অথচ এত গুণ, এ-কথা কেউ বিশ্বাস করবে?" স্বরে তার রসিকতা ছিল, কিন্তু দু'চোখ ভরে সন্দেহ আর বিরক্তি, রসিকতার চিহ্নমাত্র সেখানে ছিল না।

'মি. হোমস, সেই মুহূর্ত থেকে আমি বুঝতে পারলাম, ওই ঘরগুলোতে আমার যাওয়া চলবে না; এমন কিছু একটা আছে ওখানে, যা আমার জানা চলবে না। এতদিন ব্যাপারটা শুধু কৌতূহলে সীমাবদ্ধ ছিল, সেদিন থেকে তার সঙ্গে কর্তব্য মিশল। বার বার মনে হতে লাগল, ওখানকার রহস্যভেদের মাঝে যেন শুভ কিছু নিহিত আছে। মেয়েদের সহজাত প্রবৃত্তির কথা বলে অনেকে। বোধহয় সেই প্রবৃত্তির বশেই আমার ওরকম অনুভূতি হলো। মোট কথা, সেদিনের পর থেকেই আমি ওই নিষিদ্ধ দরজার ওপারে যাবার সুযোগ খুঁজতে লাগলাম।

'সুযোগ এল গতকাল। মি. রিউক্যাসল ছাড়া টলার আর তার স্ত্রীরও নির্জন সেই অংশটাতে যাতায়াত ছিল। একবার কালো লিনেনের একটা বড় ব্যাগ হাতে টলারকে আমি ওই দরজা দিয়ে যেতে দেখেছি। ইদানীং মদ্যপানের মাত্রা বেড়েছিল তার, গতকাল একেবারে বেহেড মাতাল হয়েছিল। ওপরতলায় উঠতে দেখলাম, তালার সঙ্গে চাবি ঝুলছে। চাবিটা যে টলারই ছেড়ে গিয়েছিল, তাতে আমার কোনও সন্দেহ নেই। তখন ছেলেকে নিয়ে মি. আর মিসেস রিউক্যাসল ছিল নীচতলায়। সুবর্ণ সুযোগ। চাবি ঘুরিয়ে, তালা খুলে আমি ঢুকে পড়লাম ভেতরে।

প্রথমেই ছোট একটা প্যাসেজ, কার্পেট বা পেপার কিছুই বিছানো নেই সেখানে। প্যাসেজটা অন্য প্রান্তে গিয়ে সমকোণে ঘুরে গেছে। এই কোণেই পাশাপাশি তিনটে দরজা, প্রথম ও তৃতীয়টা খোলা। দুটো ঘরই শূন্য, ধুলোয় ভর্তি, ঘরগুলোর একটায় দুটো জানালা, আরেকটায় একটা। মাঝের দরজাটা বন্ধ, দরজার বাইরে আড়াআড়িভাবে লোহার পাত লাগানো। পাতটার একপাশ লোহার

বালা দিয়ে দেয়ালের সঙ্গে তালা লাগানো, আরেক পাশ শক্ত রশি দিয়ে বাঁধা। এই দরজার উল্টোপাশের বন্ধ জানালাই নিশ্চয় দেখেছি আমি নীচ থেকে। এভাবে বন্ধ থাকা সত্ত্বেও দরজার নীচ দিয়ে আলোর একটা আভা চোখে পড়ল আমার। আলোটা আসছে ওপরের স্কাইলাইট দিয়ে। দরজাটার সামনে দাঁড়িয়ে ভাবছি, কী রহস্য লুকিয়ে আছে এর ভেতরে, এমন সময় কানে এল পদশব্দ। দরজার নীচে লক্ষ করে দেখলাম, একটা ছায়া যাতায়াত করছে সামনে-পেছনে। মি. হোমস, দৃশ্যটা দেখে আতঙ্কে কণ্ঠতালু শুকিয়ে গেল আমার। ঘুরেই দৌড় দিলাম—যেন ভয়ঙ্কর একটা কিছু হাত বাড়িয়ে ছুটে আসছে পেছনে, যে-কোনও মুহূর্তে ধরে ফেলবে স্কার্টের প্রান্ত। প্যাসেজ ধরে ছুটে, দরজা পেরিয়ে, সোজা আমি এসে পড়লাম বাইরে অপেক্ষমাণ মি. রিউক্যাসলের সামনে।

"ও, তা হলে আপনি," হেসে বলল সে, "দরজা খোলা দেখে অবশ্য আপনার কথাই ভেবেছিলাম।"

"ভীষণ ভয় পেয়েছি!" হাঁপাতে লাগলাম আমি।

"ইয়াং লেডি! মাই ডিয়ার ইয়াং লেডি!" আপনি ভাবতেও পারবেন না, কীরকম সহানুভূতির সঙ্গে কথা বলছিল সে—"কী দেখে ভয় পেয়েছেন আপনি?"

'কিন্তু তার মিষ্টি কথায় অতি অভিনয়ের ছোঁয়া ছিল।

"ভুল করে এদিকটায় এসে পড়েছিলাম," জবাব দিলাম আমি। "এত নির্জন আর নীরব জায়গাটা! মিটমিটে আলো! ওহ্, ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম!"

"শুধু এই, আর কিছু নয়?" তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল সে আমার দিকে।

"কেন, আর কী ভেবেছিলেন আপনি?" জানতে চাইলাম আমি।

"আপনি জানেন, কেন এই দরজা আমি তালা দিয়ে রেখেছি?"

"না। আমি জানি না।"

"তালা দিয়েছি এজন্যে যে, যাদের প্রয়োজন নেই তারা যেন এখানে আসতে না পারে। বুঝতে পেরেছেন?" মুখে এখনও তার অমায়িক হাসি।

"জানলে অবশ্য কিছুতেই আমি এদিকে..."

"বেশ, কিন্তু এখন জানলেন। ভুলেও যদি এই দরজার ওপারে আর পা দিয়েছেন কখনও.." মুহূর্তে হাসি উবে গিয়ে, প্রচণ্ড রাগে দানবের মত হয়ে গেল তার মুখটা, "আপনাকে আমি ছুঁড়ে দেব ম্যাস্টিফের সামনে।"

'কী করেছি সেটা বুঝতে না পারলেও অন্তরাত্মা শিউরে উঠল আমার। একবার মনে হলো, দৌড়ে চলে যাই এখান থেকে। বোধহয় দৌড়ই দিয়েছিলাম। কারণ, সংবিৎ ফিরতে দেখি, নিজের ঘরে বিছানার ওপর শুয়ে আছি আমি, সারা শরীর কাঁপছে থরথর করে। তারপরই আপনার কথা মনে পড়ল, মি. হোমস। আপনার পরামর্শ ছাড়া ওখানে থাকা আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়। ওই বাড়িটাকে ভয় পেলাম আমি। ভয় পেলাম ওখানকার পুরুষ, মহিলা. ভৃত্য, এমনকী ছেলেটাকে। আবার মনে হলো, আপনাকে ওখানে নিয়ে যেতে পারলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। অবশ্যই ওই বাড়ি থেকে তখন পালিয়ে আসতে পারতাম, কিন্তু আতঙ্কের পাশাপাশি কৌতূহলও তীব্র হলো। শিগগিরই মনস্থির করে ফেললাম আমি। আপনাকে একটা টেলিগ্রাম পাঠাব। দ্রুত হ্যাট আর আলখাল্লা পরে চলে গেলাম আধ মাইল দূরের টেলিগ্রাফ অফিসে। ফেরার সময় অনেকটা ভারমুক্ত অনুভব করলাম। বাড়ির কাছে আসতে ভয়ঙ্কর একটা চিন্তা উঁকি দিল মনে, কুকুরটাকে ছেড়ে দেয়নি তো! কিন্তু মাতাল হয়ে টলে পড়ে আছে টলার, সে ছাড়া ওই হিংস্র প্রাণীকে আর কেউ সামলাতে পারে না। ঘরের নিরাপদ আশ্রয়ে গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা হবার আনন্দে জেগে রইলাম মাঝরাত পর্যন্ত। আজ সকালে উইনচেস্টারে আসার জন্যে ছুটি পেতে অসুবিধে হলো না, কিন্তু তিনটের মধ্যে ফিরতেই হবে।

মি. আর মিসেস রিউক্যাসল বেড়াতে যাবে, ফিরতে রাত হবে, তাই ছেলেটার দেখাশোনা করতে হবে আমার। সব খুলে বললাম, মি. হোমস। এখন আপনি যদি বলেন এসবের অর্থ কী, আর এখন আমার কী করা উচিত, তা হলে অত্যন্ত খুশি হব আমি।'

এতক্ষণ হোমস আর আমি ভায়োলেট হাণ্টারের গল্প শুনছিলাম মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে। গল্প শেষ হতে উঠে পড়ল হোমস, দুই হাত পকেটে ঢুকিয়ে, পায়চারি করতে লাগল ভীষণ গম্ভীর মুখে।

'টলার এখনও মাতাল হয়ে আছে?' জানতে চাইল সে।

'হ্যাঁ। তার স্ত্রী মিসেস রিউক্যাসলকে বলছিল যে তাকে নড়ানো যাচ্ছে না।'

'ভাল। আর আজ রাতে রিউক্যাসল দম্পতি বাইরে যাচ্ছে?'

'হ্যাঁ।'

'বাড়িটায় শক্ত তালা দেয়া কোনও সেলার আছে?'

'আছে, ওয়াইন সেলার।'

'এ-পর্যন্ত অত্যন্ত সাহস আর বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন আপনি, মিস হাণ্টার। আর একটা কাজ করতে পারবেন? আপনি অসাধারণ মেয়ে না হলে এই অনুরোধ আমি করতাম না।'

'আমি চেষ্টা করব। কাজটা কী?'

'সাতটায় কপার বীচে যাব আমরা। আমার বন্ধু আর আমি। আশা করি ততক্ষণে চলে যাবে রিউক্যাসল দম্পতি, ওদিকে টলার আরও অসাড় হয়ে পড়বে। তা হলে ঝামেলা করার জন্যে থাকল শুধু মিসেস টলার। তাকে কোনও ছুতোয় সেলারে পাঠিয়ে তালাবদ্ধ করতে পারলেই আমাদের কাজ অনেকটা সহজ হয়ে যাবে।'

'যেভাবে হোক, কাজটা করবই আমি।'

'চমৎকার! এবার ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করা যাক। একটাই মাত্র সম্ভাব্য ব্যাখ্যা আছে এটার। আপনাকে ওখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে অন্য কারও ভূমিকায় অভিনয় করাবার জন্যে। আসল ব্যক্তিটিকে সেই ঘরে বন্দী করে রাখা হয়েছে। বন্দী আর

কেউই নয়, মিস এলিস রিউক্যাসল, আমেরিকা চলে গেছে বলে প্রচার করা হয়েছে যার কথা। আপনাকে পছন্দ করা হয়েছে তার সঙ্গে আপনার উচ্চতা, শারীরিক গঠন, এমনকী চুলের রঙ পর্যন্ত মিলে গেছে বলে। সম্ভবত অসুস্থতার কারণে চুল কেটে ফেলতে হয়েছিল তার, ফলে আপনার চুলগুলোও বিসর্জন দিতে হয়েছে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা তার কোনও বন্ধু–সম্ভবত প্রেমিক–তার পোশাক পরে থাকতে দেখে এবং হাসির শব্দ শুনে সে আপনাকে এলিস বলে ভুল করেছে। প্রকৃতির চেয়ে রহস্যময় আর কিছু নেই, সেজন্যেই মেয়েটির চালচলন, ভঙ্গি, গলার স্বর পর্যন্ত আপনার সঙ্গে হুবহু মিলে গেছে। রসিকতা করে মি. রিউক্যাসল আপনাকে হাসিয়েছে লোকটার কাছে এটা প্রমাণ করার জন্যে যে, তাকে ছাড়াই মিস রিউক্যাসল যথেষ্ট সুখী। রাতে কুকুরটাকে ছেড়ে দেয়া হয়, যেন সে কোনওমতেই মেয়েটির সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পারে। ঘটনার এই পর্যন্ত মোটামুটি পরিষ্কার। তবে সবচেয়ে মারাত্মক কথাটি লুকিয়ে আছে ছেলেটার আচরণের মধ্যে।'

'তার আচরণের সঙ্গে এই ঘটনার কী সম্পর্ক থাকতে পারে?' অবাক হয়ে বললাম আমি।

'প্রিয় ওয়াটসন, ডাক্তার হয়ে এই প্রশ্ন করা তোমার উচিত হলো না। তোমরাই তো বলো, পিতামাতার স্বভাব বিশ্লেষণ করলে সন্তানের স্বভাব বোঝা যায়। যদি তা-ই হয়, তা হলে উল্টোটাও কি যুক্তিগ্রাহ্য নয়? অনেক বার আমি সন্তানের স্বভাব বিশ্লেষণ করে তাদের পিতামাতার স্বভাব বুঝতে পেরেছি। ছেলেটার স্বভাব অত্যন্ত নিষ্ঠুর, সে নিষ্ঠুরতা করে নিষ্ঠুরতার খাতিরে। আমার সন্দেহ অনুসারে এই নিষ্ঠুরতা যদি সে পেয়ে থাকে তার রসিক পিতা, কিংবা বিষণ্ণ মাতার কাছ থেকে, তা হলে বন্দী মেয়েটির জন্যে তা বড়ই ভাবনার বিষয়।'

'আপনার ধারণা সম্পূর্ণ সঠিক, মি. হোমস,' বলল মিস

হাণ্টার। 'এই ধরনের কথা আমার মনেও দোলা দিয়েছে, কিন্তু নিশ্চিত হতে পারিনি। আমাদের বেচারি মেয়েটিকে সাহায্য করা উচিত।'

'অত্যন্ত সতর্ক থাকা প্রয়োজন, কারণ, ভীষণ ধূর্ত এক লোকের পাল্লায় পড়েছি আমরা। সাতটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে। তবে আশা করি আপনার সঙ্গে দেখা হবার পর রহস্যভেদ করতে বেশি সময় লাগবে না।'

ঠিক সাতটায় টাঙ্গা থেকে আমরা নামলাম কপার বীচের এক পাবলিক-হাউসের সামনে। অস্তগামী সূর্যের আলোয় বার্নিশ করা ধাতুর মত চকচক করছিল কপার বীচগুলোর পাতা। মিস হাণ্টার হাসিমুখে দরজায় দাঁড়িয়ে না থাকলেও বাড়িটা চিনতে আমাদের এতটুকু অসুবিধে হত না।

'কাজটা করতে পেরেছেন?' জানতে চাইল হোমস।

জোরে জোরে ধাক্কা মারার শব্দ ভেসে এল নীচতলা থেকে। 'ওই যে মিসেস টলার, সেলারে,' বলল মিস হাণ্টার, 'তার স্বামী রান্নাঘরে শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে। এই নিন, মি. রিউক্যাসলের সমস্ত চাবির ডুপলিকেট।'

'সত্যিই চমৎকার কাজ করেছেন আপনি!' প্রশংসা ঝরে পড়ল হোমসের গলায়। 'এবার পথ দেখান, এই অশুভ ঘটনার ইতি ঘটানো যাক।'

ওপরতলায় উঠে দরজার তালা খুললাম আমরা, তারপর প্যাসেজ ধরে গিয়ে উপস্থিত হলাম সেই ঘরটার সামনে। লোহার পাতের একপাশের রশি কেটে দিল হোমস, কিন্তু একে একে সব চাবি দিয়ে চেষ্টা করেও আরেক পাশে লাগানো তালাটা খুলতে পারল না। ভেতরে কোনও সাড়াশব্দ নেই, এই নীরবতা হোমসের মুখ গম্ভীর করে তুলল।

'আশা করি খুব বেশি দেরি হয়ে যায়নি,' বলল সে। 'মিস্ হাণ্টার, আপনাকে রেখে ভেতরে যাওয়াই মনে হয় আমাদের জন্যে

ভাল। ওয়াটসন, কাঁধ লাগাও, দেখি আমরা ভেতরে যেতে পারি কি না।'

আমাদের সম্মিলিত শক্তির ধাক্কায় হুড়মুড় করে খুলে পড়ল জীর্ণ দরজাটা। ছুটে দু'জনে গেলাম ভেতরে। ঘর শূন্য। আসবাব বলতে সেখানে জাজিম বিছানো একটা খাট, ছোট একটা টেবিল আর এক ঝুড়ি লিনেন। ওপরের স্কাইলাইট খোলা, ওই পথেই কোথাও চলে গেছে বন্দী।

'মিস হাণ্টারের মনোভাব আঁচ করতে পেরেছে শয়তানটা,' বলল হোমস। 'তাই আগেই সরিয়ে ফেলেছে তার শিকারকে।'

'কিন্তু কীভাবে?'

'দেখছি,' বলে উঠে পড়ল সে ছাদে। 'হুঁ, হালকা একটা মই, এটা দিয়েই কাজ সেরেছে শয়তানটা।'

'অসম্ভব,' বলল মিস হাণ্টার, 'তারা যাবার সময় ওখানে কোনও মই ছিল না।'

'ফিরে এসে মই লাগিয়েছে মি. রিউক্যাসল। লোকটা যেমন ধূর্ত তেমনি ভয়ঙ্কর। সিঁড়িতে এখন যে-পদশব্দ শুনতে পাচ্ছি, সেটাও মনে হয় তারই। ওয়াটসন, তোমার পিস্তলটা তৈরি রাখাই ভাল।'

তার কথা শেষ হতে না হতেই ঘরে ঢুকল মোটা একটা লোক, হাতে ভারি একটা লাঠি। তাকে দেখতেই চিৎকার দিয়ে দেয়ালের সঙ্গে সেঁটে গেল মিস হাণ্টার, কিন্তু কিছু করার আগেই লাফ দিয়ে দু'জনের মাঝখানে গিয়ে পড়ল শার্লক হোমস।

বলল, 'শয়তান, কোথায় রেখে এসেছ তোমার মেয়েকে?'

ঘরের চারপাশ ঘুরে মোটা লোকটার দৃষ্টি গেল খোলা স্কাইলাইটের দিকে।

'প্রশ্নটা তো আমারই তোমাদের করা উচিত,' চেঁচিয়ে উঠল সে, 'চোরের দল! হাতেনাতে ধরেছি তোমাদের, এবার আর কারও রক্ষা নেই! থামো, উচিত শিক্ষা দেব তোমাদের!' ঘুরে ছুটে সিঁড়ি

দিয়ে নেমে গেল সে।

'কুকুরটার কাছে গেল!' আঁতকে উঠল মিস হাণ্টার।

বললাম, 'ভয় পাবেন না, আমার পিস্তল প্রস্তুত।'

'সামনের দরজাটা বন্ধ করে দেয়াই ভাল,' চিৎকার দিয়ে উঠল হোমস, সঙ্গে সঙ্গে ছুটে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলাম আমরা। কিন্তু হলঘরে যাবার আগেই কানে এল কুকুরের গর্জন, আর তারপরেই একজন লোকের আর্তনাদ। লালমুখো, বয়স্ক এক লোক এল টলতে টলতে।

'হায় ঈশ্বর!' বলল সে। 'কে যেন কুকুরটাকে ছেড়ে দিয়েছে। দু'দিন থেকে ওটা কিছু খায়নি। চলুন! চলুন! দেরি করলে সর্বনাশ হয়ে যাবে!'

ছুটলাম হোমস আর আমি, পেছনে পেছনে টলার। প্রকাণ্ড কুকুরটা দাঁত বসিয়ে দিয়েছে মি. রিউক্যাসলের গলায়, আর মাটিতে পড়ে সে গোঙাচ্ছে। মাথায় পিস্তলের নল ঠেকিয়ে গুলি করলাম আমি, তার ওপরেই মুখ থুবড়ে পড়ল কুকুরটা। ধরাধরি করে মি. রিউক্যাসলকে নিয়ে গিয়ে আমরা শুইয়ে দিলাম ড্রয়িং-রুমের সোফায়, না মরলেও মারাত্মক জখম হয়েছে সে। টলারকে বললাম তার স্ত্রীকে ডাকতে, তারপর নজর দিলাম আহতের সেবায়। কিন্তু টলার যাবার আগেই ঘরে ঢুকল লম্বা, কৃশ এক মহিলা।

'মিসেস টলার!' বলল ভায়োলেট হাণ্টার।

'জি, মিস। মি. রিউক্যাসল ফিরে এসে ওপরে যাবার আগেই তালা খুলে দিয়েছিলেন আমার। মিস, আপনার পরিকল্পনা যদি বলতেন আমাকে, তা হলে আর আপনাদের অযথা এত পরিশ্রম করতে হত না।'

'আচ্ছা!' তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল হোমস তার দিকে। 'মনে হচ্ছে, এই বিষয়ে মিসেস টলারই সবার চেয়ে বেশি জানে।'

'জি, স্যার। আর যা জানি, সব খুলে বলতেও রাজি আছি।'

'বেশ, বেশ, তা হলে বসে ভাল করে বলো দেখি আমাদের। সত্যি বলতে কী, এখনও অনেক ব্যাপারে কিছুই জানি না আমি।'

'সব বুঝিয়ে দিচ্ছি,' বলল সে। 'সেলার থেকে বেরুতে পারলে আরও আগেই দিতাম। পুলিশ কেস হলে মনে রাখবেন, স্যর, আমি বরাবর আপনাদের পক্ষেই ছিলাম। মিস এলিসেরও বন্ধু ছিলাম আমি।

'মা মারা যাবার পর বাবা আবার বিয়ে করায় বাড়িতে কখনোই শান্তি পেতেন না মিস এলিস। কথাবার্তা এমনিতেই খুব কম বলতেন তিনি, এই ঘটনার পর একেবারে চুপ মেরে গেলেন। তবু দিন মোটামুটি ভালই কেটে যাচ্ছিল, কিন্তু এক বান্ধবীর বাড়িতে মি. ফাউলারের সঙ্গে পরিচিত হবার পর থেকেই শুরু হলো ঝামেলা। আমি যতদূর জানি, উইল বলে বিষয়-সম্পত্তির প্রায় সবটুকুই মিস এলিসের। এসব নিয়ে তিনি কখনও উচ্চবাচ্য করেননি, ফলে ভোগদখল বিষয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন মি. রিউক্যাসল। কিন্তু যেই তিনি মেয়ের বিয়ের সম্ভাবনা দেখলেন, তাঁর স্বার্থে ঘা লাগল। কারণ, মেয়ে সম্পত্তির দাবি না করলেও তাঁর স্বামী তো দাবি ছাড়বেন না। একটা কাগজ সই করিয়ে নেয়ার জন্যে মেয়ের ওপর চাপ দিতে লাগলেন তিনি, যে-কাগজের বলে মেয়ে বিয়ে করুন বা না করুন, সম্পত্তি ভোগে তাঁর কোনও অসুবিধে না হয়। কিন্তু মেয়ে যখন কিছুতেই সই করতে রাজি হলেন না, তখন তাঁর ওপর শুরু হলো অত্যাচার। অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে একসময় ব্রেইন-ফিভারে আক্রান্ত হলেন মিস এলিস, জীবন নিয়ে টানাটানি; দীর্ঘ রোগভোগের পর শেষমেশ তিনি সুস্থ হলেন বটে, কিন্তু সুন্দর চুলগুলো কেটে ফেলতে হলো, তিনি হয়ে গেলেন পূর্বের মিস এলিসের ছায়া। ধন্য ভালবাসা মি. ফাউলারের, এতকিছুর পরেও তিনি মিস এলিসকে ত্যাগ করলেন না।'

'আহ্,' বলল হোমস, 'এখন সবকিছু পরিষ্কার হয়ে গেল, বাদবাকিটা আমি ধারণা করতে পারছি। মিস এলিসকে বন্দী করে

রাখার বুদ্ধিটা তা হলে মি. রিউক্যাসলের?'

'জি, স্যর।'

'আর মিস হান্টারকে লণ্ডন থেকে আনা হলো নাছোড়বান্দা মি. ফাউলারের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে।'

'ঠিক, স্যর।'

'কিন্তু ভাল একজন নাবিকের মত ধৈর্যের কোনও শেষ নেই মি. ফাউলারের, টাকা-পয়সা বা অন্য কিছুর বিনিময়ে তিনি দলে টানলেন তোমাদের।'

'মি. ফাউলার একজন দরাজদিল ভদ্রলোক, হাত তাঁর খুব খোলা,' বলল মিসেস টলার।

'এই দরাজদিল, উদারহস্ত ভদ্রলোকটি লক্ষ রাখলেন, যেন তোমার ভাল মানুষটির মদ সরবরাহে কখনও টান না পড়ে। আর বললেন, মি. রিউক্যাসল বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ামাত্র যেন একটা মই প্রস্তুত রাখা হয়।'

'আপনার সব ধারণা সম্পূর্ণ সঠিক, স্যর।'

'উঁহু,' সব ধারণা নয়,' বলল হোমস, 'প্রথমটায় আমি ভেবেছিলাম, মি. রিউক্যাসল তার মেয়েকে সরিয়ে দিয়েছে। যা-ই হোক, সব খুলে বলে তুমি আমাদের অনেক উপকার করলে, মিসেস টলার। এবার আসছেন স্থানীয় সার্জন আর মিসেস রিউক্যাসল। চলো, ওয়াটসন, এখন আমাদের দায়িত্ব পালন করি আমরা, মিস হান্টারকে পৌঁছে দিই উইনচেস্টারে।'

কপার বীচের অশুভ বাড়িটার রহস্যের সমাধান হলো এভাবেই। প্রাণে বেঁচে গেলেও কর্মক্ষমতা সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলল মি. রিউক্যাসল, সে এখন তার স্ত্রীর সেবার ওপর নির্ভরশীল। তবে পুরানো ভৃত্যেরা এখনও তাদের সঙ্গে আছে, সম্ভবত মি. রিউক্যাসলের অতীত ইতিহাস এতটাই জানে তারা যে তাড়িয়ে দেয়া যায়নি। পালিয়ে যাবার পরদিনই বিশেষ লাইসেন্স নিয়ে সাউদাম্পটনে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন মি. ফাউলার আর মিস

এলিস রিউক্যাসল। মি. ফাউলার এখন সরকারি একটা চাকরি করছেন মরিশাসে। আর কেস শেষ হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে, আমাকে হতাশ করে, মিস ভায়োলেট হাণ্টার সম্বন্ধে যাবতীয় আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে আমার বন্ধু শার্লক হোমস। বর্তমানে মিস হাণ্টার ওয়ালশলের একটা প্রাইভেট স্কুলের প্রধান। আমার বিশ্বাস সেখানে। শিক্ষয়িত্রী হিসেবে সে অত্যন্ত সফল হয়েছে।

মূলঃ আর্থার কোনান ডয়েল
রূপান্তরঃ খসরু চৌধুরী

অতল পৃথিবী

এক

পেছনে দু'হাত মুড়ে পায়চারি করছেন জারগট। মাথার ভেতর চিন্তার তুফান বয়ে চলেছে। সমগ্র মানবজাতির অতীত ইতিহাস নিয়ে ভাবছেন তিনি।

ধাঁধায় পড়ে গেছেন জারগট। পণ্ডিত ব্যক্তি তিনি। পৃথিবীর গোটা ইতিহাসটাই প্রায় গুলে খেয়েছেন। তবুও এই মুহূর্তে অনেক রহস্যের সমাধান করতে পারছেন না।

জারগট যে সময়কার মানুষ, তাঁর ইতিহাসটা তিনি জানেন। আট হাজার বছরের পুরানো ইতিহাস। মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের অন্তর্দ্বন্দ্বের ইতিহাস। অল্প জায়গায় বেশি মানুষের ঠাসাঠাসি হলে যা হয় আর কী!

এ যুগের হিসাবে, বার্লিন থেকে কেপহর্ন পর্যন্ত সামান্য এক চিলতে জায়গা নিয়ে গত আট হাজার বছর কম লড়াই হয়নি। ডাঙা বলতে তো শুধু ওইটুকুই; আর নেই। বাকি সব পানি। সমুদ্র ঘিরে রেখেছে গোটা পৃথিবীটাকে। তাই আট হাজার বছরের ইতিহাসে কেবলই রক্ত ঝরার কাহিনি। জারগট যে সাম্রাজ্যের নাগরিক, তার একশো পঁচানব্বইতম বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়ে গেল এই কিছু দিন আগে। সাম্রাজ্যের নামটিও অদ্ভুত–'চার সমুদ্রের দেশ'। অর্থাৎ, এ দেশের চারদিকেই সমুদ্র। ডাঙা আর কোথাও নেই।

আট হাজার বছর ধরে এইটুকু দেশে মানুষজাতটা লড়ে

এসেছে একনাগাড়ে। প্রথমে দু'জনে হাতাহাতি, তারপর দশজনে, পরিবারে পরিবারে, দেশে দেশে।

লড়াইয়ের এই ইতিহাসটাকে মোট চার ভাগে ভাগ করা যায়। মোটামুটি তিনটি জাত মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল শেষের দিকে। তাদের মধ্যে একটা জাত প্রবল হলো, হারিয়ে দিল বাকি দুটো জাতকে।

সে সব আজ থেকে প্রায় দু'শো বছর আগেকার কথা। রক্তে ভেসে গেছে ছোট্ট ভূখণ্ড। স্থাপিত হয়েছে জারগটদের একচ্ছত্র সাম্রাজ্য—'চার সমুদ্রের দেশ'।

জারগট ভাবছেন, কীভাবে এই আট হাজার বছরের মানুষ জাতটা এগিয়ে চলেছে একটু একটু করে। প্রথমে লিখতে শিখল তারা। তারপর প্রায় শ'পাঁচেক বছর আগে একরকম ছাঁচ তৈরি করে একই লেখার অনেকগুলো কপি করার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হলো। এক চিন্তাকে অনেকের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে শিখল মানুষ।

তারপর একে একে এল কয়লা, স্টিম, মেশিন। বিদ্যুতের আবিষ্কার হলো মাত্র পঞ্চাশ বছর আগে। আকাশের বজ্রকে গোলাম বানিয়ে ছাড়ল মানুষ—জারগটের পিতা-পিতামহরা। কিন্তু মূল প্রশ্নের তো এখনও সমাধান হয়নি। মানুষ এই দুনিয়ার মালিক। কিন্তু কে এই মানুষ? কোথা থেকে আসে? যায়ই বা কোথায়?

ভূতত্ত্ব থেকে কিছুটা উত্তর অবশ্য পাওয়া গেছে। ভূত্বক পরীক্ষা করে জানা গেছে, পৃথিবীর মোট বয়স চার হাজার বছর। চার সমুদ্রের এই দেশ, দেশ না বলে মহাদেশ বললেও চলে, প্রথমে ছিল পানির তলায়। মাটির ধরন দেখেই বোঝা গেছে, সমুদ্রের তলা থেকে মাথা চাড়া দিয়ে ওপরে উঠে এসেছে 'চার সমুদ্রের দেশ'। কিন্তু কীভাবে? কোনও শক্তি অথই পানির গভীর থেকে ঠেলে তুলে দিয়েছে এতবড় দেশটাকে? পাহাড়ের গায়ে সামুদ্রিক পলিমাটির স্তর পরীক্ষা করে জানা গেছে এমনি আরও অদ্ভুত তত্ত্ব।

যেমন; মানুষ, পশু, পাদপ অর্থাৎ গাছপালা–সবকিছুরই উৎপত্তি সমুদ্র থেকে। পানি থেকে ডাঙায় উঠেই সামুদ্রিক গাছপালা ধীরে ধীরে মানিয়ে নিয়েছে, বাঁচিয়েছে অন্যান্য প্রাণীকেও। কিন্তু কিছু কিছু প্রাণী আর পাদপকে কোনও মতেই সামুদ্রিক প্রাণী বা পাদপের সমগোত্রীয় বলা চলে না। এরা যেন সৃষ্টি ছাড়া, সমুদ্রের সঙ্গে তাদের কোনও সম্পর্কই নেই।

দিশেহারা হয়ে পড়েছেন জারগট এই সমস্যা নিয়ে। এরা তা হলে এল কোথা থেকে?

আরও একটা জটিল প্রশ্ন খচ খচ করছে মাথার মধ্যে। প্রশ্নটা এই মনুষ্যজাতেরই পূর্ব পুরুষ সমন্ধীয়। ভূতত্ত্ববিদরা বলেছেন, পৃথিবীর সব ডাঙাই নাকি এককালে পানির তলে ছিল। পানি থেকেই সব কিছুর উৎপত্তি। কিন্তু অদ্ভুত ওই মাথার খুলিগুলো তা হলে এল কোথা থেকে? তারাও কি পানির তলায় ছিল?

মাটি খুঁড়তে গিয়ে খুলিগুলো দেখছেন জারগট। মানুষের খুলি, সন্দেহ নেই। কিন্তু বিভিন্ন সাইজের খুলি। দু'তিন হাজার বছরের খুলিগুলো আকারে ক্ষুদ্র, ধড়ের কঙ্কালটা সে তুলনায় বেশ বড়। কিন্তু আরও অতীতে গেলে দেখা যাবে খুলির সাইজ ক্রমশ বড় হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ, মস্তিষ্কের পরিমাণ ক্রমশ বেড়েছে। তার মানে, অতীতের মানুষ কি আজকের মানুষের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান ছিল?

না, কোনও সন্দেহই নেই তাতে। পুরাকালের মানুষেরা সত্যি অনেক বেশি বুদ্ধিমান ছিল।

ভারি আশ্চর্য ব্যাপার! তা হলে তো বিবর্তনতত্ত্ব মিথ্যে হয়ে যায়। পুরানো খুলিগুলোর বয়স নির্ণয় করে দেখা গেছে সেগুলো পঞ্চাশ হাজার থেকে বিশ হাজার বছর আগেকার। সেই সময় মানুষ কতখানি সভ্য হয়েছিল, তার ইতিহাস তো কোথাও নেই!

বিশ হাজার বছরের কথা ধরলেও মাথা ঘুরে যায়। তখনকার দিনের মানুষ যে জ্ঞানে গুণে জারগটদের তুলনায় অনেক বেশি

উন্নত ছিল, এ কথা ভাবতেও এখন হাসি পাবে।

কিন্তু কোথায় গেল সেই সভ্যতা? চল্লিশ হাজার বছর আগে যারা পৃথিবী জুড়ে দাপিয়ে বেড়িয়েছে, তাদের অস্তিত্ব? কোথায় সেই ইমারত, কলকব্জা, উন্নত সভ্যতার নিদর্শন? নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে? সেই কারণেই কি জারগটদের পূর্বপুরুষেরা নতুন করে লিখতে শিখেছে, বাষ্পচালিত মেশিন আবিষ্কার করেছে, আবার সৃষ্টি হয়েছে এক নতুন সভ্যতার?

অদ্ভুত! অবিশ্বাস্য! বরং অলৌকিক শক্তিতত্ত্বকে বিশ্বাস করা যায় আরও সহজে। প্রচণ্ড একটা শক্তি, যে শক্তির দাস এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, আট হাজার বছর আগে সৃষ্টি করেছিল প্রথম মানব 'হেডম' আর প্রথম মানবী 'হিভা'। তাদের বংশধররাই আজ এই পৃথিবীর বাসিন্দা।

কিন্তু 'হেডম' আর 'হিভা' শব্দ দুটো এল কোথা থেকে? জারগটদের ভাষায় তো এই তত্ত্ব নেই?

মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে এমনি কত বিস্ময়ই না ধরা পড়েছে। সামুদ্রিক মাটির স্তরে স্তরে সঞ্চিত যুগযুগান্তরের বিস্ময় মাথা ঘুরিয়ে ছেড়েছে জারগটদের। এক-এক যুগে এক-এক রকম সভ্যতার নিদর্শন উঠে এসেছে ভূ-গর্ভ থেকে। এ কী করে সম্ভব? একই জায়গা এতগুলো সভ্যতার উত্থান-পতন, সৃষ্টি-প্রলয় সম্ভব হয় কী করে? প্রকাণ্ড স্তম্ভ, সুদৃশ্য মর্মর মূর্তি, কারুকার্য খচিত পাথর, অদ্ভুত অস্ত্রশস্ত্র, বিচিত্র হরফ, অতি উন্নত সভ্যতার অতি স্পষ্ট নিদর্শন উঠে এসেছে মাটির তলের স্তর থেকে। বিশ হাজার থেকে চল্লিশ হাজার বছর আগে এই মাটিতেই তা হলে মানুষ সভ্যতার তুঙ্গে উঠে বসেছিল। কিন্তু এদেশ তো ছিল পানির তলে? তা হলে?

ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে গেল জারগটের। দিনের আলো এখনও ফুরোয়নি। হাঁটতে হাঁটতে বাগানের পেছন দিকটায় চলে এলেন তিনি। খোঁড়াখুঁড়ির কাজ চলছে এখানে। আজ ছুটির দিন। মজুররা তাই আসেনি। দু'দিন পরেই জারগটের সুবিশাল

ল্যাবোরেটরির দ্বিগুণ একটা ল্যাব গড়ে উঠবে এখানে।

এলোমেলো ছড়ানো রাজমিস্ত্রীদের যন্ত্রপাতির দিকে তাকিয়ে ছিলেন জারগট। ভাবছিলেন, কাজ শেষ হবে কদ্দিনে। এমন সময় পড়ন্ত রোদের আবছা আলোয় গহ্বরটা চোখে পড়ল তার।

উৎসুক হলেন জারগট। গহ্বর দেখে নয়, গর্তের মধ্যে আধখানা মাটি চাপা একটা অদ্ভুত জিনিস দেখে।

গর্তে নেমে জিনিসটা টেনে আনলেন জারগট। একটা কৌটো। বিচিত্র ধাতু দিয়ে তৈরি। এ ধাতুর চেহারাও কখনও দেখেননি তিনি। ধোঁয়াটে রঙ, দানা দানা চেহারা। অনেকদিন মাটি চাপার ফলে চেকনাই হারিয়েছে। চিড়ও খেয়ে গেছে কয়েক জায়গায়। ফাটা জায়গা দিয়ে দেখা যাচ্ছে ভেতরের আরেকটা কৌটোকে।

জোর করে খুলতে গেলেন জারগট। সঙ্গে সঙ্গে হাতের চাপে গুঁড়িয়ে গেল অজ্ঞাত ধাতুর কৌটোটা। বহু বছরের পুরানো তো। ধাতুর আর কিছু ছিল না ওটায়।

ভেতরের কৌটো থেকে বেরল একটা ম্যাড়মেড়ে পাণ্ডুলিপি। খুদে খুদে হরফে সুন্দর করে কী যেন লেখা রয়েছে তাতে। হরফগুলো অদ্ভুত! জীবনে দেখেননি জারগট।

আবিষ্কারের উত্তেজনায় কেঁপে উঠলেন তিনি। কাঁপতে কাঁপতেই ফিরে এলেন ল্যাবোরেটরিতে। মূল্যবান দলিলটা বিছিয়ে বসলেন টেবিলে।

বেশ বোঝা যায়, কেউ তার মনের কথা পাতার পর পাতা লিখে গেছে। কিন্তু এ ভাষা তো মানুষ কোনওদিন দেখেনি।

শুরু হলো জারগটের গভীর গবেষণা। এক বছর, দুই বছর করে পার হয়ে গেল অনেকগুলো বছর। সাধনায় কী না হয়! জারগটের একাগ্র সাধনাও বৃথা গেল না। অতীত ভাষার মূল সূত্রটা ধরে ফেললেন তিনি।

তারপর থেকেই সহজ হয়ে গেল কাজটা। দলিল পড়তে আর কোনও অসুবিধার সম্মুখীন হতে হলো না। শুধু পড়েই ক্ষান্ত হলেন

না জারগট, অনুবাদও করে ফেললেন নিজের ভাষায়।

এই সেই রোমাঞ্চকর কাহিনি।

দুই

২৪ মে, ২...সাল, রোজারিও।

কীভাবে শুরু করব ভেবে পাচ্ছি না। ঘটনার শুরু তো অনেক আগে থেকেই। এতদিন মাথার মধ্যে সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল। তাই ঠিক করেছি লিখে রাখব। কিন্তু কীভাবে? ডায়েরি লেখার কায়দায় বরং লেখা থাক।

কিন্তু সমস্যা হয়েছে, কী ভাষায় লিখব? ইংরেজি আর স্প্যানিস বলতে পারি গড় গড় করে। তবে এ কাহিনি মাতৃভাষায় লেখাই ভাল। মানে, ফরাসি ভাষায়।

হ্যাঁ, আমি জাতে ফরাসি। টাকা রোজগার করতে এসেছি মেক্সিকোতে। একটা রুপোর খনির মালিক আমি। দেদার টাকা কামিয়েছি। ইচ্ছে আছে, ধনভাণ্ডার নিয়ে বুড়ো বয়সে স্বদেশে ফিরে যাব।

রোজারিও জায়গাটা সমুদ্রের ধারে। পাহাড়ের গায়ে আমার ভিলা। ভারি চমৎকার। অনেকটা ছবির মত করে সাজানো। আমার জমির আঙুর বাগানটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে সমুদ্রের তীর ঘেঁষে। একশো গজ উঁচু একটা খাড়া পাথরের মাথায় গিয়ে শেষ হয়েছে সেটা। ওপরে দাঁড়িয়ে একশো গজ নীচের দামাল সমুদ্রকে দেখতে বড় ভাল লাগে।

ভিলার পেছনেও দেড় হাজার গজের মত ওপরে উঠে গেছে একটা পাহাড়। বাঁধানো রাস্তা আছে চূড়া পর্যন্ত। মোটরে চেপে কতবার যে চূড়ায় উঠেছি তার ঠিক নেই। দামি মোটর তো, পঁয়ত্রিশ হর্স পাওয়ার ইঞ্জিন। এ মোটরে চড়ার আমেজই আলাদা।

ভিলায় থাকি আমার পঁচিশ বছরের ছেলে জাঁ, পালিত কন্যা হেলেন আর চাকরবাকর নিয়ে। মনে মনে ইচ্ছা ছিল, হেলেনকে পুত্রবধূ করব যথাসময়ে।

চব্বিশ তারিখে আড্ডা মারছিলাম বাগানে বসে। চারদিক ঝলমল করছে ইলেকট্রোজেনিক আলোর ছটা। মান্যগণ্য অতিথিদের মধ্যে রয়েছেন কিছু অ্যাংলো স্যাক্সন এবং কিছু মেক্সিকান। মোট পাঁচজন অতিথি।

তাঁদের মধ্যে ডক্টর বাখুর্স্ট প্রথম দলে পড়েন, মানে অ্যাংলো স্যাক্সন। ডক্টর মোরেনো দ্বিতীয় দলে, মানে মেক্সিকান। দু'জনের মধ্যে অদ্ভুত মনের মিল। তবে কথাবার্তায় দু'জন দুই মেরুর বাসিন্দা।

সেদিনও তর্ক লাগল দুই পণ্ডিতে। ডক্টর বাখুর্স্ট ধার্মিক মানুষ। তিনি বললেন, 'ঈশ্বরই আদম আর ইভকে প্রথম সৃষ্টি করেছেন। বাদবাকি মানুষের সৃষ্টি ওই দু'জন থেকেই।' ভদ্রলোকের আড়ষ্ট জিভে অবশ্য আদমকে এদেম আর ইভকে ইভা বলে মনে হলো।

বন্ধুর কুসংস্কার শুনে যথারীতি টিটকারি ঝাড়লেন ডক্টর মোরেনো। সঙ্গে সঙ্গে রেগে টং হয়ে গেলেন বাখুর্স্ট, চেঁচিয়ে উঠে বললেন, 'বিজ্ঞান যতই উন্নতি করুক না কেন, মহান শক্তিকে কখনোই অস্বীকার করা যায় না। অবশ্য আজকের পৃথিবী দেখলে ট্যারা হয়ে যেত আদম, তাই বলে নন্দনকাননকে টেক্কা দেয়া যেত কি?'

পাছে সন্ধ্যাটা মাটি হয়ে যায় তর্কাতর্কিতে, আলোচনার মোড় অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিলাম আমি। শুরু হলো বিজ্ঞানের প্রগতি নিয়ে মুখরোচক আড্ডা। মশগুল হয়ে গেলাম বিজ্ঞানের জয়-জয়কার নিয়ে। সৃষ্টির প্রথম প্রভাতে মানুষ জাতটা ভাবতেও পারেনি, এত উন্নতি করবে। চরম উন্নতি বোধহয় একেই বলে।

'কথাটি ঠিক নয়,' গম্ভীরভাবে বললেন প্রেসিডেন্ট মেনডোজা। 'চরম উন্নতি এর আগেও ঘটেছিল। তবে লোপ পেয়ে গেছে।'

'যেমন?' এক সঙ্গে উদগ্রীব হয়ে উঠলাম সবাই।

'ব্যাবিলন!'

তার কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে হেসে গড়িয়ে পড়লেন কয়েকজন। ব্যাবিলনের সভ্যতার সঙ্গে দু'হাজার সালের সভ্যতার তুলনা চলে নাকি?

কিন্তু প্রেসিডেন্টও নাছোড়বান্দা। আবার হুট করে বলে বসলেন, 'মিশরীয়রাও কম যায় না।'

আরও জোরে হেসে উঠলাম আমরা সবাই।

এবারে শেষ উদাহরণটি ঝাড়লেন প্রেসিডেন্ট; বললেন, 'আটলান্টিয়ানদের কাহিনিকে কিংবদন্তী বলে উড়িয়ে দেয়াটা কিন্তু ভুল। আটলান্টিস যেমন সভ্যতার শিখরে উঠে আটলান্টিকের তলায় সমাধিস্থ হয়েছে, কে জানে, যুগ-যুগ ধরে এমনি আরও কত সভ্যতা চরম উন্নতি করেও মাটির তলে হারিয়ে গেছে কিনা! কেউ কারও খবর রাখে না। জানি না বলেই কি তাদের ইতিহাসকে উড়িয়ে দিতে হবে?'

'অসম্ভব!' গাঁক গাঁক করে চেঁচিয়ে উঠলেন ডক্টর বাখুর্স্ট। 'আজকের সভ্যতার কথাই ধরুন না। গোটা পৃথিবীটা পানির তলে সেঁধিয়ে না গেলে এ সভ্যতা কখনও নিশ্চিহ্ন হবে না। কিন্তু তা যখন সম্ভব নয়, সভ্যতার চিহ্ন থেকে যাবেই। অতীতেও যদি সেরকম কোনও সভ্যতা থাকত, চিহ্ন রয়েই যেত।'

আর ঠিক তখুনি শুরু হয়ে গেল এক মহা প্রলয় সঙ্কেত। আচম্বিতে।

তিন

ডক্টর বাখুর্স্টের জবাব শুনে দমে গিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট মেনডোজা। কিন্তু হারবার পাত্র তিনি নন। তাই গম্ভীর গলায়

বললেন, 'গোটা পৃথিবীটাই যে একদিন পানির তলায় সেঁধিয়ে তলিয়ে যাবে না, এ কথা কিন্তু কেউ নিশ্চিতভাবে বলতে পারেন না। অসম্ভবও সম্ভব হয় অনেক সময়।'

আমরা যেই সমস্বরে 'বাজে কথা' বলে চেঁচিয়ে উঠেছি, ঠিক সেই মুহূর্তে শোনা গেল আওয়াজটা। থরথর করে কেঁপে উঠল পায়ের নীচের জমি। মাটি যেন ধসে যেতে চাইল নীচের দিকে। ভয়ানকভাবে টলমল করে উঠল গোটা ভিলাটা।

ঘাবড়ে গেলাম সবাই। উঠে দাঁড়িয়ে ভাবছি, এ আবার কীসের প্রলয়। এমনসময় গোটা ভিলাটা ভেঙে পড়ল হুড়মুড় করে। এমনই কপাল, ভাঙা ভিলার ইঁট, কাঠ, পাথরের তলায় পিষ্ট হয়ে গেলেন প্রেসিডেন্ট মেনডোজা আর আমার খাস চাকর জামেন।

পরক্ষণেই শুনলাম তারস্বরে চেঁচাচ্ছে র‍্যালে, এই ভিলার মালি সে, 'সমুদ্র! পালাও! সমুদ্র! মৃত্যু ধেয়ে আসছে পেছনে—পালাও, পালাও!'

ঘুরে দাঁড়ালাম। এ কী দৃশ্য! পৃথিবীর সব ক'টা সমুদ্র যেন উঠে এসেছে আমার বাগানের মধ্যে। একশ' গজ উঁচু পাহাড়টা তলিয়ে গেছে পানির নীচে। বিপুল জলোচ্ছ্বাস এগিয়ে আসছে এদিক পানে। বউ-বাচ্চা নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে র‍্যালে, আর চেঁচাচ্ছে বিকট কণ্ঠে, 'পালাও! পালাও! সমুদ্র!'

স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। এ কী দৃশ্য দেখছি? আচম্বিতে চারদিকের সব দৃশ্য যেন পাল্টে যাচ্ছে। হু হু করে ধেয়ে আসছে সমুদ্র।

কিন্তু সত্যিই কি সমুদ্র এগোচ্ছে? ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম। সমুদ্র কিন্তু স্থির, নিস্তরঙ্গ। কিন্তু বিপুল বেগে বাগান নেমে যাচ্ছে পানির তলে।

চকিতে বুঝলাম, কী সর্বনাশটা ঘটতে চলেছে পৃথিবীর বুকে। সমুদ্র ওঠেনি, ডাঙা নেমে যাচ্ছে পানির দিকে। এই জন্যই তখন কেঁপে উঠেছিল পায়ের তলার মাটি। গোটা ভূখণ্ডটাই ধীরে ধীরে তলিয়ে যাচ্ছে অতলে। প্রতিটি মুহূর্তে পাল্টে যাচ্ছে তটরেখা।

পানি এগোচ্ছে প্রতি মিনিটে ছ'ফুট। অর্থাৎ ঘণ্টায় পাঁচ মাইল। তারমানে আর মাত্র তিন মিনিট হাতে আছে। তার পরেই পানি এসে হুমড়ি খেয়ে পড়বে আমাদের ওপর।

চোখের পলকে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম। হেঁকে উঠলাম জোর গলায়, 'গাড়ি বের করো। জলদি!'

মুহূর্তে বুঝে ফেলল সবাই আমার মতলব। বিদ্যুৎ গতিতে হিড়হিড় করে গ্যারেজ থেকে টেনে আনল গাড়িটাকে। পেট্রোল ভর্তি করেই চাবি ঘোরাল ইগনিশনের। সবাই উঠে বসতেই ঝাঁকুনি দিয়ে সামনে এগোল গাড়িটা। বাগানের গেট খুলে লাফ দিয়ে পেছনের স্প্রিং ধরে ঝুলতে লাগল র‍্যালে।

শুরু হলো মৃত্যুর সাথে পাল্লা। পানি চাইছে আমাদের গোগ্রাসে গিলতে, আর আমরা চাইছি নিজেদের পৈত্রিক প্রাণটা বাঁচাতে। হু-হু করে ছুটছে যন্ত্রদানব, তবু মনে হচ্ছে আরেকটু দ্রুত ছুটলে বেঁচে যেতাম এ যাত্রা। কেননা, সমুদ্রও উঠে আসছে সমান গতিতে। আর মাত্র দশ-পনেরো হাত দূরে দেখা যাচ্ছে তার রুদ্র রূপ।

আচমকা রাস্তার একটা পাথরে লেগে থেমে গেল গাড়িটা। দমও বোধহয় ফুরিয়ে এসেছিল। একটানা এতটা খাড়া পথ ওঠা কম কথা নয়।

দেখতে দেখতে পানি পৌঁছে গেল পেছনে পরক্ষণেই গ্রাস করল চাকার অর্ধেকটা অংশ। হায়, ঈশ্বর! কোনও লাভই হলো না তা হলে।

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে ঝাঁকুনি দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেল যন্ত্রদানব। কারণটা বুঝলাম একটু পরে, র‍্যালের স্ত্রীর আর্তনাদে।

পানির ধাক্কায় স্প্রিং ধরে ঝুলতে থাকা বেচারি র‍্যালে খসে পড়েছে নীচে। হঠাৎ ওজন কমে যাওয়ায় পূর্ণোদ্দমে ছুটতে শুরু করেছে গাড়ি।

ড্রাইভার সিমোনাট দক্ষ লোক। আরও একঘণ্টা এইভাবে

ছুটলে চূড়োয় পৌঁছুব আমরা। কিন্তু তারপর?

ভাগ্য খারাপ। আচমকা ককিয়ে উঠে আবার থেমে গেল গাড়ি। রাগে খিস্তি দিয়ে উঠল কয়েকজন, 'শাল্লা!'

'কী হলো, ইঞ্জিন বিগড়েছে নাকি?' চেঁচিয়ে উঠে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

নীরবে আঙুল তুলে সামনে ইঙ্গিত করল সিমোনাট। দেখলাম, দশগজ দূরে রাস্তা বলে আর কিছু নেই। যেন ছোরা দিয়ে নিখুঁত ভাবে কেটে নেয়া হয়েছে ওপাশের জমি। নিঃসীম শূন্যতায় ঝিমিয়ে পড়েছে সব কিছু।

পেছনে ধেয়ে আসছে পানি। মনে মনে ইষ্ট নাম জপতে শুরু করলাম সবাই। জানি না কী লেখা আছে ভাগ্যে।

ঠিক সেই মুহূর্তে আবার কেঁপে উঠল মাটি। একই সঙ্গে থেমে গেল উন্মত্ত জলোচ্ছ্বাস। অবাক হয়ে দেখলাম, পানি আর উঠছে না। ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আসছে সমুদ্র।

ধড়ে প্রাণ ফিরে এল সবার। বুঝতে পারলাম, সামনে খাদ আর পেছনে পানি, মাঝে আমরা কয়েকজন আতঙ্কিত মানুষ। এভাবেই বেঁচে থাকতে হবে নাকি? কী জানি!

চার

গভীর রাত। আচমকা ভীষণ আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল আমার। রাস্তা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে সীমাহীন শূন্যতা থেকে প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাসের শব্দ ভেসে আসছে এদিকে। ঢেউয়ে ঢেউয়ে যেন সংঘর্ষ চলছে। ফেনা আর পানির স্প্রে ভিজিয়ে দিচ্ছে সর্বাঙ্গ।

তারপর আস্তে আস্তে সব থেমে গেল...নিবিড় নৈঃশব্দ চেপে বসল দিগ্বিদিকে... ফর্সা হয়ে এল আকাশ...ভোর হলো...

পাঁচ

২৫ মে।

ছোট্ট একটা দ্বীপে বন্দী আমরা। লম্বায় দেড় হাজার গজ আর চওড়ায় পাঁচশো গজ হবে দ্বীপটার মাপ। এক সময় উত্তর, দক্ষিণ আর পশ্চিমে শুধু পাহাড় ছাড়া কিছু দেখা যেত না। এখন সেখানে থৈ থৈ করছে পানি। পূর্ব দিকের দৃশ্য আরও ভয়ঙ্কর। গতকালও সেখানে মেক্সিকো দেখেছি আমি। একরাতেই সে সব ধুয়ে মুছে হাওয়া! মেক্সিকো এখন পানির তলায়।

খিদে আর তৃষ্ণায় অবসন্ন হয়ে পড়েছিলাম। এখন এল মন ভরা হতাশা। খাবার নেই, বিশুদ্ধ পানি নেই, বাঁচবার কোনও পথও নেই। মরতেই হবে তা হলে?

ছয়

৪ জুন, 'ভার্জিনিয়া'র ডেক।

মেলবোর্ন থেকে 'ভার্জিনিয়া' জাহাজটা যাত্রা শুরু করে মাসখানেক আগে। চব্বিশে মে রাতে সমুদ্রে হঠাৎ বড় বড় ঢেউ দেখতে পায় ক্যাপ্টেন, তার বেশি কিছু নয়। এর থেকে কিছু আশা করা যায় না।

মেক্সিকোর কাছে এসে ভার্জিনিয়া দেখে শুধু পানি আর পানি। মাঝে একটা পুঁচকে দ্বীপ। রোজারিও নেই। মেক্সিকোও নেই।

ছোট্ট সেই দ্বীপে পড়ে রয়েছে এগারোটি নিথর দেহ। দু'জন মৃত, ন'জন মুমূর্ষু।

এই দশটা দিন কীভাবে কেটেছে ঈশ্বর জানেন। উইলিয়াম

আর রোলিং মারা গেছে। বাকি ন'জন বেঁচে গেছি স্রেফ ভাগ্যের জোরে।

ক্যাপ্টেন আমাদের তুলে নিলেন ভার্জিনিয়ার ডেকে।

সাত

আট মাস পানিতে ভাসছি। সময়ের হিসাব জানি না।

মাসটা জানুয়ারি কি ফেব্রুয়ারি, সঠিক বলতে পারছি না। মাসের হিসাব রেখেই বা আর করব কী? যা আছে কপালে, হবে।

ক্যাপ্টেন আমাদের জাহাজে তুলে বেরিয়েছিলেন মেক্সিকোর সন্ধানে। কিন্তু পুব দিক অনেকটা গিয়েও মেক্সিকোর দেখা পাননি। পানি ছাড়া কোথাও কিছু নেই।

তারপরেও অব্যাহত থেকেছে যাত্রা।

কিন্তু এক সময়ে কয়লাও ফুরিয়ে গেল। চোদ্দই জুলাই পাল তুলে দিতে হলো জাহাজের।

তার পরপরই পড়লাম রাক্ষুসে ঝড়ের কবলে। একটানা পঁয়ত্রিশ ঘণ্টা চলল জীবনমরণ টানাটানি। উনিশ আগস্ট আকাশে রোদ্দ হাসতেই কম্পাস নিয়ে বসলেন ক্যাপ্টেন! দ্রাঘিমা আর লঘিমা বের করে যা বললেন, শুনে চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেল আমাদের।

আমরা যেখানে ভাসছি, এককালে সেখানে ছিল পিকিং!

তারমানে এশিয়ার হালও আমেরিকার মত হয়েছে? দুটি মহাদেশই তলিয়ে গেছে জলতলে?

আরও দক্ষিণ-পশ্চিমে এগোতেই জলজ্যান্ত প্রমাণ পেলাম। তিব্বত নেই, হিমালয় নেই, ভারত নেই। ধেই ধেই নাচছে শুধু উত্তাল জরলাশি!

তবু ভেসে চললাম দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। কীসের আশায় ছুটে চলেছি জানি না। মহাদেশের পর মহাদেশের অতল

সমাধি দেখেও আর চমকে উঠছি না। সব সয়ে গেছে। তাই উরাল পর্বতমালাকে নিশ্চিহ্ন হতে দেখে বুঝলাম, আফ্রিকাও এখন পানির তলায়।

ক্রমেই ভীষণ সত্যটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। কিন্তু গা-সওয়া দৃশ্য দেখে আর আঁতকে উঠতাম না। বলতাম না, 'এইখানে ছিল মস্কো...ওয়ারশ...বার্লিন... ভিয়েনা...রোম... সেণ্টলুই... মাদ্রিদ। ট্রাজেডি বেশি হলে আর ট্রাজেডি বলে মনে হয় না। গোটা ইউরোপটাই যদি তলিয়ে যায় তো আমার কী?

কিন্তু সহ্যশক্তিও একদিন বাঁধ ভাঙল, সেদিন প্যারিসের ওপর এসে পৌঁছুল ভার্জিনিয়া। অনুভব করলাম, অনেক পানির গভীরে ডুবে রয়েছে আমার মাতৃভূমি। সিমোনাট কেঁদে ফেলল ঝরঝর করে।

চারদিন পর দেখলাম এডিনবরাও নেই। নেই লণ্ডনও।

তারপরেই ফুরিয়ে গেল জাহাজের খাবার-দাবার। ভাঁড়ার শূন্য। একটা বিস্কুট পর্যন্ত নেই।

শুরু হলো অনাহার। সাত মাস পর ফের অনুভব করলাম, অনাহারের তীব্রতা কী সাংঘাতিক। জাহাজসুদ্ধ লোক নেতিয়ে পড়ল খিদের জ্বালায়। খুব সম্ভব আট জানুয়ারি হঠাৎ ডাঙার মত কী যেন একটা চোখে পড়ল পশ্চিমে।

আমার ভাঙা গলার চিৎকার শুনে লাফ দিয়ে উঠল মুমূর্ষু যাত্রীরা। ছুটে এল ডেকে।

কিন্তু এ কী দৃশ্য! অথই আটলাণ্টিকের মাঝে এ ডাঙা তো কস্মিনকালেও ছিল না!

আরও কাছে গেলাম। নামেই ডাঙা, প্রাণের চিহ্ন নেই কোথাও। গাছাপালাও চোখে পড়ল না। রুক্ষ কালো পাহাড় মাথা তুলে আছে এদিকে-সেদিকে। এ হেন ঊষর দৃশ্য চোখে দেখা যায় না।

উপকূলের ফাঁকে সরু পথ পেলাম অবশেষে। ভেতরে ঢুকল

জাহাজ। পানি সেখানে নিস্তরঙ্গ। প্রকৃতির তৈরি অপরূপ একটি বন্দর যেন।

ডাঙায় নেমে দেখলাম, ছোট ছোট হ্রদ রয়েছে বিস্তর। কিন্তু কোনও পানিই সুপেয় নয়, নোনতা।

জমিতে এককালে পুরু কাদা ছিল। এখন সেগুলো শুকিয়ে ফেটে ঝুরঝুর করে পড়ছে।

তারমানে এই জমি আগে আটলাণ্টিকের গভীরে ছিল। তাই জীবনের কোনও চিহ্ন নেই ডাঙায়।

জলজ প্রাণী পেলাম বিস্তর। পাথরের খাঁজে খাঁজে অগুনতি কচ্ছপ আর শামুক আস্তানা গেড়েছে। চিংড়ি আর কাঁকড়ারও অভাব নেই। মাছ তো লাখে লাখে।

আর যাই হোক, না খেয়ে মরতে হবে না এখানে।

জাহাজের নোঙর পড়ল অবশেষে, দীর্ঘ আট মাস পর। সমস্ত জিনিসপত্র নামিয়ে আনলাম ডাঙায়। শুরু হলো মুষ্টিমেয় ক'জন মানুষের নতুন করে বাঁচার যুদ্ধ।

জানি না, এইটুকু জায়গায় শেষ পর্যন্ত বাঁচতে পারব কিনা। তবুও লিখে রাখছি সব কথা ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্যে। কিন্তু আদৌ তারা আসবে কি?

আট

...সয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে।

কতদিন নেমেছি এই প্রাণহীন দেশে, তার হিসাব নেই। ডক্টর মোরেনো অবশ্য আন্দাজে বললেন, 'মাস ছয়েক তো বটেই।'

ছ'মাস! কম সময় নয়। ছ'টা মাস কেটে গেল জনপ্রাণহীন এই পাথুরে দেশে?

এই ছ'টা মাস ব্যস্ত থেকেছি কেবল পেটের চিন্তায়। উদয়াস্ত

হন্যে হয়ে ঘুরেছি খাবারের সন্ধানে। রাত্রে ঘুমিয়ে পড়েছি সীমাহীন ক্লান্তি নিয়ে। মাছ দেদার আছে ঠিকই, কিন্তু আমাদের ভয়ে লুকিয়ে থাকে। ধরা মুশকিল। কচ্ছপের ডিম আর সামুদ্রিক উদ্ভিদ খেয়ে বেঁচে আছি কোনমতে।

ভার্জিনিয়ার পালটা খুলে এনে একটা তাঁবু বানিয়েছি। পরে আরও ভাল ছাউনি তৈরি করব।

মাঝে মাঝে গুলি করে পাখি মেরে খাই। প্রথমে একটা পাখিও দেখা যায়নি। আস্তে আস্তে যাযাবর পাখিরাও উড়ে এল আমাদের মত খিদের জ্বালায়। উইলো, অ্যালবেট্রস ইত্যাদি নানা রকম পাখি দিনরাত ডানা মেলে ঝটপটিয়ে উড়ত আমাদের তাঁবুর চারপাশে। হাত দিয়েও ধরা যেত, গুলি খরচ করতে হত না।

ভাগ্য সুপ্রসন্ন বলতে হবে। জাহাজের খোলে একবস্তা গম পাওয়া গেছে। সবাই চেয়েছিল, পুরো বস্তাটাই রুটি তৈরির জন্যে সরিয়ে রাখা হোক। আমরা ক'জন রাজি হইনি। বস্তার অর্ধেক গম দিয়ে গমের চাষ আরম্ভ করেছি। জানি না কপালে কি আছে। প্রথম দিকে মাটিতে নুন ছিল খুবই। কিন্তু তুমুল বৃষ্টির পর ওপরের নুন ধুয়ে গেছে। খানাখন্দে বৃষ্টির পানি জমে মিষ্টি পানির লেকও সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু নদীর পানি এখনও নোনতা। মাটির তলায় যে নুন রয়েছে, নদীতে মিশে যাচ্ছে সেই নুন ধীরে ধীরে।

দোআঁশলা মাটিতে বালি থাকলেও শেষ পর্যন্ত গম চাষ সার্থক হবে বলে মনে হয়। দেখি...

দু'বছর হয়ে গেল। গমের ফলন ভালই হয়েছে। পাখির সংখ্যাও বেড়েছে। ওরাও খেয়ে বাঁচছে।

নয়

ক'জন মারা গেছে আগেই লিখেছি। কিন্তু আমাদের সংখ্যা কমেনি।

বরং বেড়েছে। আমার ছেলে আর হেলেনের বাচ্চা-কাচ্চাই তো তিনজন। আরও তিনটে সংসারেও বাচ্চার সংখ্যা ওই রকম। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল কচিকাঁচার মুখ দেখে ভাবি, সংখ্যায় কমে এসেছি বলেই কি মানুষজাতটার মধ্যে স্বাস্থ্য ফিরে এল?

দশ বছর হয়ে গেল, অথচ নতুন মহাদেশের চেহারাও দেখা হয়নি। অলস হয়ে গেছি। অ্যাডভেঞ্চারের স্পৃহা ভোঁতা হয়ে গিয়েছিল। খুঁচিয়ে জাগালেন বাখুর্স্ট। তাঁরই ঠেলায় জাহাজ মেরামত করা হলো। তারপর দল বেঁধে বেরিয়ে পড়লাম দেশ দর্শনে।

ভেতর দিকে ঢুকে আগ্নেয়গিরি দুটোকে দেখতে পাব ভেবেছিলাম। অ্যাজোরস আর ম্যাডিরা এককালে কম উৎপাত করেনি আটলাণ্টিকের নীচে। আগুন বমি করে লণ্ডভণ্ড করে ছেড়েছে আটলাণ্টিককে। এখন যখন পানির তলা থেকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, ভেবেছিলাম দেখতে পাব। কিন্তু দেখলাম কেবল জমাট লাভার স্তর।

আগ্নেয়গিরির চিহ্ন নেই—আছে শুধু আগ্নেয়শিলা। দেখলেই বোঝা যায়, অগ্নি-পাহাড় দারুণ দাপাদাপি করেছে সেখানে।

আশ্চর্য আবিষ্কারটা ঘটল এইখানেই। অ্যাজোরস অগ্নি-পাহাড় যে অক্ষাংশে থাকার কথা, সেইখানে পেলাম অনেক থাম, থালা-বাসন এবং প্রস্তর মূর্তি। বেশ বুঝলাম, অতীতের লুপ্ত সভ্যতা। কিন্তু এ সভ্যতা আমাদের সভ্যতা নয়—তারও আগের। লস্ট আটলাণ্টিস!

হ্যাঁ, ডক্টর মোরেনো ঠিকই ধরেছেন। সুদূর অতীতের সেই আশ্চর্য মহাদেশ আটলাণ্টিস জলতলে নিমজ্জিত হয়েও ফের ঠেলে উঠেছে পানি থেকে। বিধাতার কী বিচিত্র লীলা! একই ভূমিখণ্ডে বিভিন্ন মানুষ জাতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কী অদ্ভুত ইতিহাস!

আটলাণ্টিসের কিংবদন্তী তা হলে অলীক নয়? সংহার দেবতা এই দেশকে টেনে নিয়েছেল পানির তলায়। অ্যাজোরেসের

অগ্ন্যুৎপাতে ফের উঠে এসেছে পানি থেকে ওপরে?

কিন্তু অতীত নিয়ে খামোকা ভেবে সময় নষ্ট করতে চাই না। আমরা এখন বাঁচতে চাই। বাঁচার তাগিদেই এগিয়ে চললাম। অবাক হলাম সবুজের চিহ্ন দেখে। আগে কিছুই ছিল না। খুব সম্ভব পাখিরা বীজ এনে ফেলেছে মাটিতে। সেই বীজই এখন গাছ হয়ে ছেয়ে ফেলেছে ভূখণ্ড! প্রাণকে যেন আর ধরে রাখা যাচ্ছে না।

কিন্তু এসব গাছপালার চেহারাও তো কোনওকালে দেখিনি। যে কোনও অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নেয়ার অদ্ভুত ক্ষমতা রয়েছে নামগোত্রহীন এই উদ্ভিদগুলোর। এককালে হয়তো পানির তলায় ছিল। পানি থেকে ওঠার পর মরে গিয়েছিল রোদের তেজে। তারপর বৃষ্টির পানি জমেছে। সৃষ্টি হয়েছে পুকুর আর হ্রদের। অদ্ভুতভাবে নতুন নতুন জলজ উদ্ভিদ তরতাজা চেহারা নিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। ডাঙায় উঠে এগোচ্ছে আরও ভেতরে। তারপর একেবারে পানির সংস্পর্শ এড়িয়ে গাছ হয়ে যাচ্ছে। পরিবর্তনটা ঘটছে খুব দ্রুত। প্রথমেই ভয়ে ভয়ে উঁকি দিচ্ছে কুঁড়ি, ফুটছে কচি পাতা। তারপরেই ভয় ঝেড়ে ফেলে মানিয়ে নিচ্ছে নতুন জল হাওয়ার সঙ্গে।

শুধু এক্ষেত্রেই নয়। একই পরিবর্তন দেখছি প্রাণী রাজ্যেও। মাছেদের এখন ডানা গজিয়েছে। ঝাঁকে ঝাঁকে ডাঙায় উড়ে আসছে উড়ন্ত মাছেরা। মাছ না বলে তাঁদের পাখি বলাই উচিত...

দশ

সবাই বুড়ো। ক্যাপ্টেন মরিস মারা গেল আজ। এখন দিন গুনছি আমরা বুড়োরা। আমি আটষট্টি। ডক্টর বাখুর্স্ট পঁয়ষট্টি। ডক্টর মোরেনো ষাট। মরবার আগে হাতের কাজ শেষ করতেই হবে, যেভাবেই হোক।

কিন্তু কী করব এত লিখে? কে দেখবে? বংশধরেরা? হায়রে!

এ দৃশ্যও দেখতে হলো আমাদের। ছেলেমেয়ে তো পিলপিল করছে গোটা তল্লাটে। একে স্বাস্থ্যকর জায়গা, তার ওপর হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের ভয় নেই, সুতরাং জরা, মৃত্যু অভাবনীয়। বছর বছর সংখ্যা বেড়ে চলেছে আমাদের কলোনির।

এই কলোনিতে শিক্ষিত মানুষ বলতে আমরা এই ক'জন। মানে, আমি আর আমার ছেলে, ডক্টর বাখুর্স্ট আর ডক্টর মোরেনো। কিন্তু আমরাও ঘুম থেকে উঠেছি খিদে নিয়ে। সারাদিন ঘুরছি খিদের জ্বালা মেটাতে। দিনের শেষে বেদম ক্লান্ত হয়ে ঘুমোচ্ছি অঘোরে। পেট ছাড়া আর কোনও চিন্তা নেই মগজে।

হায়রে! সভ্যতা-গর্বিত মানুষ জাতটার মধ্যে অবশিষ্ট রয়েছি আমরা ক'জন মাত্র। কিন্তু আমরাও আস্তে আস্তে পশু অবস্থায় ফিরে যাচ্ছি। পশু থেকে নাকি মানুষের সৃষ্টি—এখন দেখছি ঠিক উল্টোটা ঘটছে। মস্তিষ্কের চর্চা আর নেই আমাদের। খালাসীদের কথা নাই বা বললাম। চিরকালই ওরা অশিক্ষিত, রুক্ষ, পাশবিক। বর্তমানে ওদের সেই পাশবিক সত্তা আরও বেড়েছে। আমরাও মাথা খাটাই না। মগজের মৃত্যু ঘটছে আস্তে আস্তে—বেঁচে রয়েছে কেবল উদর। ডক্টর মোরেনো আর বুখার্স্টও মস্তিষ্ক শিকেয় তুলে রেখেছেন!

ভ্যাগ্যিস বহু বছর আগে মহাদেশ পর্যটন করে এসেছিলাম। এখন সে সাহসও আর নেই। ভার্জিনিয়াও ভেঙে পড়েছে।

জাহাজ থেকে যে জামা-কাপড় পরে নেমেছিলাম, সেগুলো ছিঁড়ে যাবার পর সামুদ্রিক শৈবাল জুড়ে কাপড় বানিয়েছিলাম। এখন আর ভাল লাগে না। আমরা উদোম ন্যাংটো হয়েই ঘুরে বেড়াই নির্বিকারভাবে।

কাজ শুধু একটাই—খাওয়া। খাওয়া ছাড়া আর কোনও কাজ বুঝি না। জীবনের একমাত্র লক্ষ্য উদরকে শান্ত রাখা।

উদর প্রধান হয়ে যাচ্ছি প্রত্যেকেই। এর মধ্যেই পুরানো স্নেহ-ভালবাসা এখনও টিমটিম করছে দু'জনের মধ্যে। আমার ছেলে জন

এখন নাতি-পুতি নিয়ে দাদু বনে গেছে। সে এখনও বাবা বলে মানে আমাকে। আর মানে আমার প্রাক্তন ড্রাইভার সিমোনাট।

সোজা কথায়, মনুষ্যত্ব লোপ পাচ্ছে আমাদের মধ্যে। এখনই যদি এই অবস্থা, এরপর যারা আসবে, তারা তো একেবারেই পশু হয়ে জন্মাবে। চোখের সামনে বাচ্চাকাচ্চাদের দেখছি বুনো হয়ে বেড়ে উঠছে। না জানে লিখতে, না জানে পড়তে। ভালমত কথাও বলতে পারে না। দাঁতগুলো চোখা চোখা। শুধু জানে খেতে। পশুর ঠিক আগের অবস্থা। এরপর চিন্তা-স্মৃতি সবই লোপ পাবে। কেউ জানবে না তাদের পূর্ব-পুরুষরা এই পৃথিবীর বুকেই বিজ্ঞানের ভেল্কি দেখিয়ে গেছে।

সারা গায়ে ওদের বড় বড় লোম গজাবে। বাকশক্তি লোপ পাবে। মগজ কমে আসবে। বন-জঙ্গলে লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াবে খাদ্যের সন্ধানে।

কিন্তু আমরা, বুড়োরা, চেষ্টা করব ভবিষ্যতের মানুষের জন্যে এই লিপি রেখে যেতে। মগজ স্থবির হবার আগেই লিখে রাখব মানুষের ইতিহাস, প্রগতির ইতিহাস, বিজ্ঞানের ইতিহাস। তাই এই প্রচেষ্টা। জাহাজ থেকে কাগজ-কলম-কালি এনেছিলাম। তাই দিয়ে লিখে রাখলাম এই পাণ্ডুলিপি।

এগারো

পনেরো বছর পর ফের লিখতে বসেছি। ডক্টর মোরেনো মারা গেছেন। ডক্টর বুখার্স্টও নেই। একা আমি মৃত্যুর দিন গুনছি। হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। আর বেশি দেরি নেই।

জাহাজ থেকে একটা লোহার সিন্দুক এনে মাটিতে পুঁতে রেখেছিলাম। মানুষ যা কিছু জ্ঞান অর্জন করেছে, তার প্রায় সবটাই লিখে সাজিয়ে রেখেছি তার মধ্যে। এই পাণ্ডুলিপিটা তার পাশেই

পুঁতে রাখব একটা অ্যালুমিনিয়ামের কৌটোর মধ্যে ঢুকিয়ে।

বিদায় হে মানুষ! বিদায়!

বারো

থ হয়ে বসে রইলেন জারগট।

মিস্ত্রিরা বাড়ির ভিত খুঁড়তে গিয়ে মাটি তোলপাড় করে ফেলেছে, কিন্তু লোহার সিন্দুক মেলেনি। তারমানে এত বছরে তা মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। জং ধরে নষ্ট হয়ে গেছে লোহা। সেই সঙ্গে হারিয়ে গেছে সেই অমূল্য সম্পদ–মানুষজাতটার জ্ঞান-বিজ্ঞানের সারাংশ।

নষ্ট হয়নি অ্যালুমিনিয়ামের কৌটো! তাই টিকে গেছে এই পাণ্ডুলিপি।

স্তম্ভিত হয়ে রইলেন জারগট। তাঁর অনুমান তা হলে মিথ্যে নয়। পাথুরে স্তরের ফাঁকে ফাঁকে অতীত সভ্যতার নিদর্শন দেখে তিনি আঁচ করেছিলেন, অনেক বছর আগে এই থাম, অট্টালিকা, মূর্তি যারা তৈরি করেছিল, তারা মানুষ। অতি উন্নত সভ্যতার মানুষ।

পাণ্ডুলিপির মধ্যেই লেখা রয়েছে তারা কারা–ডুবে যাওয়া আটলাণ্টিসের মানুষ।

আজ সেখানে জারগটদের নগরী গড়ে উঠেছে, সুদূর অতীতে এইখানেই জাহাজ থেকে নেমেছিলেন একটা ডুবে যাওয়া সভ্যতার অবশিষ্ট মানুষেরা!

'হেদম' শব্দটা নিয়ে কত কথাই না শোনা গিয়েছিল জারগটদের মধ্যে। 'হেদম' তাদের ভাষা নয়। নামটা তা হলে এল কোত্থেকে এই নিয়ে কত কথা কাটাকাটিই না হয়ে গেছে।

এখন বোঝা গেল 'হেদম' নামের রহস্য। 'হেদম' এসেছে

‘এদেম’ থেকে। ‘এদেম’ এসেছে ‘আদম’ থেকে।

আদম! ডুবে যাওয়া সভ্যতার প্রথম মানব-আদম! আদম-এদেম হেদেম! কল্পকল্পান্তরের এক একটা মানুষ জাতির প্রথম মানুষের নাম। কে জানে, ‘আদম’ নামটাও ওই ভাবে এসেছে কিনা ঠিক তার আগের ডুবে যাওয়া সভ্যতা থেকে। সে সভ্যতার মানুষজাতটার প্রথম মানুষ ছিল বোধহয় ‘উদম’ তারও আগে আরও একটা সভ্যতা যে ওইভাবে তলিয়ে যায়নি, তা কে বলতে পারে?

শিউরে উঠলেন জারগট। বেশ বুঝতে পারছেন, কল্পকল্পান্তরে চলছে এই একই খেলা। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়! মানুষ আসছে, সভ্যতার শীর্ষে উঠছে, তারপরই ধুয়ে মুছে হারিয়ে যাচ্ছে অতল সমুদ্রের বুকে।

এ খেলা চিরন্তন খেলা! শুরুর পরেই শেষ। শেষের পরেই শুরু।

এমন করেই কি একদিন জারগটদের ‘চার সমুদ্রের দেশ’ও তলিয়ে যাবে সমুদ্রের অতলে? আর এক ইতিহাস চাপা পড়বে পানির তলায়? জারগটদের তুলনায় পাণ্ডুলিপি লেখকদের সভ্যতা ছিল অত্যাধুনিক। তারা যদি নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে, জারগটরা হবে না কেন?

মূলঃ জুল ভার্ন
রূপান্তরঃ সুস্ময় আচার্য সুমন

চার্লির বুড়ো ঘোড়া

লুকাসের ফার্মের মত সমৃদ্ধ ফার্ম তার অঞ্চলে দ্বিতীয়টি নেই। বিশাল খামারের মাঝখানটায় চাষ করা হচ্ছে লাল টসটসে সুস্বাদু পাকা আপেল, প্রত্যেকটি আপেল গাছে বড় বড় লাল আপেল ঝুলে আছে এবং এই আপেলগাছগুলোকে প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা করার জন্য বিশাল খামারের চারদিকে রয়েছে দৈত্যাকার পাইন গাছ। খামারের বাঁ-পাশে লাল টালিওয়ালা বিশাল ঘর, যাতে মজুদ থাকে প্রচুর পাকা শস্য আর ফসল। গোয়াল ভর্তি গরু, আস্তাবল ভর্তি তাগড়া জোয়ান ঘোড়া। গোয়াল ঘর ও আস্তাবল পেরিয়ে লাল ইঁটের তৈরি ছিমছাম চমৎকার একটি বাড়ি, খামারবাসীদের ঘর।

প্রতিদিন দুপুরে লালবাড়ির রান্নাঘরে লম্বা টেবিলে খেতে বসে জনা পনেরো লোক—ফার্মের মালিক, তার পরিবার পরিজন, পরিচারক-পরিচারিকা।

খামারের পশুগুলো—ভেড়ার পাল, গরুর দল, শূকরের পাল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। দেখলেই মনে হয় পশুগুলো অতি সযত্নে লালিত। দীর্ঘদেহী বিশালবপু লুকাস প্রতিদিন অন্তত তিনবার তার খামার তদারক করেন। খামারের অতি ক্ষুদ্র জিনিসেরও সুযোগ-সুবিধার জন্য তাঁর অনেক ভাবনা।

আস্তাবলের বাইরে খোলা জায়গায় নিঃসঙ্গ অবস্থায় একটি অতিবৃদ্ধ ঘোড়াকে রোজই বাঁধা দেখা যায়। দেখলেই বোঝা যায় বয়সের ভারে ন্যুব্জ ঘোড়াটি। লুকাসের বৌ ঘোড়াটির বিশেষ

যত্ন নেয়। কেননা খামারের গোড়াপত্তন হয়েছিল এই ঘোড়াটিকে তরুণ অবস্থায় কেনার মাধ্যমেই। তরুণ লুকাসের অনেক ত্যাগ তিতিক্ষার সাক্ষী এই ঘোড়া। লুকাসের কড়া নির্দেশ রয়েছে ঘোড়াটি যাতে পরম শান্তিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে পারে, চিরশান্তিতে বাকি দিনগুলো অতিবাহিত করতে পারে সে ব্যবস্থা করতে। বছর পনেরোর একটি ছেলেকেও রাখা হয়েছে বৃদ্ধ ঘোড়াটিকে দেখাশোনা করার জন্য। ছেলেটির নাম ইসিডোর ডি চার্লি। লোকেরা সংক্ষেপে ডাকে চার্লি। শীতের মৌসুমে ঘোড়াটিকে খেতে দেয় খড়-বিচালি, ফ্যান এবং গ্রীষ্মে ও বসন্তে অন্তত চারবার ঘুরিয়ে খাইয়ে আনে কোনও সবুজে ঢাকা মাঠ হতে।

বয়সের মন্থরতায় বৃদ্ধ ঘোড়াটি ভালভাবে হাঁটতে পারে না, অতিকষ্টে পা তুলে হাঁটে, চোখে ভালভাবে দেখে না বললেই চলে। ফলে বারবার ধাক্কা খায় গাছ বা বেড়ার সঙ্গে। ঘাস জমিতে নিয়ে যাবার জন্য চার্লিকে বারবার থামতে হয়। দড়ির গোছা ধরে সর্বশক্তিতে টানতে হয়। লোকেরা এই মজার দৃশ্য দেখে প্রতিদিনই। অবশেষে চার্লির নামই হয়ে গেল বুড়ো কোকোর চার্লি।

চার্লির রাগে-দুঃখে-ক্ষোভে পাগল হবার জোগাড়। পাড়া প্রতিবেশী, রাস্তার ছেলে-ছোকরা এমনকী চার্লির বন্ধুরাও আড়ালে-আবডালে আবার কখনও প্রকাশ্যেই এ নাম ধরে ডাকে আর সঙ্গে তাদের কানফাটানো সে কী হাসি।

চার্লির যত ক্ষোভের মূল বৃদ্ধ ঘোড়া কোকো। তার বিস্ময় জাগে এই ভেবে বহুদিন হলো বৃদ্ধ ঘোড়াটি অবসর নিয়েছে। ঘোড়াটিকে বহু আগেই সসেজ মেশিনে পাঠিয়ে দেয়া উচিত ছিল। তার পিছনে কেন এই অযথা শ্রম, এই অযথা খাবার খরচ। যেহেতু এই ঘোড়াটি বহু আগেই তার কর্মক্ষমতা

হারিয়েছে সেহেতু এই ঘোড়াটিকে অনেক আগে হতেই খাবার বন্ধ করে দেয়া উচিত ছিল। অথচ ওকে দেয়া হচ্ছে টাটকা ঘাস, জই, বিচালি, ফ্যান, খড় প্রভৃতি।

প্রকৃতির নিয়মেই বসন্ত আসে।

চার্লিকে বরাবরের মতই কোকোকে নিয়ে এক মাঠ হতে অন্য মাঠে ঘুরে বেড়াতে হয় টাটকা ঘাসের সন্ধানে। সবেগে কোকোর দড়ি টানতে টানতে ঘেমে নেয়ে সে সারা হয়ে যায়। সুজলা-সুফলা জমিগুলো পার হতে গেলে মাঠে কর্মরত কৃষকরা সকৌতুকে তার উদ্দেশে চিৎকার করে, 'এই যে, চার্লি ভায়া, তোমার প্রাণপ্রিয় বুড়ো কোকোকে আমাদের পক্ষ হতে সালাম দিয়ো।' চার্লি কখনওই ওদের কথার প্রতিউত্তর দেয় না। কিন্তু যাবার সময় জঙ্গল হতে মোটা ডাল ভেঙে আনে। তারপর নতুন কোনও জমিতে কোকো সবুজ ঘাসে মুখ দেবার সঙ্গে সঙ্গেই তার পিঠ, বুক, ঘাড়, পায়ের উপর নেমে আসে অনবরত লাঠির আঘাত। অবোধ পশুটি আত্মরক্ষার জন্য লঘু পায়ে ছোটাছুটি করে। চার্লি বন্য উল্লাসে তার পিছু নেয়। অনবরত আঘাত করে যায় যতক্ষণ না ক্লান্তি আসে। তারপর চার্লি হাতের লাঠি ছুঁড়ে ফেলে ধীরে ধীরে চলে যায়। একটিবারও পিছন ফিরে তাকায় না। ঘোড়াটিও তার করুণ ঘোলাটে দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকে চার্লির গমনপথের দিকে। সেই দৃষ্টিতে থাকে না কোনও রাগ, ঘৃণা, ক্ষোভ, ভয়। কেবল নিষ্পলক করুণ দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকে। যতক্ষণ না চার্লি দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে যাচ্ছে, বৃদ্ধ ঘোড়াটি ঘাসে মুখ দেয় না।

গরমের রাতগুলোতে চার্লি আরও বেশি বুনো হয়ে যায়। সে তখন কোকোকে হাওয়া খাওয়াবার নাম করে দূর কোনও উপত্যকায় নিয়ে যায়। তারপর বন্য উল্লাসে পাথর ছুঁড়ে মারতে থাকে বুড়ো ঘোড়াটিকে লক্ষ্য করে যতক্ষণ পর্যন্ত না ক্লান্তি

আসে। বুড়ো ঘোড়া দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুখ বুজে আঘাত সহ্য করে, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তার চিরচেনা শত্রুর দিকে।

চার্লির মনে একটাই ব্যথা: কেন এই অবসরপ্রাপ্ত, অকর্মণ্য বাতিল ঘোড়াটিকে ঈশ্বরের সীমিত দান হতে অন্ন দেয়া হয়? চার্লিকে নিজের ক্ষুধার্ত পেট ভরাবার জন্য উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে হয়। আর সেখানে এই বুড়ো কোকো কোনও পরিশ্রম না করে প্রতিদিনই উদরপূর্তি করছে।

ক্রমশ সে কোকোর খাবারের পরিমাণ কমিয়ে দিল। নতুন তৃণভূমিতে যাওয়া প্রায় বন্ধই করে দিল। খড়-বিচালি দেয়া হলে তার অর্ধেকের বেশি চার্লি ফেলে দিয়ে আসত পাশের জঙ্গলে, খাদ্যের অভাবে কোকো হাড্ডিসর্বস্ব হয়ে পড়ল। বুকের হাড়গুলো সহজেই গোণা যায়। কোকোর শরীর হয়ে পড়ে দুর্বল হতে দুর্বলতর।

তারপর একদিন চার্লির মাথায় এক নতুন পরিকল্পনা আসে। সে ঠিক করল অনেক হয়েছে এই বৃদ্ধ কোকোকে নিয়ে ঘোরা। আর যাতে ঘুরতে না হয় সে সেই ব্যবস্থাই করবে।

প্রতিদিনের মতই চার্লি এসে দাঁড়ায় বুড়ো জন্তুটির সামনে। শঙ্কিত কোকো তাকে দেখে কেঁপে ওঠে। প্রস্তুত হয় বেদম মার খাবার জন্য। কিন্তু না, বুড়ো পশুটি অবাক হয় যখন দেখে চার্লি তাকে নিয়ে অনেক দিন পর সবুজ উপত্যকায় এসেছে। চারদিকে সবুজ ঘাস আর ঘাস। বহুদিনের অনাহারী পশুটির ক্ষুধার্ত চোখ লোভে চক চক করে। জিভের আগা হতে ঝরে পড়ে অবিরাম ধারায় লালা। কিন্তু বৃদ্ধ ঘোড়াটি বিস্মিত বেদনার সাথে লক্ষ করে চার্লি তাকে সবুজ উপত্যকা হতে মাত্র কয়েকহাত পিছনে একটি ন্যাড়া মাঠে খুঁটি পুঁতে চলে যাচ্ছে।

মাত্র কয়েকহাত দূরেই সবুজে ঢাকা উপত্যকা। কোকো হাঁটু মুড়ে ঘাড় নাড়ে, অনবরত চেষ্টা করে সামনে এগিয়ে যাবার।

তার জিভ লক-লক করে অদূরে কচি ঘাসগুলো নাগালে পাবার আশায়। কিন্তু তা সম্ভব হয় না।

সারা দিন চলে অসহায় মূক পশুর সেই প্রাণান্তকর সংগ্রাম। ক্ষুধা তাকে উন্মাদ করে তোলে। চোখের সামনেই অফুরন্ত অঢেল সবুজ খাদ্য ভাণ্ডার অথচ সে তা মুখ দিয়ে স্পর্শ করতে পারছে না। ক্ষুধার যন্ত্রণা ক্রমেই তীব্র হতে তীব্রতর হয়। সে নানা রকম বৃথা চেষ্টা করে খাদ্য নাগাল পাবার আশায়। পরিশ্রম অথবা জঠরের জ্বালায় তার দীর্ঘ পল্লবিত অবোধ দুটি চোখ হতে নেমে আসে কয়েক ফোঁটা অশ্রুজল।

সেদিন আর ছেলেটি এল না। সারাটা দিন সে কাটাল পাখির বাসা ভেঙে, পাখির ডিম চুরি করে আবার কখনও পাড়া-প্রতিবেশীর মাটির কলসে গুলতি মেরে ভেঙে দিয়ে। রাতে সে লুকাসকে এটা-সেটা বুঝিয়ে দিয়ে বাড়ি চলে গেল।

পরদিন চার্লি গেল সেই উপত্যকায়, যেখানে বাঁধা আছে কোকো। কোকো চার্লিকে দেখেই অনাহারক্লিষ্ট শীর্ণ শরীরটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল। বহু প্রত্যাশাভরা করুণ দুটি চোখ নিয়ে তাকিয়ে রইল চার্লির দিকে। সে প্রত্যাশা করল এবার হয়তো চার্লি তাকে সবুজ ঘাসের কাছে পৌঁছে দেবে। কিন্তু চার্লি কোকোর দড়িটা ছুঁয়েও দেখে না। কয়েকটি চোখা পাথর ছুঁড়ে মারে কোকোর দিকে। তারপর একটি সরু বেত নিয়ে আঘাত করে অবোধ প্রাণীটির সর্বত্র। বরাবরের মতই শিস বাজিয়ে চার্লি দূর দিগন্তে হারিয়ে যায়। যতক্ষণ ওকে দেখা যায় এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে বুড়ো ঘোড়াটি। তারপর সে বুঝতে পারে, নতুন ঘাসের অমৃত স্বাদ সে আর এই জীবনে পাবে না। সে আবার শুয়ে পড়ে, চোখ দুটো বুজে আসে।

পরের দিন চার্লি একটিবারের জন্যও এল না।

তার পরদিন এসে দেখে কোকো মাটিতে শুয়ে আছে। কিন্তু

বুড়ো কোকোটা মরেছে কিনা তা নিশ্চিত হতে পারে না। সে পা দিয়ে ঘোড়াটির মুখে লাথি মারে। ঘোড়াটি কোনও আওয়াজ করে না। নিষ্প্রাণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সবুজ উপত্যকার দিকে। অবশেষে সে নিশ্চিত হয় ঘোড়াটির মৃত্যু সম্বন্ধে। চার্লি মনে মনে বিরক্ত হয়, ইস্! কত তাড়াতাড়িই না ঘোড়াটা মারা গেল। আর কিছুদিন বেঁচে থাকলে আরও নতুন নতুন পন্থায় মজা করা যেত।

খামারে ফিরে এসে ঘোষণা করল কোকোর মৃত্যুসংবাদ। কেউই অবাক হলো না। কারণ ইতোমধ্যেই ঘোড়াটির যথেষ্ট বয়েস হয়েছে। লুকাস মরা ঘোড়া টানবার ঝামেলায় না গিয়ে কর্মচারীদের আদেশ দিলেন যেখানে মরেছে সেখানেই ঘোড়াটিকে কবর দিতে। ঠিক যেখানে বুড়ো ঘোড়াটি ক্ষুধার জ্বালায় মারা গিয়েছিল সেখানেই তৈরি করা হলো ঘোড়াটির কবর। ক্রমে ক্রমে কোকোর শরীর পচে পরিণত হলো চমৎকার রাসায়নিক সার যা ন্যাড়া জমিতে উৎপন্ন করল অঢেল সতেজ, সবুজ প্রাণবন্ত ঘাস আর ঘাস। যে ঘাসের নাগাল পেতে একদা একটি অনাহারী বৃদ্ধ ঘোড়া বুভুক্ষের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত।

মুলঃ গী দ্য মোপাসাঁ

রূপান্তরঃ মোঃ সাইফুল ইসলাম অমি

বিশ বছর পর

পুলিশের লোকটার ধীর ও ভারি পদশব্দ নীরব রাস্তায় প্রতিধ্বনি তুলছে। এখন রাত দশটাও বাজেনি। কিন্তু রাস্তায় লোকজন বলতে গেলে নেই। ঠাণ্ডা বাতাস আর ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পথচারীদের বাড়ি থেকে বেরুতে দেয়নি।

পুলিশের লোকটা নিয়মিত ছন্দে হাঁটছে। এখানে ওখানে থেমে দাঁড়িয়ে দেখছে দরজাগুলো ঠিকভাবে বন্ধ করা হয়েছে কি না। হাতের লাঠিটা দক্ষতার সাথে ঘোরাচ্ছে আর নীরব রাস্তায় সতর্ক দৃষ্টিতে নজর রাখছে। এই রাস্তার সবগুলো দোকান আর অফিস অনেক আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। শুধু মাত্র কোনার ওষুধের দোকান, একটা সিগারেটের দোকান আর সারা রাত খোলা থাকে যে ক্যাফেটা সেটা খোলা আছে।

হঠাৎ সে হাঁটা থামিয়ে দিল। দেখল, একটা হার্ডওয়্যার স্টোরের অন্ধকার প্রবেশ পথে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। লোকটার ঠোঁটে নিভানো সিগার। লোকটার দিকে এগিয়ে গেল সে।

'সব ঠিক আছে, অফিসার,' লোকটা দ্রুত বলে উঠল । 'আমি এক বন্ধুর জন্য এখানে অপেক্ষা করছি। আমাদের এই সাক্ষাতের সময় বিশ বছর আগে ঠিক করা। আপনার কাছে অবাক লাগছে, তাই না? তবে শুনুন, সম্পূর্ণ ব্যাপারটা শুনলে বুঝতে পারবেন সব ঠিক আছে। বিশ বছর আগে এই স্টোরের জায়গায় একটা রেস্টুরেন্ট ছিল। নাম ছিল "বিগ জো" ব্রাডির রেস্টুরেন্ট।'

‘পাঁচ বছর আগে ওটা উঠে গেছে,’ পুলিশের লোকটা বলল। দরজায় দাঁড়ানো লোকটা সিগার ধরাবার জন্য দিয়াশলাইয়ের একটা কাঠি ধরাল। সেই আলোতে পুলিশের লোকটা একটা ফ্যাকাসে, চৌকো চেহারা দেখতে পেল। লোকটার চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। ডান পাশের ভ্রূর সামনে একটা ছোট সাদা দাগ। সে লোকটার টাইপিনও দেখতে পেল। তাতে বড় এক টুকরো হীরা বসানো।

লোকটা সিগারে টান দিয়ে তার গল্প বলতে লাগল। ‘বিশবছর আগে এই রাতে, জিমি ওয়েলস-এর সঙ্গে আমি বিগ জো-তে ডিনার করেছিলাম। ও আমার বেস্ট ফ্রেণ্ড। আর পৃথিবীতে ওকেই আমি সবচাইতে বেশি বিশ্বাস করি। জিমি আর আমি এক সঙ্গে নিউ ইয়র্কে এসেছিলাম। আমরা ছিলাম ভাইয়ের মত। আমার বয়স ছিল আঠারো আর জিমির বিশ। পরদিন সকালে নিজের ভাগ্য গড়ার জন্য আমি পশ্চিমের উদ্দেশে যাত্রা করি। কিন্তু জিমি–আপনি নিউ ইয়র্ক থেকে জিমিকে এক ইঞ্চিও নড়াতে পারতেন না। পৃথিবীতে এটাই ছিল ওর জন্য একমাত্র জায়গা। ওই রাতেই আমরা সিদ্ধান্ত নিই, বিশ বছর পর এখানে এসে দেখা করব, এই সময়েই। আমরা ধনী হই বা গরীব থাকি তাতে কিছু যাবে আসবে না। যদি বেঁচে থাকি তা হলে দেখা করব অবশ্যই। আমরা ভেবেছিলাম, বিশ বছরের মধ্যে আমাদের জীবনে উন্নতি করব।’

‘ব্যাপারটা খুব চমৎকার,’ পুলিশের লোকটা বলল। ‘কিন্তু সাক্ষাতের জন্য এত দীর্ঘ বিরতি! ওই দিনের পর আপনার বন্ধুর কোনও খবর পাননি?’

‘প্রথম দিকে আমরা একে অপরকে নিয়মিত চিঠি লিখতাম, তারপর আস্তে আস্তে আমাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। পশ্চিমে আমাকে খুব কঠিন জীবন-যাপন করতে হয়েছে। এজন্য চিঠি লেখার সময়ও পাইনি। কিন্তু আমি নিশ্চিত, জিমি যদি বেঁচে

থাকে তবে এখানে অবশ্যই আসবে। কারণ ও ছিল ভাল এবং বিশ্বস্ত বন্ধু। ও ওর পুরোনো বন্ধুকে ভুলবে না। হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে আজ রাতের জন্য আমি এখানে এসেছি, এটা তখনই সার্থক হবে যখন আমার পুরোনো বন্ধুও এখানে আসবে।'

আগন্তুক পকেট থেকে একটা সুন্দর ঘড়ি বের করল। পুলিশের লোকটা দেখল ঘড়ির ঢাকনায় ছোট ছোট হীরা বসানো।

'দশটা বাজতে তিন মিনিট বাকি,' লোকটা বলল। 'ঠিক দশটার সময় জিমি আর আমি রেস্টুরেন্টের দরজায় দাঁড়িয়ে একে অপরকে বিদায় জানিয়েছিলাম।'

'পশ্চিমে আপনার ভাগ্য খুলেছিল, তাই না?' পুলিশের লোকটা জিজ্ঞেস করল। 'মন্দ না। আশা করি জিমিও অনেক উন্নতি করেছে। জানেন, জিমি একটু ধীর স্বভাবের। খুব ভাল মানুষ, তবে ধীর। কোনও ঝুঁকি নিতে চাইত না ও। টাকা রোজগারের জন্য আমি অনেক ঝুঁকি নিয়েছি। পশ্চিমে আপনাকে ঝুঁকি নিতেই হবে।'

হাতের লাঠিটা নাচিয়ে পুলিশের লোকটা চলে যেতে চাইল।

'আমাকে যেতে হবে,' সে বলল। 'আশা করি আপনার বন্ধু চলে আসবে, কতক্ষণ অপেক্ষা করবেন?'

'কমপক্ষে আধ ঘণ্টা,' লোকটা বলল। 'জিমি যদি বেঁচে থাকে তা হলে অবশ্যই এই সময়ের মধ্যে আসবে সে। ওর জন্য অপেক্ষা করতে আমার খারাপ লাগছে না। গুড্ নাইট, অফিসার।'

'গুড নাইট, স্যর,' পুলিশের লোকটা বলল। আবারও সেই ধীর এবং ভারি পদক্ষেপে চলতে লাগল। যাবার পথে দরজাগুলো ঠিক মত বন্ধ কিনা দেখছে।

এক সময় প্রচণ্ড বৃষ্টি শুরু হলো। বুনো আক্রোশে বইতে লাগল বাতাস। খারাপ আবহাওয়া সত্ত্বেও যারা বাইরে বেরিয়েছিল তারা মাথা নুইয়ে দ্রুত চলে গেল। তাদের কোটের কলার ওঠানো, টুপি দিয়ে কপাল ঢাকা আর হাতগুলো পকেটে

ঢোকানো। কিন্তু হার্ডওয়্যার স্টোরের দরজার কাছে দাঁড়ানো লোকটা, সিগার ফুঁকছেন আর অপেক্ষা করছেন।

তিনি প্রায় বিশ মিনিট অপেক্ষা করার পর, লম্বা এক লোক দ্রুত রাস্তা পার হয়ে তার কাছে আসল। প্রায় অন্যান্য লোকের মতই তার কোটের কলার কান পর্যন্ত টানা, মাথার হ্যাট কপাল পর্যন্ত নামানো।

'বব, তুমি?' আগন্তুক অনিশ্চিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল।

'জিমি ওয়েলস?' দরজার সামনে দাঁড়ানো লোকটাও চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল।

আগন্তুক নিজের দু'হাত দিয়ে ববের দু'হাত ধরল। 'বব! প্রিয় বব! আমি নিশ্চিত ছিলাম, তুমি বেঁচে থাকলে অবশ্যই আসবে। ওয়েল! ওয়েল! বিশ বছর বেশ লম্বা সময়, তাই না? বিগ জোর রেস্টুরেন্টটা উঠে গেছে। কী দুর্ভাগ্য! আজকের রাতটা সেলিব্রেট করার জন্য ওখানে ডিনার করতে পারতাম। পশ্চিমে, দিনগুলো তোমার কেমন কেটেছে, ওল্ডম্যান?'

'ভাল। আমি যা চেয়েছি ওখানে তার সবই পেয়েছি। জিমি, তুমি অনেক বদলে গেছ। ভাবতে পারিনি, তুমি এত লম্বা হবে।'

'তুমি চলে যাওয়ার পর একটু লম্বা হয়েছি।'

'নিউ ইয়র্কে কেমন চলছে?'

'খারাপ না। কোনও অভিযোগ নেই। একটা সিটি অফিসে আমি কাজ করি। চলো, বব, আমি একটা ছোট জায়গা চিনি। ওখানে গিয়ে পুরোনো দিনের অনেক কথা বলা যাবে।'

দুজনে হাত ধরে রাস্তা দিয়ে চলতে লাগল। নিজের জীবন আর সফলতার সম্পর্কে বলতে লাগল বব। আর জিমি, কোটের কলারের নীচে যার চেহারা লুকানো, গভীর আগ্রহে কথাগুলো শুনতে লাগল।

রাস্তার মাথায়, দুজনে ওষুধের দোকানের সামনে আসল। দোকানটা আলোতে একেবারে ঝলমল করছে। থামল ওরা। একে

অপরের চেহারা খুঁটিয়ে দেখছে। বব হঠাৎ জিমের হাত থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিল।

'তুমি জিমি ওয়েলস নও,' সে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল। 'বিশবছর দীর্ঘ সময় কিন্তু তোমার লম্বা নাক খাটো হয়ে যেতে পারে না।'

'কিন্তু একজন ভাল লোককে অপরাধী বানাবার জন্য যথেষ্ট দীর্ঘ সময়,' জিমি বলল। "সিল্কি বব", গত দশ মিনিট ধরে তোমাকে গ্রেফতার করে রাখা হয়েছে। শিকাগো পুলিশ তোমাকে খুঁজছে। ওরা ভেবেছিল তুমি এ পথে আসতে পারো। আর এজন্য আমাদেরকে নজরে রাখার জন্য অনুরোধ করেছিল। ওরা তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়। আর তুমি নিশ্চয়ই জানো ব্যাংক ডাকাতির ব্যাপারে। শান্তভাবে আমার সঙ্গে এসো। এতেই তোমার মঙ্গল। কিন্তু পুলিশ স্টেশনে যাবার আগে, এই ছোট চিরকুটটা পড়ো। জানালা থেকে আসা আলোতেই পড়তে পারবে। জিমি ওয়েলস তোমাকে এটা দিতে বলেছে। সে এখন পুলিশের লোক।

বব চিরকুটের ভাঁজ খুলল। সে যখন পড়তে শুরু করল তখন তার হাত স্থির ছিল। কিন্তু পড়া শেষ হবার আগেই তার হাত কেঁপে উঠল। চিরকুটে সংক্ষেপে লেখা আছে–

বব,

আমাদের নির্ধারিত সময়েই আমি ওখানে ছিলাম। কিন্তু তুমি যখন দেয়াশলাই জ্বালালে, তোমাকে আমি চিনতে পারলাম। তুমি 'সিল্কি বব,' যাকে শিকাগো পুলিশ খুঁজছে। আমি নিজে তোমাকে গ্রেফতার করতে পারলাম না। তাই আমার হয়ে কাজটা করার জন্য সাদা পোশাকে একজন পুলিশের লোক পাঠালাম।

জিমি।

মূলঃ ও হেনরী
রূপান্তরঃ তারক রায়

ভয়

নকার দিয়ে বাড়িটার দরজায় মৃদু টোকা দিল মিস পলিট। কিছুটা বিরতি দিয়ে আবার নক করল। বাঁ বাহুর নীচে চেপে রাখা প্যাকেটটা সরে গিয়েছিল, সেটাকে যথাস্থানে নিয়ে এল সে। প্যাকেটের ভেতর মিসেস স্পেনলোর জন্যে আনা শীতের নতুন পোশাক। রঙটা সবুজ। সদ্য তৈরি করা হয়েছে পোশাকটা। মিস পলিটের বাঁ হাতে ঝুলছে সিল্কের একটা কালো ব্যাগ। ব্যাগের ভেতর একটি মাপজোখের ফিতে, একটি পিনকুশন এবং একটি বড় কাঁচি।

পলিট মেয়েটা লম্বা এবং রোগাটে। নাকটা ধারাল, ঠোঁট জোড়া পাতলা। মাথার হালকা চুল লোহার মত ধূসর। তৃতীয়বার দরজায় নক করল সে খানিকটা দ্বিধা নিয়ে। রাস্তার দিকে তাকাতে পরিচিত একটি মুখ চোখে পড়ল। মিস হার্টনেল দ্রুত পায়ে আসছেন এদিকে। পঞ্চান্নর মত হবে মহিলার বয়স। বেশ হাসিখুশি। তবে এমুহূর্তে শীতে একটু কাহিল দেখাচ্ছে। দূর থেকে স্বভাবসুলভ উঁচু গলায় চেঁচালেন হার্টনেল, 'গুড আফটারনুন, পলিট।'

'গুড আফটারনুন, মিস হার্নেল।' পাল্টা সৌজন্য দেখাল ড্রেসমেকার পলিট। বেজায় চিকন তার কণ্ঠস্বর। তবে কথায় আদবকায়দা সুস্পষ্ট। মোটামুটি নিখুঁত উচ্চারণে কথা বলে। এক ভদ্রমহিলার পরিচারিকা হিসেবে তার কর্মজীবন শুরু। তারপর ধাপে ধাপে এই ড্রেসমেকার পর্যন্ত উন্নতি।

'কিছু মনে করবেন না,' জানতে চাইল পলিট, 'মিসেস স্পেনলো

বাড়িতে আছেন কিনা জানেন আপনি?'

'কী করে জানব।' বললেন হার্টনেল।

'দেখুন না, কী বিচ্ছিরি ঝামেলায় পড়েছি! আজ বিকেলে মিসেস স্পেনলোর নতুন পোশাক নিয়ে আসার কথা আমার। সাড়ে তিনটেয় আসতে বলেছিলেন। ঠিক সময়ই এসেছি। কিন্তু লাভটা হলো কী?'

মিস হার্টনেল তাঁর হাতঘড়ি দেখে বললেন, 'এখন তো দেখা যাচ্ছে, আধঘণ্টারও কিছুটা বেশি সময় পেরিয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ, তিন তিনবার নক করেছি দরজায়, কিন্তু কোন সাড়া নেই। মনে হচ্ছে, মিসেস স্পেনলো বাইরে কোথাও গেছেন, এবং আমার কথা দিব্যি ভুলে বসে আছেন। তবে তিনি সাধারণত অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকলে তা মিস করেন না।'

গেটের ভেতর ঢুকে পড়লেন মিস হার্টনেল। ল্যাবার নাম কটেজের বাইরের দরজায়—পলিট যেখানটায় দাঁড়িয়ে, সেদিকে হাঁটতে লাগলেন তার সাথে যোগ দিতে।

'গ্ল্যাডিস মেয়েটা দরজা খুলছে না কেন?' আপন মনে বলে উঠলেন মিস হার্টনেল। পরমুহূর্তে নিজের প্রশ্নের উত্তর নিজেই দিলেন, 'ওহ্-হো, আজ তো বৃহস্পতিবার গ্ল্যাডিসের ছুটির দিন। আমার ধারণা মিসেস স্পেনলো ঘুমোচ্ছেন। আর আপনি সেরকম জোরালভাবে নক করতে পারেননি।'

পলিটের হাত থেকে নকারটা নিয়ে মিস হার্টনেল এত জোরে নক করতে লাগলেন, রীতিমত কানে তালা লাগার যোগাড়। একই সঙ্গে দরজার প্যানেলেও দুমাদুম আঘাত করে চললেন। এদিকে তাঁর গলাটিও আর চুপ থাকবে কেন? আকাশ ফাটিয়ে চেঁচাতে লাগলেন, 'কে আছ, এদিকে এসো!'

কিন্তু কারও কোন সাড়া নেই ভেতরে।

পলিট বিড়বিড়িয়ে বলল, 'আমার ধারণাই ঠিক। মিসেস স্পেনলোর মনে নেই আমার কথা। দিব্যি চলে গেছেন বাইরে। কী

আর করা! পরে না হয় আসব আবার।'

বেরিয়ে আসার জন্যে পা বাড়াল পলিট। তার বোকামোতে হাসলেন মিস হার্টনেল। অনেকক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে থেকে চলে যাওয়ার কোন মানে হয়? বললেন, 'তাঁর তো এসময় বাইরে যাওয়ার কথা নয়। আচ্ছা, দেখি তো জানালা দিয়ে–ভেতরে কাউকে দেখা যায় কিনা।'

প্রাণোচ্ছল মিস হার্টনেলের এমন একটা ভাব, যেন মজার একটা কৌতুক উপভোগ করছেন। তাঁর ভাল করেই জানা আছে, সামনের এ ঘরটা তেমন একটা ব্যবহার করেন না স্পেনলো দম্পতি। এরচেয়ে পেছনের বসার ঘরটাই তাঁদের বেশি পছন্দ। নিছক উঁকি দেয়ার জন্যেই সবচেয়ে কাছের জানালাটার দিকে ঝুঁকলেন তিনি।

ধড়াস্ করে উঠল মিস হার্টনেলের বুকটা। হার্থরাগের (উনুনের সামনে কম্বল পাতা জায়গা) ওপর পড়ে আছেন মিসেস স্পেনলো। দেখেই বোঝা যাচ্ছে–মৃত।

বিস্ময় আর শোকের আকস্মিক ধাক্কাটা সামলে ওঠার পর মিস হার্টনেল যখন সবাইকে পরবর্তী ঘটনা খুলে বলছেন, তখন তাঁর মুখ থেকে শোনা গেল, 'পলিট বেচারীর তো তালগোল পাকানোর অবস্থা। শেষে আমাকেই মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করতে হলো। পলিটকে রেখে ডাকতে গেলাম কনস্টেবল পাককে। মেয়েটা অবশ্যি একাকী থাকতে চায়নি। কিন্তু আমি কান দিইনি ওর কথায়। এ ধরনের মানুষ অযথা দ্বিধায় ভুগে ঝামেলা পাকায়। কাজেই এদের সাথে কঠিন হওয়া ছাড়া উপায় নেই। তো, যাই হোক, যখন আমি রওনা হয়েছি, এমন সময় মি. স্পেনলোকে দেখা গেল বাড়ির কোণে।'

এটুকু বলে থামলেন মিস হার্টনেল। যারা উদ্‌গ্রীব হয়ে এতক্ষণ তাঁর কথা শুনছিল, রুদ্ধশ্বাসে তারা জানতে চাইল, 'বলুন না, তারপর কী হলো? তখন কেমন দেখাচ্ছিল মি. স্পেনলোকে?'

মিস হার্টনেল আবার শুরু করলেন, 'সত্যি বলতে কী, তখুনি

আমার সন্দেহটা হয়েছিল! বড় বেশি শান্ত দেখাচ্ছিল তাঁকে। এমনকী তাঁর চেহারায় বিস্ময়ের সামান্য আভাসটুকুও ছিল না। আপনারা যে যাই বলুন না কেন, স্ত্রীর মৃত্যুতে কোন প্রতিক্রিয়া না হওয়াটা একজন পুরুষের জন্যে কখনোই স্বাভাবিক ব্যাপার হতে পারে না।'

মিস হার্টনেলের এক কথায় সায় দিল সবাই।

এমনকী পুলিসও। তারা মি. স্পেনলোর নির্লিপ্তায় এতই সন্দিহান হলো, আঁতিপাঁতি করে খুঁজে দেখতে লাগল–স্ত্রীর মৃত্যুতে কী লাভ হতে পারে ভদ্রলোকের। শেষে দেখা গেল, বিয়ের পরপরই একটা উইল হয় স্পেনলো-দম্পতির মধ্যে। এতে উল্লেখ আছে, কোন কারণে মিসেস স্পেনলো মারা গেলে, তাঁর টাকা-পয়সা সব চলে যাবে স্বামীর কাছে। পুলিসের সন্দেহটা বেড়ে গেল আরও।

এদিকে ঘটনাচক্রে চিরকুমারী মিস মার্পল জড়িয়ে গেলেন এই খুনের ঘটনায়। ওই এলাকার কাছাকাছি তাঁর বাড়ি। কারও কাছে তিনি মধুভাষিণী, কারও কাছে আবার অম্লদায়িনী। ওই খুনটি আবিষ্কৃত হওয়ার আধঘণ্টার মধ্যে কনস্টেবল পাক তার নোটবুক নিয়ে হাজির মিস মার্পলের বাড়িতে।

'যদি কিছু মনে না করেন,' সবিনয়ে অনুমতি চাইল পাক। 'তা হলে আপনাকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই, ম্যাডাম।'

'মিসেস স্পেনলোর খুন নিয়ে তো?' জিজ্ঞেস করলেন মিস মার্পল।

পাক অবাক কণ্ঠে জানতে চাইল, 'খুনটা সম্পর্কে আপনাকে কে জানাল, ম্যাডাম?'

'মাছ।' নির্বিকার উত্তর মিস মার্পলের।

তবে হেঁয়ালিটা ঠিকই ধরে ফেলল কনস্টেবল পাক। এ নির্ঘাত ফ্রেডের কাজ। মাছঅলা ছেলেটা এখানে মাছ বিক্রির সাথে সাথে এই মুখরোচক খবরটাও ছেড়ে দিয়ে গেছে।

মিস মার্পল সহজ কণ্ঠে বলে চললেন, 'সামনের ওই বসার ঘরের মেঝেতে ছিল মিসেস স্পেনলোর লাশটা। শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়েছে তাঁকে। খুব সম্ভব সরু একটা বেল্ট দিয়ে কাজ সারা হয়েছে। তবে যা দিয়েই খুনটা করা হোক না কেন, জিনিসটা সরিয়ে ফেলা হয়েছে।'

ইতিমধ্যে কঠিন হয়ে উঠেছে পাকের চেহারা। সে রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে বলল, 'বেটা মাছঅলা ছোকরা এতসব জানল কী করে?'

মিস মার্পল সুকৌশলে পাশ কাটানোর চেষ্টা করলেন প্রশ্নটা। বললেন, 'আপনার টিউনিকে (পুলিসের আঁটো জামা বিশেষ) একটা আলপিন দেখা যাচ্ছে?'

মাথা নিচু করে আলপিনটা দেখল কনস্টেবল পাক। বোকার মত হেসে বলল, 'মুরুব্বীরা বলেন, এভাবে আলপিন গেঁথে রাখলে দিনটা নাকি খুব ভাল কাটে।'

'মুরুব্বীদের কথা সত্যি হোক। এবার আসল কথায় আসুন। বলুন তো, আমার কাছ থেকে কী জানতে চান আপনি?'

একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিল পাক। ভারিক্কি একটা ভাব ফুটে উঠল তার চেহারায়। নোটবুকটা দেখে নিয়ে বলল, 'মি. আর্থার স্পেনলোর কিছু বক্তব্য নোট করা আছে এখানে। তিনি বলেছেন, আজ দুপুর আড়াইটার দিকে মিস মার্পলের কাছ থেকে ফোন আসে তাঁর। মি. স্পেনলোকে সোয়া তিনটের দিকে যেতে বলেন তিনি। কী একটা জরুরী পরামর্শ করবেন। এটা কি সত্যি, ম্যাডাম?'

'অবশ্যই না,' দৃঢ় কণ্ঠ মিস মার্পলের।

'আড়াইটার দিকে মি. স্পেনলোকে রিঙ করেননি আপনি?'

'আড়াইটা কেন, কখনোই তাঁকে ফোন করিনি আমি।'

'ও, তা হলে এই।' আপনমনে নিজের গোঁফ টানতে লাগল পাক। মিস মার্পলের উত্তরে সে সন্তুষ্ট।

'মি. স্পেনলো আর কী বলেছেন আপনাকে?'

'তাঁর বক্তব্য হচ্ছে, আপনার সাথে দেখা করতে তিনটে দশে বাড়ি থেকে রওনা দেন তিনি। কিন্তু এখানে এসে চাকরানীর কাছে জানতে পারেন, আপনি বাড়িতে নেই।'

'মি. স্পেনলোর এটুকু বক্তব্য সত্যি। তিনি তখন এসে থাকলে আমাকে না পাওয়ারই কথা। মহিলা সমিতির মিটিংয়ে ব্যস্ত ছিলাম তখন।'

'আচ্ছা!' আগের মতই সন্তোষ প্রকাশ করল পাক।

'আমাকে একটা কথা বলুন তো, কনস্টেবল,' তীক্ষ্ণ কণ্ঠ মিসেস মার্পলের। 'আপনি কী মি. স্পেনলোকে সন্দেহ করেন?'

'এখনও বলার সময় আসেনি সেটা। তবে ভাবগতিকে বোঝা যাছে, আড়াল থেকে কেউ চাল চালছে।'

মিস মার্পল চিন্তামগ্ন কণ্ঠে বললেন, 'কে সে? মি. স্পেনলো?' মি. স্পেনলোকে পছন্দ করেন তিনি। ছোটখাট গড়নের এই রোগাটে মানুষটা কথাবার্তায় অত্যন্ত চোস্ত। শ্রদ্ধা অর্জনের মত ব্যক্তিত্ব রয়েছে। তিনি তাঁর প্রায় পুরোটা জীবন কাটিয়ে এসেছেন শহরে। এমন মানুষের এই গ্রামাঞ্চলে এসে বাস করাটা একদম মানায় না। মিস মার্পলকে অবশ্যি এখানে আসার কারণটা তিনি বলেছেন। তাঁর কথা, 'সেই ছোটবেলা থেকে আমার একটা শখ, একদিন গ্রামে থাকব আমি, সেখানে একটা চমৎকার বাগান থাকবে আমার। ফুলের সাথে সবসময়ই আমার একটা নিবিড় সম্পর্ক। আপনি তো জানেন, আমার স্ত্রীর একটা ফুলের দোকান ছিল। ওখানেই আমাদের প্রথম দেখা হয়।'

কথাগুলো কাঠখোট্টা, কিন্তু এর ভেতর রয়েছে জমজমাট রোমান্স। ফুলের পটভূমিতে ভেসে ওঠে এক সুন্দরী তরুণীর ছবি। আর সে মেয়েটি মিসেস স্পেনলো।

তবে মি. স্পেনলো ফুলের প্রতি যতই দুর্বলতা দেখান, বাস্তবে ফুল সম্পর্কে কিছুই জানেন না তিনি। কীভাবে মাটি কোপাতে হয়, বীজ বুনতে হয়, বেডিং তৈরি করতে হয়, কোন্ গাছ শুধু এক বছর

বাঁচে, কোন্‌টির আয়ুই বা এরচেয়ে বেশি–এসব কিচ্ছু জানা নেই তাঁর। মি. স্পেনলোর আছে শুধু দু'চোখ ভরা এক স্বপ্ন-বাড়ির সামনে ঘন গাছপালা শোভিত একটা ফুলের সৌরভে মাতোয়ারা থাকবে বাগানটা। মিস পার্কলের সাথে মি. স্পেনলোর দেখা হলে প্রায়ই তিনি বিভিন্ন প্রশ্ন করেন ফুল নিয়ে। মিস মার্পল যেসব উত্তর জানেন, বলে দেন আন্তরিকভাবে। আর মি. স্পেনলো এই তথ্যগুলো সযত্নে টুকে রাখেন তাঁর ছোট্ট নোটবুকটিতে।

মি. স্পেনলো একজন ঠাণ্ডা মাথার মানুষ বলেই হয়তো পুলিসের আগ্রহটা তাঁর প্রতি প্রবল হয়ে উঠল। শুরু হলো জোর তদন্ত। তাদের ধৈর্য আর চেষ্টা নিয়ে এল সুফল। মিসেস স্পেনলোর অনেক তথ্য উদ্ধার করল পুলিস। শীঘ্রি সে তথ্য চাউর হয়ে গেল গোটা সেন্ট মেরি মিড জুড়ে।

একটি বড় বাড়িতে পার্ট-টাইম পরিচারিকা হিসেবে কর্মজীবন শুরু মিসেস স্পেনলোর। পরে এক গার্ডেনারকে বিয়ে করে কাজটা ছেড়ে দেন তিনি। দু'জন মিলে শুরু করেন ফুলের ব্যবসা। লণ্ডনে খুলে বসেন এক ফুলের দোকান। ব্যবসায় উন্নতি ঘটে। কিন্তু ফুল তুলতে গার্ডেনার এক সময়-অসুস্থ হয়ে পটল তুলে ফেলে।

তবে মিসেস স্পেনলো ভেঙে পড়ার মেয়ে নন। প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস নিয়ে একাই চালাতে থাকেন ব্যবসা। উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে প্রসার ঘটান ব্যবসার। উত্তরোত্তর বেড়ে চলে উন্নতি। তারপর চড়াদামে সবকিছু বেচে দিয়ে দ্বিতীয়বারের মত বিয়ে করেন। তাঁর দু'নম্বর স্বামীই–মি. স্পেনলো। তখন সোনাদানার ছোট্ট দোকানটা নিয়ে হিমশিম অবস্থা লোকটির। তবে বিয়ের পর আর বেশিদিন কষ্ট করতে হয়নি তাঁকে। ব্যবসা গুটিয়ে বউ নিয়ে চলে আসেন এই সেন্ট মেরি মিডে।

টাকা-পয়সার কোন অভাব ছিল না মিসেস স্পেনলোর। এই পুঁজির বড় একটা অংশ তিনি ঢালেন। আধ্যাত্মবাদের পেছনে। অনেকটা ভারতীয় যোগিনীর মত ইমেজ গড়ে ওঠে তাঁর। বিভিন্ন

সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে অলৌকিক উপদেশকে কাজে লাগান. তিনি। এ থেকে ভাল আয়ও হতে থাকে। ফ্যাশন ব্যবসাতেও টাকা খাটিয়ে প্রচুর লাভ করেন।

লোকজনের বিভিন্ন সমস্যার অলৌকিক সমাধানের ক্ষেত্রে প্রচলিত মিডিয়াম এবং বিশেষ বৈঠক এড়িয়ে চলতেন মিসেস স্পেনলো। এরচয়ে বরং সংক্ষিপ্ত গভীর ধ্যান ছিল তাঁর পছন্দ। রহস্যময়তায় ভরা এই ধ্যানের মূলমন্ত্র ছিল শ্বাস-প্রশ্বাসের রকমারি কৌশল।

সেণ্ট মেরি মিডে এসে যোগিনীর বেশ ছেড়ে আবার ইংল্যাণ্ডের প্রচলিত খ্রিস্ট্রিয় আধ্যাত্মবাদে মনোনিবেশ করেন মিসেস স্পেনলো। গির্জার বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা এবং জনকল্যাণমূলক কাজে জানপ্রাণ দিয়ে লেগে পড়েন। স্থানীয় দোকানগুলোতে সাহায্য-সহযোগিতা ছাড়াও লোকজনের বিপদ-আপদে আন্তরিক-ভাবে এগিয়ে আসেন। গ্রামের সাঁকো নির্মাণেও সক্রিয় ভূমিকা রাখেন তিনি।

চিফ কনস্টেবল কর্নেল মেলচেট মিসেস স্পেনলোর হত্যা-রহস্য উদ্ঘাটনের দায়িত্ব দিলেন ইন্সপেক্টর স্ল্যাককে।

স্ল্যাক দৃঢ়চেতা মানুষ। তদন্তের শুরুতেই মি. স্পেনলোকে সন্দেহ হলো তার। তদন্ত শেষে সন্দেহটা নিশ্চিত হয়ে দাঁড়াল। সে তাঁর বসকে প্রবল আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলল, 'মহিলার স্বামীই তাকে খুন করেছে, স্যর।'

'তোমার তাই মনে হয়?'

'একদম নিশ্চিত আমি। তাকে একটু লক্ষ করলে আপনিও ব্যাপারটা ধরতে পারবেন। জঘন্য লোকটা। বউয়ের মৃত্যুতে দুঃখ বোধ বা আবেগ প্রকাশের বালাই নেই। বউয়ের মৃত সংবাদে লোকটার কোন প্রতিক্রিয়া না হওয়ার কারণটি হচ্ছে—সে তো আগেই জানে, তার বউ আর নেই।'

'সে কী দুঃখশোক প্রকাশের সামান্য ভানও করেনি?'

'জি না, স্যর। বরং তাকে খুশিই মনে হয়েছে। কিছু মানুষ ওসব ভান-টান একদম পারে না। ওসব করতে গিয়ে নিজেকে আরও কঠিন করে ফেলে।'

'বউ ছাড়া আর কোন মেয়ে নেই তো তার জীবনে?' জিজ্ঞেস করলেন কর্নেল মেলচেট।

'জি না, স্যর। সেরকম কিছু খুঁজে পাইনি। তবে লোকটা খুবই সুচতুর। তাকে অনুসরণের পথগুলো ঢেকে ফেলেছে। আমি কেসটা যদ্দূর দেখেছি, বউয়ের প্রতি বিতৃষ্ণা এসে গিয়েছিল তার। কিন্তু বউয়ের কব্জায় টাকা-পয়সা ছিল বলে কিছু বলার সাহস হয়নি। আর ওই মহিলাও কিছু নীতি আঁকড়ে ধরে, কিংবা অন্য কোন কারণে দাম্পত্য জীবনটা টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করে গেছে। কিন্তু নির্মম লোকটা তা চায়নি। তার ইচ্ছেটা ছিল—একাই সব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করা। এজন্যে বউকে সরিয়ে দেয়ার জন্যে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করার ফন্দি আঁটে।'

'হ্যাঁ, কেসটার অবস্থা দেখে আমারও তাই মনে হচ্ছে।'

'খুনের প্ল্যানটা খুবই সতর্কভাবে সাজায় সে। এর-মধ্যে একটা হচ্ছে ভুয়া টেলিফোন কল।'

ইন্সপেক্টর স্ল্যাক আর কিছু বলার আগে বাধা দিলেন কর্নেল মেলচেট। বললেন, 'টেলিফোনটা আসলে কার ছিল, জানা যায়নি?'

'জি না, স্যর। তার মানে, হয় সে মিথ্যে বলেছে, নয়তো কারসাজিটা সে করেছে কোন পাবলিক টেলিফোন বুদ থেকে। এখানে পাবলিক টেলিফোন বুদ আছে মাত্র দুটি। একটি রয়েছে রেল স্টেশনে এবং অন্যটি পোস্ট অফিসে। তবে পোস্ট অফিসে অবশ্যই যায়নি সে। ওখানে মিসেস ব্লেড সারাক্ষণ নজর রাখেন, কে কে টেলিফোন করে গেল। কাজেই বলা যায়, স্টেশন থেকেই করা হয়েছে ফোনটা। স্টেশনে ট্রেন এসে পৌঁছায় দুটো সাতাশে, তারপর যথারীতি খানিকক্ষণ হইচই হয়েছে। এই হই-হুল্লোড়ের ভেতর তখন কাউকে ফোন না করারই কথা। তবে সে বলেছে মিস

মার্পলের কথা। কিন্তু তিনি তখন ছিলেন মহিলা সমিতির মিটিংয়ে।

'তুমি কী একটা জিনিস ভেবে দেখেছ, স্ল্যাক? মিসেস স্পেনলোকে খুন করার জন্যে অন্য কেউ কিন্তু মি. স্পেনলোকে সুকৌশলে বাইরে নিয়ে আসতে পারে।'

'টেড জেরাল্ডের কথা বলছেন তো, স্যর? তাকে নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে দেখেছি। কিন্তু সুদির্নিষ্ট কোন মোটিভ খুঁজে পাইনি। মিসেস স্পেনলোর মৃত্যুতে লোভনীয় কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা নেই তার।'

'যদিও এই খুনের নাটকে তার চরিত্রটা নগণ্য, কিন্তু ভুলে যাচ্ছ কেন, টাকা আত্মসাতের মত অপকর্মও আছে তার?'

'আমি বলছি না যে ছেলেটার কোন ভুলক্রুটি নেই। কিন্তু পরে মনিবের কাছে গিয়ে নিজের দোষ স্বীকার করেছে সে।'

'সে কী অক্সফোর্ড গ্রুপে (ইংল্যাণ্ডের প্রসিদ্ধ ধর্মসভা) যোগ দিয়েছে নাকি?' জানতে চাইলেন মেলচেট।

'জি, স্যর। এই ধর্মসভায় যোগ দেয়ার পর সরল পথে চলার সিদ্ধান্ত নেয় সে। তাই টাকা সরানোর কথা স্বীকার করে। আমি বলছি না যে এর মধ্যে কোন চালাকি নেই। হয়তো সে ভেবেছিল, তাকে সন্দেহ করা হচ্ছে। এজন্যে দোষক্রুটি সব স্বেচ্ছায় স্বীকার করে ভাল হতে চেয়েছে।

'তোমার সন্দেহ-ক্ষমতা ভালই, স্ল্যাক,' বললেন কর্নেল মেলচেট। 'যাক গে, মিস মার্পলের সাথে এরমধ্যে কথাবার্তা কিছু বলেছ নাকি?'

'এই কেসটার সাথে তাঁর কী সম্পর্ক, স্যর?'

'না, কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু ঘটনাটা তিনি যে শুনেছেন, এটা তো তুমি জানো। তা হলে তার ওখানে গিয়ে এ ব্যাপারে কথা বলছ না কেন? মহিলার মাথাটা খুবই ধারাল।'

বক্তার কথা নীরবে হজম করে অন্য প্রসঙ্গে গেল স্ল্যাক। বলল, 'একটা ব্যাপার আপনাকে জানিয়ে রাখা দরকার, স্যর। খুন হওয়া মহিলা পরিচারিকা হিসেবে যেখানে তার কর্মজীবন শুরু করে, সেই

বাড়িটি হচ্ছে স্যর রবার্ট অ্যাবারক্রমবাইয়ের। সে বাড়িতে একবার দুর্ধর্ষ চুরি হয়েছিল। এক প্যাকেট পান্না খোয়া যায় তখন। সেসময় অবশ্যি স্পেনলো নেহাত একটি কচি মেয়ে। আপনি কি মনে করেন, স্যর, এ ঘটনার সাথে সে জড়িত থাকতে পারে? মি. স্পেনলো তখন দু'পয়সার রত্ন ব্যবসায়ী, অভাবী মানুষ, তার মাধ্যমে ওই পান্নাগুলো...'

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়লেন মেলচেট। বললেন, 'না, এরকম কোন সম্ভাবনা নেই। মি.স্পেনলোর সাথে যোগাযোগ দূরে থাক, তখন তাকে চিনতও না মিসেস স্পেনলো। ওই কেসটার সবই মনে আছে আমার। তখন পুলিসী তদন্তে জানা গিয়েছিল, জিম অ্যাবারক্রমবাই নামে ওই বাড়িরই এক ছেলে পান্নাগুলো সরিয়েছিল। ভয়ানক অপব্যয়ী ছিল সে। এক বোঝা ঋণ চেপে ছিল তার ঘাড়ে। ওই চুরির পরপরই এ বোঝা থেকে মুক্তি পায় সে। কিছু পয়সাঅলা মহিলার কাছ থেকে ঋণ করেছিল জিম। তবে চুরির এই কেসটা বেশি দূর এগোতে পারেনি। বুড়ো অ্যাবারক্রমবাই নিজেই কেসটা ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করেন। কেন, তা তিনিই জানেন।'

'এটা কলঙ্ক ঢাকার জন্যে, স্যর,' বলল স্ল্যাক।

ইন্সপেক্টর স্ল্যাককে সাদরে ভেতরে এনে বসালেন মিস মার্পল। বিশেষ করে কর্নেল মেলচেট তাকে পাঠিয়েছেন বলে একটু বেশি খাতির করলেন। খুশি হয়ে বললেন, 'কর্নেল মেলচেট সত্যিই হৃদয়বান। ভাবতেই পারিনি, আমাকে স্মরণ করবেন তিনি!'

'তিনি শুধু আপনাকে স্মরণই করেননি, আমাকে কী বলেছেন–জানেন?'

'কী?'

'বলেছেন, এই সেন্টমেরি মিডে যা ঘটে, এসব ঘটনার কোনটি যদি আপনার জানা না থাকে, তা হলে ধরে নিতে হবে–ওই

ঘটনাটির কোন গুরুত্ব নেই।'

'এটা আমার প্রতি তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ। বাস্তবে আমি সত্যিই জানি না, সেন্টমেরি মিডে আজকাল কী ঘটছে। বিশেষ করে ওই খুনটির ব্যাপারে।'

'এই খুন নিয়ে যেসব কথা হচ্ছে, মানে কানাঘুষো আর কী–এসব তো জানেন?'

'হ্যাঁ, শুনেছি–তবে ওগুলো কোন কাজের কথা নয়। রিপিট করতে গেলে ফালতু কথা হবে।'

স্ল্যাক বিনয়ের সাথে বলল, 'দেখুন, আমি কিন্তু আপনার সাথে অফিশিয়াল কথা বলতে আসিনি। আমাদের কথাবার্তা সবই গোপন থাকবে। কাজেই আপনি খোলাখুলি আলাপ করতে পারেন আমার সাথে।'

'তার মানে, লোকজন কী বলাবলি করছে–সেটাই তো জানতে চাইছেন আপনি? মানে, এ থেকে কোন সত্য বেরিয়ে আসে কিনা–তাই তো?'

'জি, ঠিক ধরেছেন।'

'তা হলে শুনুন, চারদিকে প্রচুর জল্পনা কল্পনা হচ্ছে এই খুন নিয়ে। আমার সাথে যদি একমত হন, তা হলে এখানে সন্দেহের ক্ষেত্র পাবেন দুটি। প্রথমটি হচ্ছে–ঘনিষ্ঠজন। সবাই শুরু থেকেই সন্দেহ করছে স্বামীকে। এটা স্বাভাবিক। স্ত্রী খুন হলে স্বামী সন্দেহের পাত্র হয়। আর স্বামী খুন হলে সন্দেহ করা হয় স্ত্রীকে। আপনি কী বলেন?'

'হয়তো বা তাই,' সাবধানে উত্তর দিল ইন্সপেক্টর।

'তারপর ধরুন, সন্দেহের দ্বিতীয় দিকটি টানলে টাকার ব্যাপারটি এসে যায়। শুনেছি, প্রচুর টাকা ছিল মিসেস স্পেনলোর। কাজেই তাঁর মৃত্যু মি. স্পেনলোর জন্যে স্বভাবতই লাভ বয়ে এনেছে। এই পাপের দুনিয়ায় আমি দেখেছি, যেসব ঘটনা নিয়ে জোর গুঞ্জন চলে, পরে সেটাই সত্যি বলে প্রমাণিত হয়।'

'মোটা অঙ্কের টাকা যে তার হাতে এসেছে, এটা তো ঠিক!'

'হ্যাঁ, এজন্যেই তো সন্দেহটা জোরাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর যেভাবে খুনটা হয়েছে, তাতে ছকটা খুব সহজে দাঁড় করানো যায়। মি. স্পেনলোর পক্ষে মোটেও অসম্ভব নয় স্ত্রীকে শ্বাসরোধ করে মেরে পেছন বাড়ি দিয়ে বেরিয়ে আসা। তারপর মাঠ বরাবর সংক্ষিপ্ত রাস্তা মেরে দিয়ে আবার এখানে আসাটা তো আরও সহজ। আমার টেলিফোন কলের কৌশলটিও একেবারে মোক্ষম। শেষে ফিরে গিয়ে নিজের অবর্তমানে আততায়ীর হাতে স্ত্রীর খুনের ঘটনা-সাজানো তো কোন ব্যাপারই নয়।'

ইন্সপেক্টর বলল, 'আচ্ছা, টাকা-পয়সা নিয়ে শেষদিকে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোন ঝগড়া-ঝাঁটি হয়েছে নাকি?'

'নাহ্, সেরকম কিছু হয়নি।'

'আপনি জানলেন কী করে?'

'তাঁদের ভেতর ঝগড়া-ঝাঁটি হলে, কিছুতেই গোপন থাকত না সেটা। চাকরানী গ্ল্যাসি ব্রেন্ট রটিয়ে দিত গোটা গ্রামে।'

'মেয়েটা হয়তো বা জানে না...'

মিস মার্পলের মাপা হাসি মাঝ পথে থামিয়ে দিল ইন্সপেক্টরের দ্বিধা জড়ানো কণ্ঠ।

মিস মার্পল বলে চললেন, 'আরেকটা মানুষকে নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা যায়। সে হচ্ছে—টেড জেরাল্ড। ছেলেটি সুদর্শন। আপনি তো জানেন, ইন্সপেক্টর, এই সুন্দর সুন্দর ছেলেরা অনেক সময় মেয়েদের ওপর এমন প্রভাব ফেলে, যা ধারণাও করা যায় না। আমাদের এখানকার গির্জায় শেষ যে কিউরেট (সহকারী যাজক) ছিলেন, তাঁর কথাই ধরুন না। কেমন ম্যাজিকের মত প্রভাব ফেলেছিলেন এখানকার মেয়েদের ওপর। তখন সকাল-সন্ধ্যা প্রায় সব ধরনের মেয়েই আসা-যাওয়া করত গির্জায়। এবং পরিণত বয়সের অনেক মহিলাই সেসময় এমন কিছু কাজ করেছেন, যা ছিল চোখে পড়ার মত। কোন কারণ ছাড়াই স্লিপার,

স্কার্ফ—এসব নানা জিনিস তাঁরা গিফ্‌ট করত কিউরেটকে। আর এই উপহারগুলো কী যে বিব্রত করত বেচারা তরুণটিকে।

'আমি যার কথা বলছি, এই তরুণ টেড জেরাল্ডকে নিয়েও শোনা যাচ্ছে এমন গুঞ্জন। ছেলেটি প্রায়ই মিসেস স্পেনলোর সাথে দেখা করতে আসত বাড়িতে। মিসেস স্পেনলো আমাকে এ ব্যাপারে বলেছিলেন, ছেলেটি ছিল তাঁদের অক্সফোর্ড গ্রুপের সদস্য। ধর্মীয় ব্যাপার-স্যাপার নিয়েই ছিল তাঁদের এই যোগাযোগ। তবে আমি মনে করি, তাঁরা ছিলেন পরস্পরের প্রতি খুবই আন্তরিক। বিশেষ করে মিসেস স্পেনলো ছিলেন ছেলেটির সব ব্যাপারেই বেশ আগ্রহী।'

থেমে একটু দম নিলেন মিস মার্পল। তারপর আবার শুরু করলেন, 'তবে আমি নিশ্চিত তাঁদের এই সম্পর্ক খারাপ কিছু ছিল না। কিন্তু লোকজনের স্বভাব তো আপনার ভাল জানা আছে, ইন্সপেক্টর। তাদের ধারণা, ওই ছেলেটির প্রেমে পড়েছিলেন মিসেস স্পেনলো। এবং এক সময় টেডকে বেশ কিছু টাকা ধার দেন তিনি। এই ধার যাতে আর শোধ করতে না হয়, এজন্যে মিসেস স্পেনলোকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়ার হীন পরিকল্পনা নেয় সে। তবে এটা পুরোপুরি সত্যি যে, ঘটনার দিন স্টেশনে দেখা গেছে টেডকে। টু টোয়েন্টি-সেভেন ডাউন ট্রেনটাতে ছিল সে। অবশ্যি স্টেনশনে থাকলেও, চালাকি করাটা তার জন্যে তেমন কঠিন কাজ ছিল না। ট্রেনের যে পাশে তাকে দেখা গেছে, বিপরীত দিকের দরজা দিয়ে চট করে নেমে ঝোপঝাড়-বেড়া ইত্যাদি পেরিয়ে চলে আসাটা কিন্তু তার পক্ষে অসম্ভব নয়। মানে, সে স্টেশনের ফটকটা এড়িয়ে গেছে কোনভাবে। এভাবে গা ঢাকা দিয়ে কটেজে গিয়ে মিসেস স্পেনলোকে খুন করাটা তার পক্ষে সম্ভব। তা ছাড়া লোকজনের মতে, খুন হওয়ার সময় মিসেস স্পেনলোর পোশাকটিও ছিল কিছুটা অদ্ভুত।'

'অদ্ভুত?'

'হ্যাঁ, সাধারণ পোশাকের বদলে কিমোনো ছিল পরনে।' রক্তিম আভা ছড়াল মিস মার্পলের মুখে। 'আপনি জানেন বোধহয়, কারও কারও কাছে সাজেস্টিভ পোশাক এটা।'

'কী বললেন, সাজেস্টিভ?'

'আরে না, আমি কিছু বলছি না। বলছি লোকজনের কথা। আমার কাছে তো এটা স্বাভাবিক পোশাক।'

'স্বাভাবিক?'

'অবস্থা দৃষ্টে তাই।' মিস মার্পলের শান্ত দৃষ্টিতে গভীর চিন্তার ছাপ।

ইন্সপেক্টর স্ল্যাক বলল, 'আরেকটা মোটিভ বোধহয় পাওয়া গেল মি. স্পেনলোর স্ত্রী-হত্যার। ঈর্ষা! নিজের স্ত্রীকে অন্যের পছন্দের পোশাক পরতে দেখলে এরকম ঈর্ষা হওয়াটা স্বাভাবিক।'

'না, মি স্পেনলো সেরকম ঈর্ষাকাতর নন। কে কী করল, কে কী খেলো—এসব নিয়ে মাথা ঘামানের মানুষ নন তিনি। যদি কখনও তাঁর স্ত্রী পিনকুশনের ওপর কোন নোট রেখে দূরে কোথাও যেতেন, তা হলে সেটি হত মি. স্পেনলোর কাছে নতুন করে জানা একটি বিষয়। মানে, এভাবে মেসেজ রেখে যে দূরে যাওয়া যায়, এ ধরনের চিন্তাভাবনা খেলত না তাঁর মাথায়।'

ইন্সপেক্টর স্ল্যাক টের পেল, মিস মার্পলের দু'চোখে যেন কীসের ইঙ্গিত। কিছু যেন বলতে চাইছেন তিনি। এতক্ষণ তাঁর সাথে যে আলাপ হলো, এরমধ্যেই দেয়া হয়েছে ইঙ্গিতটা। কিন্তু কী সেটা?

মিস মার্পল সহসা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে শুধোলেন, 'স্পটে কোন ক্লু খুঁজে পাননি, ইন্সপেক্টর?'

'লোকজন আজকাল বহুত সেয়ানা, মিস মার্পল। এখনকার খুনীরা আঙুলের ছাপ এবং সিগারেটের ছাই ফেলে যায় না।'

'কিন্তু এই খুনটা তো হয়েছে সেকেলে ধাঁচে...'

'তার মানে, কী বলতে চাইছেন আপনি?' জোরাল প্রশ্ন ইন্সপেক্টরের।

মিস মার্পল ধীর কণ্ঠে বললেন, 'আমার ধারণা, কনস্টেবল পাক সাহায্য করতে পারবে আপনাকে। যদ্দূর শুনেছি, আইনের লোক হিসেবে পাকই প্রথম অকুস্থলে পৌঁছায়।'

একটা ডেক চেয়ারে বসে আছেন মি. স্পেনলো। বিভ্রান্ত চেহারা। রাজ্যের হতাশা ঝরে পড়ল তাঁর কণ্ঠে, 'আমাকে ঘিরে চারদিকে যে কী হচ্ছে, এখন পরিষ্কার বুঝতে পারছি। আমার শ্রবণশক্তি অতটা ভাল নয়, তবু যা শুনেছি–একদম নির্ভুল। ছেলেটি একেবারেই ছোট, কিন্তু টিটকিরিটা অনেক বড়। পেছন থেকে সে ইঙ্গিতপূর্ণ এমন কথা বলল, পরিষ্কার বুঝলাম–আমাকে উদ্দেশ্য করেই কটু মন্তব্যটা করেছে সে। আর ছেলেটির কথাগুলোর তাৎপর্য হচ্ছে–আমিই খুন করেছি আমার স্ত্রীকে।

মিস মার্পল আপনমনে একটি মৃত গোলাপের পাপড়ি ছিঁড়ছেন। তিনি বললেন, 'সন্দেহ নেই, এটা তার ধার করা ধারণা।'

'কিন্তু এইটুকুন ছেলের মাথায় এমন ধারণা আসবে কী করে?'

'মিস মার্পল একটু কেশে নিয়ে বললেন, 'কী করে আবার? বড়দের কাছ থেকে শুনে।'

'আপনি-আপনি বলছেন, অন্যেরাও আমার সম্পর্কে এমন ধারণা পোষণ করে?'

'সেন্ট মেরি মিডের অর্ধেক লোক তো হবেই।'

'কিন্তু এ ধরনের কুটিল চিন্তা মানুষের মাথায় গজায় কী করে? আমার স্ত্রীর জীবনের সাথে নিজেকে একেবারে একাকার করে দিয়েছিলাম আমি। এটা ঠিক যে, শুরুতে যেভাবে ভেবেছিলাম, গ্রামের জীবনটাকে সেভাবে গ্রহণ করতে পারেনি ও। সেইসঙ্গে এটাও মানতে হবে–সব ব্যাপারেই স্বামী-স্ত্রীর মতের মিল হবে, এমন কোন কথা নেই। বরং এটাই একটা অসম্ভব ব্যাপার। এখন ওর অভাবটা গভীর ভাবে অনুভব করছি আমি।'

'হয়তো বা করছেন। কিন্তু এখন একটা কড়া কথা না বলে

পারছি না। এজন্যে আগেভাগেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। স্ত্রীর মৃত্যুতে যেভাবে শোক প্রকাশ করা উচিত, সেরকম কিছু দেখা যায়নি আপনার মধ্যে।'

মি. স্পেনলো তাঁর কৃশকায় শরীরটা টেনে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'অনেকদিন আগে আমি এক চীনা দার্শনিকের লেখা পড়েছিলাম। যখন তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী-কে সবাই সৎকারের জন্যে নিয়ে যাচ্ছে, তখন একদম নিশ্চুপ ছিলেন তিনি। প্রাচীন প্রথানুযায়ী রাস্তায় গম্ভীর ঘণ্টাধ্বনি হচ্ছিল তখন। দার্শনিক নীরবে শুনছিলেন সেই ঘণ্টাধ্বনি। সমবেত লোকজন অবাক হয়ে গিয়েছিল দার্শনিকের শোক সহ্য করার অসাধারণ মানসিক শক্তি দেখে। আমিও স্ত্রীর মৃত্যুতে ওই দার্শনিকের পথ অনুসরণ করেছি।'

'কিন্তু,' বললেন মিস মার্পল, 'সেন্ট মেরি মিডের লোকজনের প্রতিক্রিয়া আলাদা। চীনা দর্শন কোন কাজ করেনি তাদের মাঝে।'

'তবে আপনি তো বুঝতে পেরেছেন আমাকে?'

মিস মার্পল মাথা নেড়ে বললেন, 'আমার হেনরী চাচারও ছিল নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার অসাধারণ ক্ষমতা। তিনি বলতেন—কখনও আবেগ প্রকাশ কোরো না। মজার ব্যাপার হচ্ছে, তিনিও আপনার মত ফুল পছন্দ করতেন।'

ফুলের কথা বলায় সহসা চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল মি. স্পেনলোর। সাগ্রহে বললেন, 'কটেজের পশ্চিম দিকে একটা পারগোলার (লতাপাতার আচ্ছাদন) কথা ভাবছি আমি। ওদিকে কিছু গোলাপী গোলাপ থাকবে। উইস্টেরিয়াও লাগানো যেতে পারে। আরেকটা সাদা সাদা তারার মত ফুল, নামটা যেন কী—এ মুহূর্তে ঠিক মনে পড়ছে না...'

যেন তিন বছরের নাতনীকে বলা হচ্ছে, এমন ভঙ্গিতে মিস মার্পল বললেন, 'আমার কাছে সুন্দর একটা ক্যাটালগ আছে ফুলের। আপনি এটা বসে বসে দেখতে থাকুন—আমাকে একটু

বেরোতে হচ্ছে এখুনি।’

ক্যাটালগ হাতে হাসি হাসি মুখে বাগানে বসে রইলেন মি. স্পেনলো। মিস মার্পল দ্রুত ফিরে এলেন তাঁর বাড়িতে। বিশেষ একটি পোশাক বাদামী কাগজে মুড়িয়ে দ্রুত রওনা হলেন পোস্ট অফিসের দিকে। সেই ড্রেসমেকার পলিট মেয়েটা থাকে পোস্ট অফিসের দোতলায়।

কিন্তু পোস্ট অফিসে পৌঁছেই দোতলায় উঠলেন না মিস মার্পল। এখন দুপুর দুটো বেজে একত্রিশ মিনিট। ‘মাচ বেনহাম’ বাসটি এসে দাঁড়িয়েছে পোস্ট অফিসের দরজায়। যাত্রী উঠছে এক এক করে। সেন্ট মেরি মিডে এই ক্ষণটি একদিন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল একজনের কাছে।

পোস্ট মিস্ট্রেস কিছু পার্সেল হাতে দ্রুত ছুটলেন গাড়ির দিকে। মিষ্টি, সস্তা বইপুস্তক আর বাচ্চাদের খেলনা আছে এই পার্সেলগুলোতে।

পোস্ট মিস্ট্রেস বেরিয়ে যাওয়ার পর মিনিট চারেক পোস্ট অফিসে সম্পূর্ণ একা রইলেন মিস মার্পল। তারপর পোস্ট মিস্ট্রেস ফিরে এলে দোতলায় চলে এলেন তিনি। ঘরেই আছে পলিট। সাথে আনা ধূসর পোশাকটা তাকে দেখালেন মিস মার্পল। বললেন, পোশাকটায় আরেকটু চাকচিক্য আনতে চান তিনি। পলিট কথা দিল, তার পক্ষে যদ্দূর সম্ভব চেষ্টা করে দেখবে।

চিফ কনস্টেবল যখন জানতে পারলেন, মিস মার্পল তাঁর সাথে দেখা করতে চান, বেশ অবাক হলেন তিনি। তবে অনুমতি দিলেন শীঘ্রি। ভেতরে ঢুকে একগাদা সৌজন্য ঝেড়ে বসলেন মিস মার্পল। বললেন, ‘আপনাকে অসময়ে বিরক্ত করতে এলাম বলে দুঃখিত। জানি, আপনি খুবই ব্যস্ত, কিন্তু মনের তাগিদে না এসে পারলাম না। মনে হলো, ইন্সপেক্টর স্ল্যাকের চেয়ে আমিই বেশি সাহায্য করতে পারব আপনাকে। তা ছাড়া আমি চাই না, কনস্টেবল পাক

কোন বিপদে পড়ুক। আসলে তার অকুস্থলে গিয়ে কোন কিছু স্পর্শ করাই ঠিক হয়নি।'

কর্নেল মেলচেট পরিষ্কার কিছু বুঝতে না পেরে বললেন, 'পাক? মানে, সেণ্ট মেরি মিডের সেই কনস্টেবলটা তো? কী করেছে সে?'

'স্পটে গিয়ে একটা আলপিন পায় সে। আর সেটা সে গুঁজে রাখে নিজের টিউনিকে।'

'হ্যাঁ, কথাটা শুনেছি বটে। স্ল্যাকের কাছ থেকেই শুনেছি, পাক একা আলপিন তুলে নিয়েছিল মিসেস স্পেনলোর মৃতদেহের পাশ থেকে। এটা ঠিক যে, কোথাও খুন হলে সেখানে গিয়ে কোন কিছু স্পর্শ করাটা ঠিক নয়। কিন্তু সামান্য একটা আলপিনে কী এসে যায়? এরকম সাধারণ আলপিন যে-কোন মহিলা ব্যবহার করতে পারে।'

'না, কর্নেল, এ আপনার ভুল ধারণা। আপাতদৃষ্টিতে এই পিনটিকে সাধারণ মনে হলেও, আসলে কিন্তু এটি একটু আলাদা। সাধারণ পিনের চেয়ে সরু এই পিনগুলো ড্রেসমেকাররাই বেশি ব্যবহার করে থাকে।'

মেলচেট স্থির দৃষ্টিতে তাকালেন মিস মার্পলের দিকে। তাঁর চেহারা দেখে মনে হচ্ছে, তিনি যেন বুঝতে পেরেছেন মিস মার্পলের মনের কথা। মিস মার্পল বার কয়েক মাথা ঝাঁকালেন সায় দেয়ার ভঙ্গিতে। বললেন, 'হ্যাঁ, অবশ্যই। আমার কাছে এটা একদম পরিষ্কার। খুন হওয়ার আগে কিমোনো পরে নতুন পোশাকটা পরখ করছিলেন মিসেস স্পেনলো। একসময় তিনি চলে আসেন সামনের ঘরে। তখন পলিট মাপজোখের কথা বলে হাতের টেপটা তার গলায় পেঁচায়। দ্রুত সেরে ফেলে অপকর্মটি। তারপর বাইরে এসে এমনভাবে দরজায় টোকা দিতে থাকে, যেন সদ্য এসে পৌঁচেছে। কিন্তু পিনটি সে প্রমাণ হিসেবে ফেলে এসেছে, ঘৃণাক্ষরেও টের পায়নি।'

'তা হলে কী পলিটই মি. স্পেলোকে টেলিফোন করেছিল?'

'হ্যাঁ, দুপুর আড়াইটার সময় সে ফোনটা করে। তখন পোস্ট অফিসে বাস এসে থামে, এবং কয়েক মিনিটের জন্যে একদম ফাঁকা থাকে পোস্ট অফিস। এই সুযোগটাকেই কাজে লাগিয়েছে পলিট। ফোন করার সময় কেউ দেখতে পায়নি তাকে।'

কর্নেল মেলচেট বললেন, 'কিন্তু মাই ডিয়ার মিস মার্পল, কোন উদ্দেশ্য ছাড়া তো খুন হয় না কখনও।'

'এখানে মিস পলিটের উদ্দেশ্যটা কী?'

'উদ্দেশ্যটা বলতে গেলে একটু পেছন ফিরে তাকাতে হবে। ঘটনার শুরু তো অনেক আগে থেকে।'

'কী রকম?'

'ঘটনার শুরু সেই চুরি থেকে। মানে–সেই দামি পান্নাগুলো! রত্নগুলো সরানোর ব্যাপারে দুই পরিচারিকা যে জড়িত ছিল–অবস্থা দৃষ্টে সহজেই বোঝা যায়। তখন মিসেস স্পেনলোর সাথে পলিটও কাজ করত সে বাড়িতে। একটা জিনিস ভেবে দেখুন, কর্নেল, মিসেস স্পেনলো যখন ওই গার্ডেনারকে বিয়ে করেন, তখন কী ফুলের দোকান দেয়ার মত যথেষ্ট টাকা তাঁদের ছিল? ওই টাকাটা এসেছে পান্নাগুলো বিক্রির ভাগের টাকা থেকে। টাকায় টাকা আনে। কাজেই মিসেস স্পেনলো তাঁর ভাগের টাকা একের পর এক বিভিন্ন ব্যবসায় খাটিয়ে প্রচুর লাভ করেন। কিন্তু পলিটের বড় দুর্ভাগ্য! টাকাগুলো ধরে রাখতে না পেরে শেষে একটি ভিলেজ ড্রেসমেকার হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয় তাকে। তারপর ঘটনাচক্রে মিসেস স্পেনলোর সাথে তার দেখা হতেই বেধে যায় ভজকট। শুরুতে অবশ্যি পরিস্থিতি এতটা জটিল ছিল না। টেড জেরাল্ডে আগমন উস্কে দেয় ঘটনাকে।

'মিসেস স্পেনলো শেষ দিকে পাপবোধে ভুগছিলেন। এ থেকেই ধর্মের দিকে ঝোঁকেন তিনি। আর তাঁকে এ ব্যাপারে উৎসাহ যোগাচ্ছিল টেড জেরাল্ড। এদিকে পলিটের গুরুকম্প শুরু হয়ে যায় মিসেস স্পেনলোর ধর্মীয় কাজ দেখে। কী জানি, শেষে

ওই চুরির কথা ফাঁসই করে দেয় কিনা মেয়েটা। তা হলে তো জেলের ঘানি টানা ছাড়া কোন পথ নেই। এ ভয় থেকেই মিসেস স্পেনলোকে খুনের পরিকল্পনাটা করে সে। আর খুনটা এমনভাবে করে, যাতে ফাঁসিতে ঝোলেন সাদাসিধে মি. স্পেনলো।'

কর্নেল মেলচেট ধীর কণ্ঠে বললেন, 'শুধু একটা পয়েন্টের ভিত্তিতে আপনার কথাগুলো যাচাই করা সম্ভব। তা হচ্ছে–অ্যাম্বারক্রমবাইদের পরিচারিকা হিসেবে পলিটের স্বীকারোক্তি।'

মিস মার্পল তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'এটা কোন ব্যাপারই নয়। সত্যের মুখোমুখি হলে পলিট ভেঙে পড়তে বাধ্য। আর এখানে আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে, কাল যখন তার ওখানেই যাই, সেই মাপামাপির ফিতেটা–মানে, যা দিয়ে খুনটা করা হয়েছে, সেটি কৌশলে বাগিয়ে এনেছি। কাজেই পলিট ফিতে খুঁজে না পেয়ে ভাববে, নির্ঘাত পুলিস কোনভাবে কব্জা করেছে ওটা। আর মূর্খ মহিলা তখন খুনী হিসেবে ধরা পড়ার ভয়ে এমনিতেই সিটিয়ে উঠবে।'

শেষে কর্নেল মেলচেটের দিকে তাকিয়ে হাসলেন মিস মার্পল। উৎসাহ দেয়ার ভঙ্গিতে বললেন, 'দেখবেন, কোন অসুবিধে হবে না আপনার। নিশ্চিন্তে এগিয়ে যান সামনে।'

যেন এক হাসিখুশি খালা তাঁর ভাইপোকে বলছেন, 'চিন্তা করিস নে, ভাগ্নে, প্রবেশিকা পরীক্ষায় দিব্যি পাস করে যাবি।'

এবং কর্নেল মেলচেট শেষে সত্যিই পাস করেছিলেন।

মূলঃ আগাথা ক্রিস্টি
রূপান্তরঃ শরিফুল ইসলাম ভূঁইয়া

সাতটি ভুল ঘড়ির রহস্য

আলফ্রেড হিচকক বলছি: একটা ধাঁধা দিলাম, দেখুন তো উত্তর দিতে পারেন কিনা। সময় সেকেণ্ড মিনিট ঘণ্টা মিনিট সময় সেকেণ্ড ঘণ্টা। আচ্ছা বলুন তো, ঘণ্টাকে মোট কয় ভাগে ভাগ করা যায়? পারবেন না, বরং আমিই বলি—দুই ভাগে। আধ ঘণ্টা আর একঘণ্টা। সাধারণত ঘণ্টার এই দুই ভাগই আমরা বলে থাকি। কেউ কেউ কদাচিৎ পৌনে ঘণ্টা, পোয়া ঘণ্টা বলে থাকেন। তবে সেটা নিতান্তই শখের বশে। মানুষের জীবনে ঘণ্টা, বিশেষ করে সময়, অসংখ্য ভাগে বিভক্ত। সাঁই সাঁই করে রকেটের মত সময় কেবলই পেরিয়ে যায়। ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলে টিক টিক টিক।

এবার তত্ত্বকথা বাদ দিয়ে একটা রহস্যের কথায় আসি। রহস্যটা সময়ের এগিয়ে চলা নিয়ে নয়, পিছিয়ে পড়া নিয়ে। খুব অবাক লাগছে, তাই না? হ্যাঁ, অবাক হওয়ার মতই বটে। সময়ের এই পিছিয়ে পড়ার ব্যাপারটা নিয়েই আমার 'সাতটা ভুল ঘড়ির রহস্য'।

আকস্মিক চিৎকারটা গায়ে গায়ে কাঁপুনি ধরিয়ে দেবার মত। এমন করে চিৎকার করল কে? থমকে দাঁড়ালেন মর্নিংস্টার পত্রিকার রবিবাসরীয় ধাঁধা এবং শব্দ-জব্দ বিভাগের সম্পাদক মি. পিটার পারকিন্স। শক্ত করে চেপে ধরলেন তাঁর ছড়ির সোনা বাঁধানো

হাতলটা। শেষ অক্টোবরের ম্লান গোধূলির নির্জন বালুতীর। জনপ্রাণীর চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। তা হলে কে চেঁচাল এমন করে? ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি দেখার জন্যে। আর তখুনি চোখে পড়ল কঙ্কালটা। খট খট করে সেটা এগিয়ে আসছে তারই দিকে। ওটার মাথার ওপরে ডানা ঝটপটিয়ে উড়ছে এক রক্ত চোষা বাদুড়। পাশেই এক নেকড়ে তাকিয়ে আছে জ্বলন্ত চোখে। যেন যে কোনও মুহূর্তে লাফিয়ে পড়বে ঘাড়ের ওপর।

একেবারে গাঁজাখুরি গল্প মনে হচ্ছে, তাই না? ভাবছেন নেশা করে সব আবোল-তাবোল ভূতের গল্প শোনাতে বসেছি। আসলে যা ভাবছেন তা নয়। সত্যি বলেছি কিনা মন দিয়ে শুনলেই বুঝতে পারবেন। পুরো ব্যাপারটা বললেই পানির মত সহজ হয়ে যাবে।

গায়ে মোটা পশমি কোট, গলায় গলাবন্ধ, হাতে দস্তানা; উলেন মোজা আর চামড়ার বুট পায়ে, ছড়ি হাতে আটলান্টিকের তীরে পায়চারি করছিলেন মি. পারকিন্স। বেশি শীত পড়ায় এসময়টায় এমনিতেই ভ্রমণকারীদের ভিড় থাকে কম। তার ওপর কয়দিন শীতটা আরও বেশি পড়ায় একেবারেই নির্জন হয়ে পড়েছে সাগরতীর। যা-ও বা দুই চারজন আসে, তারা সূর্য ডোবার আগেই চলে যায়। বিস্তৃত তীরভূমি তখন খাঁ খাঁ করে। শনশন করে বইতে থাকে হিমেল হাওয়া। ঝিরিঝিরি বিষণ্ন শব্দ তুলে দুলতে থাকে ঝাউপাতা। শুনে মনে হয় যেন প্রেতপুরীর অদৃশ্য প্রেতাত্মারা গোঙাচ্ছে চাপা স্বরে।

এদিনের নির্জনতাটা যেন আরও জমাট, আরও বিষণ্ন। একটু একটু করে গাঢ় হচ্ছে অন্ধকার। সাগরের ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে পাড়ে। তাতে শব্দ তুলছে গুমগুম। বিস্তৃত বালিয়াড়ি সাদা রাস্তার মত, দূরে মিশে গেছে এক বিন্দুতে। উপকূল ক্রমশ উঁচু হতে হতে আড়াল করে ফেলেছে আকাশের অনেকটা। দূরের ফেরির কারখানা থেকে মৃদু একটানা আওয়াজ ভেসে এসে মিশে

যাচ্ছে ঢেউ-এর শব্দের সাথে। তবু কেমন যেন এক অদ্ভুত থমথমে নিস্তব্ধতা চারপাশে।

ভূতুড়ে অনুভূতিটা ঝেড়ে ফেলার জন্যে জোরে পা চালালেন পিটার পারকিন্স। সূর্য ডোবার পর সাগর পাড়ে এক ঘণ্টা হাঁটা তার রোজকার অভ্যেস। এক ঘণ্টা পুরতে এখনও বিশ মিনিট বাকি। বেড়ানো শেষ হলে যাবেন বন্ধু ফ্রিৎজ স্যাঙোজের কাছে। তার আটলাণ্টিক স্ট্রিটের ঘড়ির দোকানে সপ্তাহে একদিন না গেলে চলেই না পিটারের। ধাঁধা মিলাবার অদ্ভুত ক্ষমতা স্যাঙোজের। সপ্তাহের একটি দিনে দুবন্ধু মিলে জটিল সব ধাঁধার সমাধানে কাটিয়ে দেন দীর্ঘসময়।

আকস্মিক চিৎকার শুনে ঘুরে দাঁড়িয়ে তিনি যে দৃশ্য দেখলেন তা সত্যিকার নয়। সামনের বাড়িটার দেয়ালে আঁকা ছবি ওগুলো। এতই জীবন্ত ছবি যে হঠাৎ চোখে পড়লে ভয়ে জমে যাবে শরীর। বাড়িটার নাম 'প্রেতপুরী'। দেয়ালের গায়ে লেখা রয়েছে:

ভয়ে আপনার চুল সাদা হয়ে গেলে।

আমাদের দোষ দেবেন না কিন্তু।

বাড়ির মালিক চতুর ব্যবসায়ী। ভ্রমণার্থীদের মাথায় হাত বুলিয়ে টু-পাইস কামানোর বেশ ভাল বন্দোবস্তই করেছে সে। তিন দিকের দেয়াল জুড়ে আঁকা অদ্ভুত আর ভয়ঙ্কর সব ছবি। কঙ্কাল, বাদুড়, নেকড়ে এগুলো সব একদিকের দেয়ালের। বাড়ির ভেতরটা স্বয়ংক্রিয় বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি আর সাজ সরঞ্জামে ভর্তি। এগুলো হাঁটে চলে, কথা বলে নানারকম অঙ্গভঙ্গি করে। তার ব্যবসার মূলধনই এই যন্ত্রপাতিগুলো।

বছরের এসময়টা ভিড় কম থাকে বলে দিন থাকতেই বন্ধ করে দেয়া হয় প্রেতপুরী। দীর্ঘসময় অচল থাকলে যন্ত্রপাতি সব অকেজো হয়ে যেতে পারে ভেবে বন্ধ করে চলে যাবার সময় বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা চালু রেখে যায় মালিক।

এবার আর চিৎকার নয়, ভেসে এল কাতর আর্তনাদ। সেই আর্তনাদে ভারি হয়ে উঠল পিটারের মন। তাঁর মনে হলো প্রেতপুরী থেকেই আসছে শব্দটা। হয়তো কোনও কুকুরছানা আটকে পড়েছে, সে-ই চেঁচাচ্ছে।

একটু ইতস্তত করলেন পিটার পারকিন্স। এখন কী করা উচিত তাঁর? পুলিশে খবর দেবেন। কিন্তু কীভাবে? কাছে কিনারে তো কোনও টেলিফোন নেই। তা ছাড়া খবর পাওয়ামাত্র কি আর পুলিশ আসে কোনওদিন? ততক্ষণে হয়তো ছানাটা চেঁচাতে চেঁচাতে মরেই যাবে।

আবার শোনা গেল সেই আর্তনাদ। নির্জন সমুদ্রতীরে তা করুণ বিলাপের মত প্রতিধ্বনিত হতে হতে মিশে গেল ঢেউয়ের গর্জনের সঙ্গে। এবারে আর ইতস্তত করলেন না পিটার। নিজেই কিছু করার জন্যে সোজা গিয়ে হাজির হলেন বাড়িটার সামনে।

পিটারের দয়া একটু বেশি। তাঁর অতি কোমল মন মানুষ তো দূরের কথা সামান্য পশুপাখির দুঃখেও কাতর হয়ে ওঠে। জানি না এমন পরিবেশে আমাদের মত সাধারণ মানুষেরা একটি কুকুরছানার জন্যে কি করতাম। পিটার কিন্তু অবলা জীবটিকে মুক্তিদানের সংকল্পে একেবারে বদ্ধপরিকর হলেন।

প্রেতপুরীর ভেতরে ঢোকার দরজাটা তালাবদ্ধ। পুরানো দরজার কাঠ রোদে বৃষ্টিতে বেঁকে চুরে গেছে। দুই তিনবার ধাক্কাধাক্কি করে খুলতে না পেরে শেষে পকেট থেকে ছোট্ট ছুরিটা বের করলেন পিটার। ওটার সরু আগা তালার ফুটোয় ঢুকিয়ে একটু চাড় দিতেই খুট করে খুলে গেল। ঠেলে দরজাটা খুলতেই এক ঝলক হিমশীতল হাওয়া আছড়ে পড়ল তাঁর চোখেমুখে। ভেতরে ঢুকে তিনি ভেজিয়ে দিলেন দরজা। গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে গেল চারপাশ। দেয়াল হাতড়ে আলোর সুইচ খুঁজতে খুঁজতে মুখে চুকচুক শব্দ করে তিনি ডাকলেন কুকুরছানাটিকে, 'আয়, টমি।

আয়! আয়, চুকচুকুচুক।'

ডেকে উঠল ছানাটি। মনে হলো দূর থেকে এল ডাকটা। সুইচটা খুঁজে পেতেই আলো জ্বালিয়ে দিলেন পিটার। ঝাপসা ফিকে নীল আলো দেয়ালের এক ফোকর থেকে বেরিয়ে সোজা গিয়ে পড়ল একটা কঙ্কালের ওপর। আলো পড়তেই কঙ্কালটা তাঁর দিকে আঙুল তুলে খনখনে গলায় ছড়া কাটল:

আসুন আসুন স্বাগতম
বোকা বনতে স্বাগতম
পায়ের ছাপ খুঁজতে চান
এগিয়ে যান এগিয়ে যান
যদি কিছু বিপদ ঘটে
দোষ দেবেন না আমায় মোটে।

প্রেতপুরীর সব রহস্যই আগে থেকে জানা আছে পিটারের। প্লাস্টিকের তৈরি কঙ্কলটা, কথাগুলো টেপ করা। আলোগুলোও স্বয়ংক্রিয়। সবই জানেন পিটার, তবু এই মুহূর্তে কঙ্কালের বদলে রক্তমাংসের মানুষের স্বর শুনতে পেলে মহাখুশি হতেন তিনি। ওটাকে একটা ধাঁধা জিজ্ঞেস করে জব্দ করতে ইচ্ছে হলো তাঁর। কিন্তু অদৃশ্য হাসিতে ভরিয়ে দিয়ে ততক্ষণে অদৃশ্য হয়েছে ওটা। সঙ্গে সঙ্গে মেঝেতে ফুটে উঠল একসারি পায়ের ছাপ। বরাবর এগিয়ে গিয়ে সামনের অন্ধকারে হারিয়ে গেছে ওগুলো।

বাড়ি ঘুরে দেখার শখ নেই, ছানাটাকে পেলেই তিনি খুশি। পায়ের ছাপ ধরে সতর্কভাবে এগোতে শুরু করলেন। ছাপগুলো ধরে হাঁটলেই অন্ধকার পেরিয়ে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে যাওয়া যায়, জানেন পিটার।

সামনে এগোতেই একটা দরজা পড়ল। ভেতরে ঢুকতেই শুরু হলো ভয়ানক সব কাণ্ডকারখানা। মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ চমকের সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়ার গোঙানি। সেই ঝড়ের মধ্যে ছড়ি ঘুরিয়ে নাচছে

তিন ডাইনি। হঠাৎ এমন কাণ্ড ঘটতে দেখে চমকে উঠলেন পিটার। চমক ভাঙতে মুচকি হেসে সামনে এগোলেন। আরেকটি ঘর পড়ল। সেটাতে ঢুকতেই তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ডজনখানেক রক্তচোষা বাদুড়। ঝট্ করে মাথা নামিয়ে ফেললেন তিনি। উড়ে গেল ওগুলো সিলিঙের দিকে। আবার আক্রমণের ভঙ্গিতে নেমে এল মাথার ওপর। প্লাস্টিকের বাদুড়গুলো তামার তারের ওপর এমনভাবে সাজানো, আলোর কারসাজিতে মনে হয় যেন সত্যি সত্যি রক্ত খাবার লোভে ছুটে আসছে ডানা ঝাপটাতে।

সে-ঘর থেকে বেরুতেই পড়ল আরেক ঘর। ভেতরে ঢুকতেই কয়েকটি মমি একসঙ্গে তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিল ফ্যাকাসে কাপড়ে মোড়ানো হাত। এবার আর ঘাবড়ালেন না পিটার। মমিগুলো তামার তার আর সাদা কাপড়ের কারসাজি। এমন এক বিশেষ রঙ দিয়ে কাপড় মাজা যে কেবল মৃদু বেগুনে আলোতেই চোখে পড়ে। মমিগুলোর সঙ্গে একটু রসিকতা করার ইচ্ছে হলো পিটারের। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'বলুন তো মমি সাহেব, প্রলয়ঙ্কর বন্যার সময় নোয়া ও তার পরিবারের লোকেরা জাহাজের কেবিনে বসে তাস খেলেনি কেন?'

'এটা একটা বিখ্যাত ধাঁধা। উত্তর হলো, খেলবে কীভাবে? নোয়া তো সারাক্ষণই কেবিনের বাইরে ডেকে বসেছিল।'

কিন্তু উত্তর দেবার বদলে গোঁ গোঁ করতে করতে হঠাৎ কান ফাটানো এক চিৎকার দিয়ে সিলিঙের দিকে লাফ মেরে অদৃশ্য হয়ে গেল মমির দল। আসলে অদৃশ্য-টদৃশ্য কিছু নয়, বেগুনে আলোটা নিভে ফিকে নীল আলো জ্বলে উঠেছে। মমি-রুম থেকে বেরিয়ে তিনি আবার চুকচুক করে কুকুর-ছানাটিকে ডাকতে ডাকতে আরেকটি ঘরে ঢুকলেন। এ ঘরটাতে পৃথিবীর ভয়ঙ্কর সব খুনীদের ডজনখানেক মূর্তি। প্রত্যেকটার চেহারা বীভৎস, মুখের ভঙ্গি হিংস্র। তার পাশের ঘরটাতে চোখ পড়তেই ভয়ে শিরশির

করে উঠল পিটারের গা। সিলিঙের কড়িকাঠ থেকে ঝুলছে গলায় দড়ি দেয়া এক মূর্তি। তার মুখ গহ্বর থেকে বেরিয়ে এসেছে লম্বা লকলকে লাল জিভ। পিটারের মনে হলো, আগে থেকে জানা না থাকলে হার্টফেল করতেন তিনি। তাড়াতাড়ি সে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন। সামনে আরেকটি ঘর। এটাতেও ভয়ঙ্কর কিছু আছে। তবে সেটা আর দেখার ইচ্ছে হলো না তাঁর। আবার ডাকলেন কুকুর ছানাটিকে, 'আয় টমি, আয় আয়! চুকচুক!'

এবারও সাড়া দিল ছানাটি। ক্রমেই যেন দূরে সরে যাচ্ছে ডাক! অবাক হলেন পিটার। সামনে এগোতেই বাড়ির পেছন দিয়ে বেরুবার দরজা পড়ল। সামনের দরজা দিয়ে ঢুকে সব দেখা শেষ হলে এই দরজা দিয়েই বেরিয়ে যায় দর্শকরা।

চিন্তিতভাবে এই দরজা দিয়েই বেরিয়ে একটা গলিতে এসে দাঁড়ালেন পিটার। নির্জন গলিটাতে কোনও আলোর ব্যবস্থা নেই, তাই কেমন ভূতুড়ে লাগছে। আটলাণ্টিক স্ট্রিটের দোকানগুলোর পেছন দিক এ জায়গাটা। এখানেই দেখতে পেলেন কুকুরছানাটিকে। একটা খুঁটির সঙ্গে শেকল দিয়ে বাঁধা। ওটাই ডাকছে অমন করুণ সুরে। ওটাকে দেখে পিটারের বুক থেকে যেন ভারি বোঝা নেমে গেল। মৃদু হেসে বললেন তিনি, 'ওরে শয়তানের শিরোমণি, নাকে দড়ি দিয়ে এতক্ষণ আমাকে তো বেশ ঘোরালে। থাক এভাবেই। খুলে দিতে পারব না। ছাড়া পেলেই পালাবে তুমি।'

এতক্ষণে আসল রহস্য বুঝতে পারলেন পিটার। প্রেতপুরীতে শব্দগ্রহণ ও শব্দ নিয়ন্ত্রণের এক অদ্ভুত যন্ত্র আছে। সেই যন্ত্রের মাধ্যমেই কুকুরটার ডাক অমন করুণভাবে বাড়িময় ছড়িয়ে পড়ছিল বারবার।

ভালই হলো, ভাবলেন পিটার, বিশটা মিনিট এক শ্বাসরুদ্ধকর রহস্যের সন্ধানে কেটে গেল। আবার বন্ধুর দোকানের কাছাকাছিও

পৌঁছে যাওয়া হলো।

বন্ধু ফ্রিৎজ স্যাণ্ডোজ সুইজারল্যাণ্ডের লোক। বেঁটেখাটো রোগা চেহারার এই মানুষটি ঘড়ি সারাতে ওস্তাদ। লোকে তাকে ঘড়ির জাদুকর বলে। দোকানের নামটিও চমৎকার 'ঘড়ির হাসপাতাল'। পিটারের সঙ্গে তার অনেকদিনের বন্ধুত্ব। দুজনেরই ধাঁধা মিলাবার নেশা, তাই জমে ভাল।

সামনে দিয়ে দোকানে ঢুকতে গেলে ঘুরতে হবে অনেকখানি পথ। অত ঝামেলায় না গিয়ে দোকানের পেছনের দরজা খুললেন পিটার। দরজায় নক করে স্যাণ্ডোজকে ডাকা না ডাকা সমান কথা। এককালে সুইস সেনাবাহিনীতে ছিল সে। সেই সময় এক দুর্ঘটনায় সে তার বাক ও শ্রবণশক্তি দুই-ই হারায়। পিছনের দরজা তালাবদ্ধই থাকে। বিশেষ কায়দার ডোরলক, পিটার খুলতে জানেন। দরজার হাতলটা তিনবার ডানে, চারবার বাঁয়ে, ফের দু'বার ডানে ঘোরালে তবে খোলে। দরজা খুলে অন্ধকার ঘরে ঢুকতে ঢুকতে পিটার জোরে ডাকলেন, 'ফ্রিৎজ, এই ফ্রিৎজ, তুমি কোথায়?'

'ধরেছি বাছাধনকে, এবার পালাবে কোথায়?' অন্ধকারে আচমকা জাপটে ধরে কে যেন টানতে টানতে তাকে নিয়ে এল দোকানের আরেকটি ঘরে। উজ্জ্বল আলো জ্বলছে ঘরটাতে। গাঢ় অন্ধকার থেকে হঠাৎ তীব্র আলোয় এসে চোখ ধাঁধিয়ে গেল পিটারের।

'ধরেছি খুনীটাকে,' জাপটে ধরা লোকটি খুশি খুশি গলায় বলল। 'খুন করে আবার ফিরে এসেছে হারামজাদাটা। আমি আগেই জানতাম, ফিরে ঠিকই আসবে।'

দু'চারবার চোখ মিটমিট করে আলো সইয়ে নিয়ে বিমূঢ়ভাবে তাকালেন পিটার। দেখেন সামনে দাঁড়িয়ে আছেন স্থানীয় থানার ডিটেকটিভ সার্জেন্ট ম্যাগরু। মেঝেতে উবু হয়ে কী যেন খুঁজছে

দু'জন লোক। তাদের পাশে বিরাট এক দেয়াল ঘড়ি খাড়া করা রয়েছে। ফ্রিৎজকে যে-সব ঘড়ি লোকে সারতে দিয়ে যায়, এটা তারই একটি। তারপরই চোখে পড়ল সেই বস্তুটি। একটি মৃতদেহ। এবং ওটা কার, তা-ও বুঝতে অসুবিধা হলো না পিটারের। তার বন্ধু, ঘড়ির জাদুকর ফ্রিৎজ স্যাণ্ডোজ, মরে পড়ে আছে!

দুঃখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়লেন পিটার। নির্বোধের মত তাকালেন ম্যাগরুর দিকে। ম্যাগরুর বুলডগের মত মুখখানা থমথম করছে। চোখে তীব্র বিতৃষ্ণা নিয়ে তিক্তস্বরে তিনি বললেন, 'ওকে ছেড়ে দাও, স্নাইডার। ও পিটার পারকিন্স। ধাঁধা সম্পাদক। খুনী নয়, আস্ত এক অপদার্থ!'

পিটারকে ছেড়ে দিয়ে স্নাইডার বলল, 'খুনী নয়তো, পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকল কেন? তা ছাড়া আপনিই তো বলেছিলেন, চারপাশে নজর রাখতে, খুনীটা ফিরে আসতে পারে।'

'বাদ দাও ওসব,' ওকে থামিয়ে দিয়ে বললেন ম্যাগরু। 'যাও, অন্যদের কাজে সাহায্য করগে।' তারপর পিটারের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, পারকিন্স, ব্যাপার কী? পেছনের দরজা দিয়ে চোরের মত ঢুকলে কেন?'

'চোরের মত ঢুকিনি। ফ্রিৎজের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। আজ আমাদের দুজনের ধাঁধা মেলাবার দিন।'

'দুজনের ধাঁধা মেলাবার দিন! মানে?'

'মানে খুবই সহজ। ফ্রিৎজ ধাঁধা মেলাতে ওস্তাদ। আমরা দুজনেই ন্যাশনাল পাজল লীগের সদস্য। ফ্রিৎজ সিসারো, আর আমি প্লুটার্ক।'

'সিসারো, প্লুটার্ক! কী আবোল-তাবোল বকছ?'

'আবোল-তাবোল নয়। ক্লাবের দেয়া আমাদের ছদ্মনাম।'

'জাহান্নামে যাক তোমাদের ছদ্মনাম! দেখতেই পাচ্ছ, খুন

হয়েছে তোমার বন্ধু। তদন্ত করছি আমরা। এ সময় তোমার ওই গোলক ধাঁধা মার্কা আজেবাজে কথা বলে ডিসটার্ব করতে এসো না, বুঝেছ?'

পিটার বুঝলেন গোলক ধাঁধা মার্কা আজেবাজে কথা বলতে ম্যাগারু কী বোঝাতে চাইছেন। এর আগে কয়েকটি খুনের ব্যাপারে ম্যাগরুকে কিছু উপদেশ দিয়েছিলেন পিটার। সবকটিই যে কাজে লেগেছিল, তা নয়। তবে বেশির ভাগই ঠিক হয়েছিল। আত্মসম্মানের প্রশ্ন ছিল বলে ম্যাগরু তাতে খুশির বদলে অখুশিই হয়েছিলেন।

'ফ্রিৎজকে কে খুন করেছে?' গলাটা একটু কেঁপে উঠল পিটারের।

'তা জানতেই এখানে এসেছি,' উত্তর দিলেন ম্যাগরু। 'কাল রাতে খুন হয়েছে ফ্রিৎজ। এখানে বসেই ঘড়িতে দম দিচ্ছিল সে, দেখে মনে হচ্ছে। রোজ রাত বারোটায় দম দিত সে।'

'হ্যাঁ, তাই। তারপর?'

'তখুনি ঢুকেছে খুনি। নকল চাবি ছিল তার। দরজা ভাঙার কোন চিহ্নই নেই। কানে শুনত না ফ্রিৎজ, তাই কোনও শব্দ পায়নি। খুনি পেছন থেকে তার মাথায় আঘাত করেছে। এর বেশি আর কিছু বের করতে পারিনি।'

'খুনি এমন কেউ যে ফ্রিৎজকে ভালমত জানত,' চিন্তিতস্বরে বললেন পিটার। 'ব্যাঙ্কের ওপর আস্থা না থাকায় ফ্রিৎজ যে নিজের কাছে টাকা রাখত তা নিশ্চয়ই জানত খুনি। আমার মনে হয়, ওই টাকাই তার মৃত্যুর কারণ। যতদূর জানি, কারও সঙ্গে তার শত্রুতা ছিল না।'

'টাকাই যে মৃত্যুর কারণ তা আমরা বুঝতে পেরেছি,' খিঁচিয়ে উঠলেন ম্যাগরু। 'ডেস্কের ড্রয়ারগুলো খোলাই রয়েছে। তোমার মত ধাঁধা পণ্ডিতের কাছ থেকে কোনও উপদেশ আমাদের দরকার

নেই। তুমি এখান থেকে যাও...না, থাক। যাও, ফ্রিৎজের অফিসরুমে চুপটি করে বসে থাক। কিছুতে হাতটাত দিয়ো না। তোমাকে কিছু প্রশ্ন করা হতে পারে।'

প্রশ্ন করার অনেক কিছু পিটারেরও ছিল। কিন্তু ম্যাগরুর মেজাজের ভয়ে তাঁকে চুপ থাকতে হলো। নিঃশব্দ পায়ে ফ্রিৎজের অফিস-কাম ঘড়ি সারাই কারখানা ঘরটাতে ঢুকলেন পিটার। এই ঘরটা ছোট। এর পেছনেরটা বেশ বড়। ঘর ভর্তি ঘড়ি। দেয়ালে, মেঝেতে, আলমারিতে, সবখানে শুধু ঘড়ি। সারার অপেক্ষায় রয়েছে ওগুলো। ছোট্ট ডেস্কটার সব কটি ড্রয়ারই ভাঙা। উল্টে পড়ে রয়েছে টুলটা। ডেস্কের সামনে একটা চেয়ার পাতা রয়েছে। বাইরের কেউ এলে বসে ওটাতে। শো-রুমটা রাস্তার সামনে।

পিটার পারকিন্স তাঁর কোট খুলে ডেস্কের ওপর রেখে চেয়ারটাতে বসে ঘরের চারপাশে চোখ বোলালেন। খোলা দরজা দিয়ে পাশের ঘরটাতে তাঁর দৃষ্টি গেল। ও ঘরেই ফ্রিৎজ সাজিয়ে রাখে খদ্দেরদের সারতে দেয়া দামি দেয়াল ঘড়িগুলো। চারপাশেই ফ্রিৎজের স্মৃতি। শুধু সে-ই নেই। দুঃখে ভরে গেল পিটারের মন। 'খুনিকে উপযুক্ত শাস্তি পেতেই হবে,' মনে মনে বললেন তিনি। ম্যাগরু বুদ্ধিমান, তবে গোঁয়ার, কারও কথা শুনতে চায় না। তবু চেষ্টা করে দেখবেন তিনি, তাঁর যুক্তিসঙ্গত কথাগুলো যাতে ম্যাগরু শোনে।

চেয়ারে বসেই ঘরটার সব কিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন পিটার। খুনিটা অনেকক্ষণ এ ঘরটাতে কাটিয়েছে। ডেস্কের ড্রয়ার ভেঙে টাকা খুঁজেছে সে। ভালমত খুঁজলে সূত্র-টুত্র পাওয়া যেতে পারে।

সামনের তাকটায় এলোমেলোভাবে পড়ে রয়েছে কয়েকটা ঘড়ি। মেরামত করা হলে ওগুলো তাকের ওপর সাজিয়ে রাখত ফ্রিৎজ। দেয়ালের একপাশে একটা বড় বোর্ডে সারি সারি

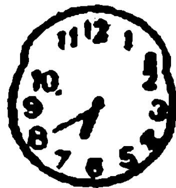
পেরেকে ঝুলছে একগাদা হাতঘড়ি। ডেস্কের ওপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ঘড়ি সারাইয়ের একরাশ যন্ত্রপাতি। তার মাঝে পড়ে আছে একটা বৈদ্যুতিক দেয়াল ঘড়ি। ফ্রিৎজ গোছাল স্বভাবের মানুষ। ঘরের অগোছাল অবস্থা দেখে পিটার বুঝলেন, কাজের মাঝেই বেচারা আক্রান্ত হয়েছিল।

ব্যথায় টনটন করে উঠল পিটারের বুক। কতবার তাকে নিজের কাছে টাকা রাখতে নিষেধ করেছেন তিনি। এইসব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে হঠাৎই তাঁর চোখ পড়ল টেবিলের ঘড়িটার ওপর। আশ্চর্য এক চিন্তা বিদ্যুৎ চমকের মত তাঁর মনে ঝিকিয়ে উঠল। অদ্ভুত ব্যাপার তো। উল্টোদিকে ঘুরছে ঘড়িটা!

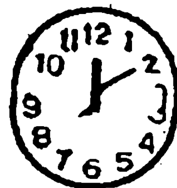
এক ঘর এক ঘর করে পিছোচ্ছে সেকেণ্ডের কাঁটা। সমান তাল রেখে তাকে অনুসরণ করছে মিনিটের কাঁটা। অবাক কাণ্ডই বটে! ঘড়ির জাদুকরের দোকানের ঘড়িতে সময় এগোচ্ছে না, পিছাচ্ছে! ব্যাপারটা মোটেই স্বাভাবিক নয়, মনে মনে বললেন পিটার। গোলমাল কিছু একটা আছেই। কিন্তু কী সেটা?

প্রশ্নটা আসলেই গুরুত্বপূর্ণ। চুপিচুপি একটা কথা বলি, ঘড়ির পেছন দিকে এগুনোটা কিন্তু গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। এ বিষয়ে ইতিমধ্যেই অনেকে উত্তর বের করে ফেলেছেন। আপনি যদি না বের করে থাকেন তা হলেও ঘাবড়াবার কারণ নেই। পরেরটুকু মন দিয়ে শুনুন।

মিনিটের কাঁটাকে ধীরে ধীরে পেছোতে দেখে পকেট থেকে ছোট্ট নোটবুক আর কলম বের করে দুটো ঘড়ি এঁকে ফেললেন পিটার। নীচে লিখলেন:



ঠিক সময়



পেছনে এগোনো ঘড়ির সময়

চেয়ার থেকে উঠে গিয়ে ভালমত ঘড়িটা দেখলেন তিনি। বহু পুরানো বৈদ্যুতিক ঘড়ি। এই ঘড়ি এখন আর তৈরি হয় না। ওটার সঙ্গে বাঁধা এক টুকরো কাগজে লেখা হয়েছে মিসেস মারফির নাম। মহিলা থাকেন রাস্তার উল্টোদিকে। ফ্রিৎজের জন্যে প্রায়ই এটা ওটা রান্না করে নিয়ে আসেন। প্রতিদানে ফ্রিৎজও যে তার আদিম কালের ঝঞ্ঝাটে ঘড়িটা সারিয়ে দেবে তা আর বিচিত্র কী! যদিও এসব রদ্দি মার্কা ঘড়ি তার একদম পছন্দ ছিল না। পুরানো আমলের স্প্রীং গিয়ার দেয়া ঘড়িই তার পছন্দ ছিল। ঘড়িটার পাশে পড়ে আছে একটা স্ক্রু-ড্রাইভার। দেখে মনে হচ্ছে, কাজ ফেলে এই মাত্র বাথরুমে গেছে ফ্রিৎজ। পিটার নিশ্চিত, কাজের মধ্যেই খুন হয়েছে সে। এমনও হতে পারে, ঘড়িটা সে ঠিকমতই সারিয়েছিল। হঠাৎ বন্দুক হাতে খুনিকে দেখেই উল্টো দিকে চালিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু কেন? খুব ভড়কে গিয়েছিল সে? নাকি ইচ্ছে করেই করেছিল? নিশ্চয়ই গভীর কোনও উদ্দেশ্য ছিল তার। ঘড়ি নিয়ে যে-কোনও কাজ তার কাছে ছিল পানির মতই সহজ। এটা করে সে আসলে কী বোঝাতে চেয়েছিল? গভীর ভাবনায় ডুবে গেলেন পিটার।

'পারকিন্স।'

ডাক শুনে চমকে তাকালেন পিটার।

খিঁচিয়ে উঠলেন ম্যাগরু, 'বলেছিলাম না, কিছুতে হাত দেবে না!'

'হাত দিইনি তো,' বললেন পিটার। 'ম্যাগরু, দেখ, এই ঘড়িটা পেছন দিকে চলছে।'

এক নজর তাকিয়ে ঠিক সেই স্বরেই বললেন ম্যাগরু, 'তাতে তোমার কি? ঘড়ি ব্যাটার বারোটা বেজেছিল বলেই তো ফ্রিৎজ সারতে বসেছিল। যাও, অন্য ঘরে গিয়ে বসোগে। এ-ঘরে কোনও হাতের ছাপটাপ পাওয়া যায় কিনা দেখি।'

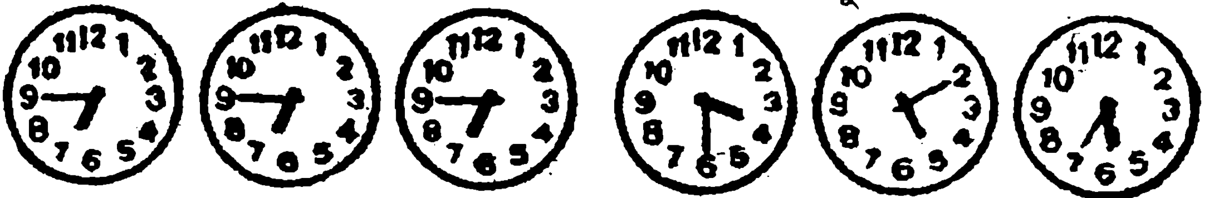
কথা না বাড়িয়ে পাশের ঘরটাতে ঢুকলেন পিটার। দেয়ালে সাজানো রয়েছে সারি সারি ঘড়ি। এই ঘড়িগুলো দেখিয়ে চিরকুমার ফ্রিৎজ বলত, এরাই আমার পরিবার-পরিজন।

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন পিটার। পুলিশি কাজের তৎপরতায় পুরো দোকান মুখর। নানান অ্যাঙ্গেলে ফ্রিৎজের মৃতদেহের ছবি নেয়া হলো। সেই সঙ্গে বড় ঘড়িটারও। ফ্রিৎজের লাশটি কাপড়ে ঢেকে কয়েকজনে ধরাধরি করে নিয়ে গাড়িতে তুলল। দীর্ঘশ্বাস ফেললেন পিটার। হাতের ছাপের খোঁজ চলছে। পাওয়া যাবে কী?

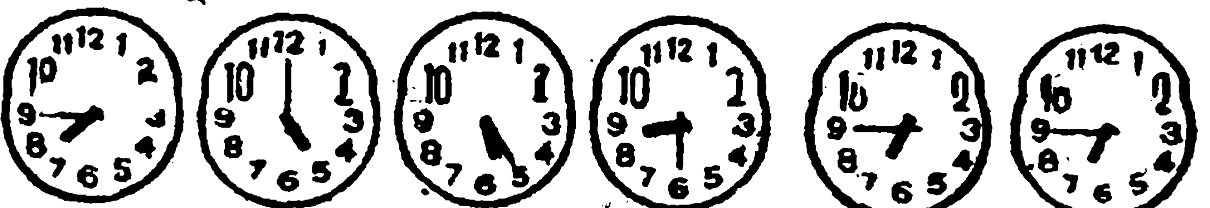
ছুটোছুটি করে একের পর এক নির্দেশ দিচ্ছেন ম্যাগরু। পুলিশগুলো সব এ-ঘর থেকে ও-ঘরে ঢুকছে আর বেরুচ্ছে। খুবই খাটছে ওরা।

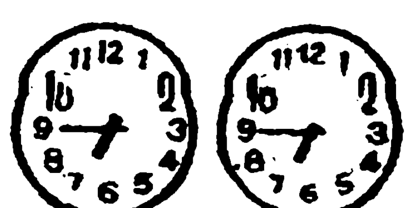
আবার চিন্তার সাগরে ডুব দিলেন পিটার। হঠাৎ ঢংঢং শব্দে তাঁর চিন্তা-সূত্র ছিঁড়ে গেল। কয়েকটা ঘড়ি সশব্দে ঘোষণা করল সময়। বাকিগুলোর ঘণ্টাধ্বনি শোনার আশায় অপেক্ষা করলেন পিটার। ফ্রিৎজের নিখুঁত ভাবে মেরামত করা ঘড়িগুলো প্রায় একই সঙ্গে বাজত। অথচ কী অবাক কাণ্ড, আর কোনও ঘড়ি বাজল না! আশ্চর্য হয়ে সবগুলো ঘড়ির দিকে তাকালেন পিটার। বেজে ওঠা ঘড়িগুলো বাদে সবগুলোই চলছে ভুল! একেকটা একেক ভাবে।

ঠিক সময় ভুল সময়



ভুল সময় **ঠিক সময়**





'অসম্ভব। এ হতেই পারে না!' বিড়বিড় করে বললেন পিটার। পেছনে চলা ঘড়িটার মত এ ব্যাপারটাও অবিশ্বাস্য। তবে কি ভুল সময় দেখিয়ে ঘড়িগুলো কোনও রহস্যের ইঙ্গিত দিচ্ছে? এই ভুলের মাঝেই কি লুকিয়ে আছে ফ্রিৎজের হত্যারহস্য?

প্রতিটি ঘড়ি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন পিটার। সব রকমের ঘড়িই আছে; টেবিল ঘড়ি, দেয়াল ঘড়ি হাতঘড়ি। সামনের দেয়ালের হুকে আটকানো রয়েছে একসারি দেয়াল ঘড়ি। সারির একেবারে শেষ প্রান্তের ঘড়িটা বিশাল আকৃতির। ফ্রিৎজ ওটাকে ঠাট্টা করে বলত, 'বাপ-ঘড়ি' এই ঘড়িটার নীচে, মেঝেতে আড়াআড়িভাবে পড়েছিল তার মৃতদেহ।

সারির পরপর তিনটে ঘড়ির সময় নির্ভুল, আবার একসারি ভুল, তারপরের দুটির সময় ঠিক। অদ্ভুত। সব কেমন জানি উল্টোপাল্টা! পাশাপাশি যেভাবে রয়েছে ঘড়িগুলো, পিটার ঠিক সেভাবেই এঁকে নিলেন।

আঁকা ছবিটার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে তারপর পকেটে রাখলেন পিটার। আবার ভাবতে বসলেন। নিশ্চয়ই কিছু বলছে এই ভুল ঘড়িগুলো। কিন্তু কী? আঁকতে আঁকতে আরেকটা জিনিস লক্ষ করেছেন তিনি। বারোটি দেয়াল ঘড়ি ছাড়া এঘরের সব ঘড়িগুলোই বন্ধ হয়ে আছে। তারমানে রাতে সবগুলোতে দম দেবার সময় পায়নি ফ্রিৎজ। মনে মনে সমস্ত ব্যাপারটা একের পর এক সাজাতে শুরু করলেন পিটার।

ফ্রিৎজ প্রতিদিন ছ'টায় দোকান বন্ধ করে রাতের খাবার খেয়ে আবার ফিরে আসে সাতটায়। আজ রাতেও হয়তো তার ব্যতিক্রম হয়নি, বন্ধুবান্ধব এলে সাতটা থেকে বারোটা পর্যন্ত অফিস রুমেই কাটাত। তারপর ঠিক রাত বারোটার সময় সব ঘড়িগুলোয় দম দিত। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে ঘটনার রাতেও দম দিতে দিতে বাবা-ঘড়ি অবধি পৌঁছেছিল সে। এমন সময় কেউ আঘাত করল

তার মাথায়। তা হলে হিসেব মত দেখা যাচ্ছে সে খুন হয়েছে রাত বারোটার দিকে। অফিস রুমে কাজ করার সময়ই গোপন পথে ঢুকেছিল আততায়ী। হয়তো তার হাতে ছিল বন্দুক, ভয় দেখিয়েছিল ফ্রিৎজকে। সেই মুহূর্তে গোপনে ইচ্ছে করেই হয়তো ঘড়ি উল্টোদিকে চালিয়ে দিয়েছিল ফ্রিৎজ। হয়তো বারোটা ঘড়িতে দম দিতে খুনিটাই তাকে বাধ্য করিছিল। যাতে পুলিশ নিশ্চিতভাবে ধরে নেয় খুনের সময় রাত বারোটাই। এর আগেও নয়, পরেও নয়। ফ্রিৎজ হয়তো লোকটাকে চিনত। বুঝতে পেরেছিল ভয়ঙ্কর বিপদ ঘনিয়ে আসছে। আর এটা বুঝেই সে বারোটা ঘড়িতে দম দেবার সময় ইচ্ছে করেই কয়েকটাতে ভুল সময় করে রেখেছে। উদ্দেশ্য একটাই, কোনও বিশেষ একজনের জন্যে সে খবর রেখে গেছে ভুল ঘড়িগুলোর মধ্যে। এরপরই হয়তো খুনিটা তার মাথায় আঘাত করে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। তারপর সব টাকা-পয়সা নিয়ে পেছন দরজা দিয়ে পালিয়েছে।

এটা নিশ্চিত, রাত বারোটার একটা অ্যালিবাই তৈরির প্রাণপণ চেষ্টা করেছে খুনিটা। যদি তাই হয়, তা হলে কখন মারা গেছে ফ্রিৎজ?

এই ফাঁকে আমি একটা কথা বলি, পিটারের ধারণা যদি ঠিকই হয় (ঠিক হবার সম্ভাবনা বেশি। কারণ তার ধারণা খুবই যুক্তিসঙ্গত) তা হলে পেছনে এগোনো ঘড়িটা পেছোতে শুরু করেছে ওই দুর্ঘটনা ঘটার খানিকক্ষণ আগে থেকেই। কিন্তু অমন এক উদ্ভট ঘড়ির সময় দেখে কি কিছু বলা যায়? কোন সময় থেকে পেছোচ্ছে ঘড়িটা তা কীভাবে বলা সম্ভব?

অনেক ভাবনা চিন্তার পর পিটার পুরোপুরি নিশ্চিত হলেন, নিজের অ্যালিবাই জোরদার করার জন্যে খুনি কতগুলো মিথ্যে সূত্র রেখে গেছে। ধোঁকা দেবার জন্যেই যে খুনিটা এসব করেছে তা

ম্যাগরুকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন তিনি। কিন্তু তার কথায় পাত্তা না দিয়ে বললেন ম্যাগরু, 'খুনিকে তো প্রায় ধরেই ফেলেছি, ব্যাপারটা আগাগোড়া কীভাবে সাজিয়েছি শোন।'

'ম্যাগরু, আমি যা বলছি...'

'থাম্ তো! অহেতুক ঘ্যানর ঘ্যানর কোরো না। জান, তুমিই আমাদের সন্দেহের তালিকার প্রথম ব্যক্তি?'

'আমি!' অবাক কণ্ঠে বললেন পিটার।

'হ্যাঁ, তুমি। তবে সমস্যা হলো, তুমি গাধা যে কাউকে খুন করার যোগ্যতা রাখ, এ আমার বিশ্বাস হয় না। তাই আরেকটু খোঁজ-খবর করতে হচ্ছে। আমি নিঃসন্দেহ, খুনি ফ্রিৎজের পূর্বপরিচিত। তার সব খবরই রাখত সে। প্রায়ই দোকানে আসত। সুযোগমত সে দোকানের সামনের দরজার তালার চাবির ছাপ তুলে নিয়েছিল মোম অথবা ওই জাতীয় কোনও কিছুতে। তারপর নকল চাবি বানিয়ে নিয়ে ঢুকেছিল। মনে হয় খুনি এই এলাকারই।'

'এটা ঠিকই বলেছ। আমারও...'

'কথা বোলো না তো, চুপচাপ শুনে যাও,' ধমকে উঠল ম্যাগরু। 'ফ্রিৎজ মারা গেছে মাঝরাতে। রাত বারোটার কিছু পরে। ওই সময় সে ঘড়িতে দম দিচ্ছিল।'

'ম্যাগরু, আমি বলছিলাম কি...'

'আহ্, ভারি যন্ত্রণা করছ তো। সেই ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করেই চলেছ। কাল মাঝরাতেই খুন হয়েছে ফ্রিৎজ। আজ সকালে দোকান খুলতে না দেখে মিস মারফি ভেবেছিলেন, ফ্রিৎজ অসুস্থ। সন্ধ্যার পর তিনি ফ্রিৎজের খাবার নিয়ে এসে দেখেন তখনও দোকান বন্ধ। কলিংবেল বাজিয়ে, দরজা ধাক্কিয়েও কোনও সাড়া না পেয়ে তিনি আমাদের ফোন করেন। দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে দেখি মরে পড়ে আছে ফ্রিৎজ।

'ইতিমধ্যে আমি একটা তালিকা তৈরি করে ফেলেছি। যাদের সঙ্গে ফ্রিৎজের খাতির ছিল, দোকানে ঘনঘন আসত, আর আর্থিক দিক থেকে যারা কিছুটা অসচ্ছল ছিল। এই যে দেখ,' বলে ম্যাগরু পিটারের দিকে একটুকরো কাগজ এগিয়ে দিলেন। পরপর কয়েকজনের নাম। পাশে পেশাও দেয়া আছে।

জ্যাক হ্যারিসন–চিত্রকর

টমাস ফেনট্রিস–স্বর্ণকার

বিল লডেন–মুদি দোকানদার

জোসেফ ফিঞ্চলে–নাপিত

বব রজার্স–চাবিওয়ালা।

'আমার ধারণা,' একগাল ধোঁয়া ছেড়ে বললেন ম্যাগরু। 'লডেন এবং রজার্স এই দুজনের একজন খুনি। গতমাসে রজার্স দোকানের পুরানো তালা বদলে নতুন তালা লাগিয়ে দিয়েছিল। তারপক্ষে নতুন তালার নতুন চাবি রাখা খুবই সম্ভব। অন্যদিকে লডেন প্রায় প্রতিদিনই ফ্রিৎজের দোকানে চাল-ডাল ও অন্যান্য জিনিসপত্র নিয়ে আসত। তার পক্ষেও একাজ করা অসম্ভব নয়। বাকি তিনজনও দোকানে মাঝেমাঝেই আসত, তাই এদেরকেও সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দেয়া যায় না। মোটামুটিভাবে এই পাঁচজনের একজনই খুনি।'

'অথচ দুঃখের ব্যাপার কি জান, এই পাঁচজন ছিল ফ্রিৎজের ঘনিষ্ঠ বন্ধু,' পিটার বললেন।

'রাখ তোমার বন্ধুত্ব! টাকার গন্ধ পেলে বন্ধু শত্রু হতে কতক্ষণ? এদের পাঁচজনেরই আর্থিক অবস্থা অসচ্ছল। এদেরকে আমি আলাদা আলাদাভাবে জেরা করব। গতকাল রাত বারোটার অ্যালিবাই দেখব যার নেই, সেই খুনি। তাকেই ধরব চেপে...'

'কিন্তু ম্যাগরু, একটা বিষয় লক্ষ কর! খুনি...'

'তোমার কোনও উপদেশ আমি শুনতে চাই না। তুমি তোমার

ওই ধাঁধা নিয়েই থাক। খুনোখুনির ব্যাপারে নাক গলাতে এসো না। যাও, এখন সোজা তোমার বাড়ির পথ ধর।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও টুপি আর ছড়িটি নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন পিটার। ধীর পায়ে বেরিয়ে এলেন দোকান থেকে। মনে চলছে চিন্তার ঝড়। কিন্তু কোনই সমাধান খুঁজে পাচ্ছেন না। ম্যাগরু তাঁর কথাগুলো শুনলে ভাল হত। খুনটা যে মাঝরাতে ঘটেনি বরং পুলিশকে ধোঁকা দেবার চেষ্টা হয়েছে, তা ওই ম্যাগরুই বের করুক। ভুল ঘড়িগুলোর একটা অর্থ আছে, তা পিটার বুঝতে পারছেন। কিন্তু সে অর্থ কী তা তো জানেন না। ফ্রিৎজ ছাড়া কেউই জানে না। তা হলে ম্যাগরুকে তিনি কি-ই বা বলতেন!

বাসায় পৌঁছেই ঘড়িগুলোর ছবি নিয়ে বসলেন পিটার। প্রচুর মাথা খাটালেন এর পেছনে, কিন্তু কোনোই লাভ হলো না। শেষে বিরক্ত হয়ে শুয়ে পড়লেন। টেনশনে ভাল ঘুম হলো না। ধাঁধা মেলাবার ব্যাপারে তাঁর জুড়ি নেই অথচ এই ধাঁধার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছেন না। এই ধাঁধা রহস্যের সমাধান পেলে বন্ধুর খুনিকে ধরা যাবে। কোনও সমাধানে পৌঁছুতে না পেরে অস্থির হয়ে উঠলেন পিটার।

রহস্য সন্ধানীরা এতক্ষণে নিশ্চয়ই কোনও সূত্র-টুত্র খুঁজে পেয়েছেন। পেয়েছেন কিনা তা-ও তো জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না। সূত্র এর মধ্যেই রয়েছে। এড়িয়ে গেলে সমাধান খুঁজে পাবেন না। যেমন পিটার পারকিন্স এড়িয়ে গেছেন, তাই তিনি রহস্যের কোনও কূল কিনারা করতে পারছেন না।

পরদিন পত্রিকা অফিসে নিজের ছোট্ট রুমটিতে উদাসভাবে আছে পিটার। পাঠকের পাঠানো গাদাগাদা চিঠিপত্র, ধাঁধা আর শব্দজব্দ পড়ে আছে টেবিলে। কিন্তু ওগুলো ছুঁয়ে দেখারও ইচ্ছে হলো না তাঁর। অবশেষে মানসিক অস্থিরতা সহ্য করতে না পেরে ফোন করলেন ম্যাগরুকে।

'ম্যাগরু, তোমার সন্দেহভাজন সেই পাঁচজনকে কি জিজ্ঞাসাবাদ করেছ?' জিজ্ঞেস করলেন পিটার।

হ্যাঁ, করেছি,' বললেন ম্যাগরু।

'কিছু জানতে পেরেছ?'

'না, পারিনি। প্রত্যেকেরই রাত বারোটার পাকাপোক্ত অ্যালিবাই আছে। ওই দিন রাত দশটা থেকেই যে যার কাজে ব্যস্ত ছিল।'

'ম্যাগরু, মানে ব্যাপারটা হলো, আমি ভাবছিলাম কি...'

'যা ভাবছিলে তা তোমার মনেই থাক। আমি এখন ব্যস্ত। রাখছি,' বলেই ঠকাস করে রিসিভার রেখে দিলেন ম্যাগরু।

ম্যাগরুর ব্যবহারে মনে কষ্ট পেলেন পিটার। এই মুহূর্তে মনের কথাটা কাউকে খুলে বলতে পারলে শান্তি পেতেন তিনি। এমন কেউ নেই যে ফ্রিৎজের মত ধাঁধা ভালবাসে। ফ্রিৎজের খুনিকে ধরতে না পারলে নিজের কাছেই অপরাধী হয়ে থাকবেন পিটার। কিন্তু কী করার আছে তাঁর? এসব সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্কভাবে একটি খাম তুলে নিয়ে ছিঁড়ে ফেললেন। সুন্দর এক টুকরো কাগজে পরিচ্ছন্ন হাতের লেখা দেখে পড়লেন তিনি। ভারি সুন্দর বুদ্ধিদীপ্ত একটা শব্দজব্দ। কাগজের একেবারে নীচে লেখা প্রেরকের নামটিও দেখলেন।

প্রেরক: ড্যানিয়েল ম্যাগরু, জুনিয়র।

'ড্যানিয়েল ম্যাগরু জুনিয়র,' ভ্রূ কুঁচকে বিড়বিড় করে বললেন পিটার। ডিটেকটিভ সার্জেন্ট ম্যাগরুর পুরো নাম ড্যানিয়েল ম্যাগরু। তা হলে পত্র প্রেরক ম্যাগরুর ছেলে। ম্যাগরুর ছেলে ধাঁধা প্রেমিক, চমৎকার!

পত্রপ্রেরকের ঠিকানাটা লিখে নিয়ে ছড়ি আর টুপি হাতে বেরিয়ে পড়লেন পিটার। ট্যাক্সিতে উঠে ঠিকানা বলে উত্তেজিত মনে অপেক্ষা করতে লাগলেন। দশ মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে

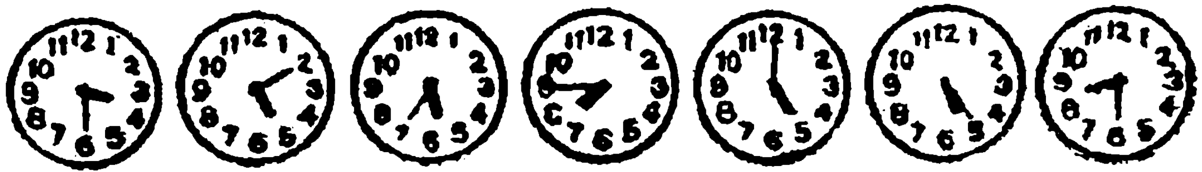
গেলেন ম্যাগরুর বাড়িতে। স্বাস্থ্যবান লম্বা আকর্ষণীয় এক কিশোর বাড়ির সামনে বাগানের গাছের পাতা ছাঁটছিল। তার কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন পিটার, 'তুমি ড্যানিয়েল ম্যাগরু জুনিয়র?'

'হ্যাঁ, মি. পারকিন্স, পত্রিকায় বহুবার আপনার ছবি দেখেছি। আমি যে শব্দজব্দ পাঠিয়েছি, দেখেছেন?'

'হ্যাঁ। আগামী সংখ্যায় ওটা যাচ্ছে। আমি কিন্তু তোমার কাছে এসেছি অত্যন্ত জরুরি একটা কাজে।'

বাগানের বেঞ্চিতেই পিটারকে নিয়ে বসল ড্যানিয়েল। ফ্রিৎজের মৃত্যু, ঘড়ি রহস্য সবই ড্যানিয়েলকে খুলে বললেন পিটার।

'বুঝলে ড্যানিয়েল, আমি নিশ্চিত ফ্রিৎজ ঘড়িগুলো উল্টোপাল্টা করে দিয়ে কোনও সংবাদ রেখে গেছে। তুমি দেখলেই বুঝতে পারবে।' বলে পকেট থেকে ভুল ঘড়ির নকশাটা বের করে দেখালেন ড্যানিয়েলকে।



ভুল সময়

'মনে হয় সাঙ্কেতিক কোনও সূত্র লুকিয়ে আছে এর মধ্যে। এক ধরনের ধাঁধাই বলতে পার এটাকে। এসব ব্যাপারে ফ্রিৎজ ওস্তাদ ছিল, এই কাজ করার সময় হয়তো ভেবেছিল, আমিই এর মর্মোদ্ধার করতে পারব। অথচ দেখ, দু'দিন ধরে শুধু ভেবেই সারা হচ্ছি। সমাধান আর পাচ্ছি না। তোমার লেখাটা পড়ে বেশ বুদ্ধিমান মনে হলো তোমাকে। দেখ তো তুমি কিছু বের করতে পার কি না।'

ছবিগুলো দেখে চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল ড্যানিয়েল। বলল, 'আমারও বিশ্বাস এতে কোনও রহস্য আছে। দেখি চেষ্টা

করে,’ বলে অনেকক্ষণ ধরে সে নকশাটা গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখল। তারপর মুখ তুলে বলল, ‘মি. পারকিন্স, এগুলো দেখে মনে হচ্ছে, সৈন্যরা ফ্লাগ নেড়ে যেভাবে সাঙ্কেতিক খবর পাঠায়, এটাও তেমনি। আমার ধারণা অবশ্য ভুলও হতে পারে।’

‘সৈন্যবাহিনী! ফ্ল্যাগ! না, না, ভুল নয়। ফ্রিৎজ একসময় সুইস আর্মির সিগন্যাল দলে ছিল।’ উত্তেজনায় কাঁপতে লাগলেন পিটার। ‘ফ্ল্যাগের সিগন্যাল তার জানা ছিল নিশ্চয়ই। তোমার ধারণাই ঠিক। তুমি কি সিগন্যালের অর্থ করতে জানো?’

‘জানি। স্কাউটে ছিলাম একসময়। কিন্তু আপনি আমার কথায় এত গুরুত্ব দিচ্ছেন কেন? না-ও তো হতে পারে। ঘড়ির কাঁটাগুলো যেভাবে আছে তাতে অবশ্য কোনও অর্থপূর্ণ শব্দ আসে না। কয়েকটার শুধু আলাদা আলাদা অক্ষর হয়। অন্যগুলোর তা-ও হয় না। সব মিলিয়ে অর্থহীনই বলতে পারেন।’

‘হ্যাঁ, অর্থহীন যে তা আমি জানি,’ অসহিষ্ণুকণ্ঠে বললেন পিটার। ‘ঘড়িগুলোর সময় বলার কোনও ব্যাপার নেই। শুধু কাঁটাগুলো আগুপিছু করে দেয়া হয়েছে। প্রথমে আমাদের জানতে হবে ঘটনার সময় কাঁটাগুলো ঠিক কোন্ অবস্থানে ছিল।’

‘তা কী করে সম্ভব! মি. ফ্রিৎজ হয়তো ভেবে-চিন্তেই এসব করে গেছেন। কিন্তু তাঁর মনের রহস্য আমরা জানব কীভাবে?’

‘কঠিন কোনও ব্যাপার নয়।’ উত্তেজনায় চকচক করছে পিটারের চোখ। বললেন, ‘ওগুলোর অর্থ ধরার জন্যই তো বৈদ্যুতিক ঘড়িটা পেছন দিকে চালিয়ে দিয়েছে। আচ্ছা বল, সাধারণ একটা ঘড়ি দেখে কী বুঝি আমরা?’

‘ঘড়ি একই সময় দিনে দুবার করে চলে।’

‘ঠিক বলেছ। এবার বল তো, যে ঘড়িটা ক্রমাগত উল্টোদিকে এগোচ্ছে অর্থাৎ ঘড়িটায় বারোটার পর একটা না হয়ে একটার পর বারোটা হচ্ছে, সেটা দেখে আমরা কী বুঝব? খেয়াল রেখ, উল্টো

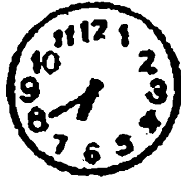
চললেও ঘড়িটা চলছে ঠিকই আর সব ঘড়ির মতই। পার্থক্য শুধু সোজা না চলে চলছে উল্টোদিকে।'

'নাহ্, এটা বলতে পারব না। ঘড়ি কি পেছনে এগোয় কখনও?' অবাক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল ড্যানিয়েল।

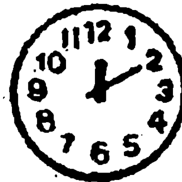
'এ ঘড়িটা তো এগোচ্ছে। পুরানো মডেলের এক রকম বৈদ্যুতিক মোটরওয়ালা ঘড়ি আছে যার কাঁটা উল্টো সোজা দুই দিকেই সমানভাবে চলতে পারে। এটা দেখলেই বুঝতে পারবে।' নিজ হাতে এঁকে আনা বৈদ্যুতিক ঘড়ির নকশাটা ড্যানিয়েলকে দেখালেন পিটার।'

'তা হলে ঠিক সময় হচ্ছে ছয়টা চল্লিশ,' ঘড়িটার দিকে এক নজর তাকিয়েই বলল ড্যানিয়েল। 'কিন্তু পিছনে ঘোরা ঘড়িটাতে তো দেখছি বারোটা বেজে দশ।'

'যদি ধরে নিই পিছনে-ঘোরা ঘড়িটা পেছোতে শুরু করেছে ঠিক সময়ে? ড্যানিয়েল, তুমি ছবিটা আবার দেখ।'



ঠিক সময়



পেছনের সময়

'তা হলে, প্রত্যেক এক মিনিটে ঠিক সময়ের ঘড়িটার সঙ্গে পিছনে চলা ঘড়িটার তফাত হয়েছে দু'মিনিট। ঠিক না?'

'হ্যাঁ, তাই তো মনে হচ্ছে। দুটো ঘড়িই কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টায় দু'বার একই সময় দেবে।'

পিছু চলা ঘড়িটাকে পেছনে আরও খানিকটা এগিয়ে দিয়ে দেখা যাক কী হয়। এমনিভাবে দুটো ঘড়িতে একই সময় করি। সেটাই হবে তা হলে পিছু চলা ঘড়িটা যখন থেকে পেছোতে শুরু করেছে, সেই সময়। আরেকটু সহজ করে বললে, ফ্রিৎজ যে সময় খুন হয়েছিল, মোটামুটিভাবে এটা হবে সেই সময়। হায় হায়,

সাংঘাতিক একটা ভুল হয়ে গেছে তো!'

'ভুল হয়েছে, কোথায়?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল ড্যানিয়েল।

'হয়েছে, মারাত্মক একটা ভুল হয়েছে। একটা ঘড়ি এগোচ্ছে। আরেকটা পেছোচ্ছে, তা হলে দুটো ঘড়িতে একই সময় হবে ছয় ঘণ্টা পরপর। তারমানে দিনে অর্থাৎ চব্বিশ ঘণ্টায় চারবার একই সময় দেবে উভয় ঘড়ি। এই চারবারের মধ্যে দু'বার হলো ঘড়ি যখন চলতে শুরু করেছিল সেই সময়। আর বাকি দু'বার অন্য সময়।

'ওরে বাবা! কোন্‌টা কী তা বুঝতেই তো দেখছি সারাজীবন কেটে যাবে!'

ড্যানিয়েলের কথার জবাব না দিয়ে গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন পিটার। কপালে ফুটে উঠল গভীর চিন্তার রেখা। ধীরে ধীরে অদৃশ্য হলো সে রেখা। উজ্জ্বল হয়ে উঠল তাঁর চোখ-মুখ। মৃদুস্বরে বললেন, 'সব ক্লিয়ার হয়ে গেছে। রাত দশটার পর থেকে সন্দেহের তালিকাভুক্ত লোকগুলোর একেবারে পাকাপোক্ত অ্যালিবাই! তারমানে বুঝতে পারছ? সন্ধে ছ'টা থেকে রাত দশটার মধ্যেই ঘটেছে এই হত্যাকাণ্ড।'

'হ্যাঁ, পারছি, কিছু কিছু।'

'এবার বের করতে হবে, ছয়টা থেকে দশটার মধ্যে কখন দুটো ঘড়ি একই সময় দিয়েছে। রাত দশটা থেকে ভোর চারটা। হ্যাঁ, এইতো বেরিয়ে গেছে, ঠিক ছয় ঘণ্টা পর।'

'হ্যাঁ, এবার বুঝেছি পুরোপুরিই।' মাথা ঝাঁকিয়ে বলল ড্যানিয়েল। 'যদিও খুবই কঠিন। তবে বুদ্ধিমান কেউ একটু মাথা খাটালেই পুরো ব্যাপারটা পরিষ্কার বুঝতে পারবে। দুটো ঘড়ি কাছে থাকলে আরও ক্লিয়ার হত। কাঁটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়েই দেখা যেত। আমাদের দু'জনের হাতঘড়ি দুটো দিয়েও তো এটা করে

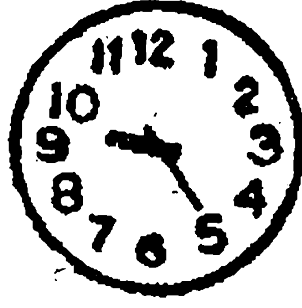
দেখা যায়। একটাকে ছয়টা চল্লিশ আরেকটাকে বারোটা দশ করে কাঁটা ঘুরিয়ে একটাকে এগোই আরেকটাকে পিছিয়ে দিই। এভাবে পিছাতে পিছাতে...'

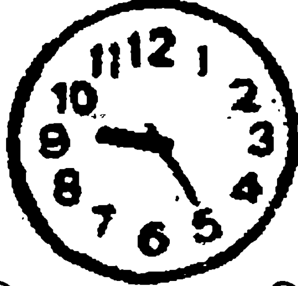
'অত ঝামেলার দরকার কী? মুখে হিসেব করেই তো তোমার ওই ঘড়ি ঘোরানোর চেয়ে দ্রুত বের করে ফেলা যায়। মনোযোগ দিয়ে শোন, বারোটা দশ থেকে পিছাচ্ছে বৈদ্যুতিক ঘড়ি আর ছয়টা চল্লিশ থেকে এগোচ্ছে ঠিক ঘড়ি। তা হলে দুটোর মধ্যে সময়ের ফারাক কত? পাঁচ ঘণ্টা তিরিশ মিনিট। এটাকে মিনিট করলে তিনশো তিরিশ মিনিট হয়। একটা অন্যটার বিপরীতে ঘুরছে, তারমানে একটার দুই মিনিট সমান অন্যটার এক মিনিট। তা হলে দুই দিয়ে তিনশো তিরিশকে ভাগ দিলে হচ্ছে–একশো পঁয়ষট্টি মিনিট। অর্থাৎ দুই ঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট। এবার ছয়টা চল্লিশের সঙ্গে দুই ঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট যোগ করলে হচ্ছে নয়টা পঁচিশ। আবার বারোটা দশ থেকে দুই ঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট বাদ দিলে ওই নয়টা পঁচিশই হয়। এই তো হয়ে গেল সমাধান। ঘটনার সময় দুটো ঘড়ি একই সময় দিচ্ছিল। আমাদের হিসেবেও কিন্তু খুনের সময় ছিল ছয়টা থেকে দশটার মধ্যে। এবার ক্লিয়ার হয়েছে?'

'হ্যাঁ, পুরোই। তা হলে মি. স্যাণ্ডোজ খুনের রাতে বৈদ্যুতিক ঘড়িটা নয়টা পঁচিশেই উল্টোদিকে চালিয়ে দিয়েছিলেন!' উত্তেজিত-ভাবে বলল ড্যানিয়েল।

'হ্যাঁ, তাই। এবার সংক্ষেপে বলি,' বলে পিটার তার নোট বুকে আরও দুটো ঘড়ির ছবি আঁকলেন।

এই সময় আততায়ী দোকানে ঢুকেছিল





এই সময় থেকে পিছাতে শুরু করেছিল বৈদ্যুতিক ঘড়িটা

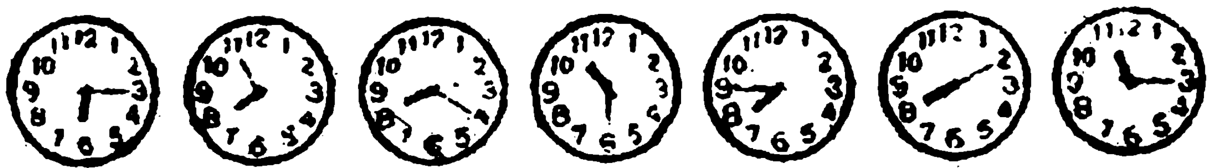
'এটা দেখেই বলে দেয়া যায়, কখন কাঁটা ঘুরিয়ে ভুল সময় করে দিয়েছিল ফ্রিৎজ। নয়টা পঁচিশের সঙ্গে আরও পাঁচ মিনিট যোগ করলে হয় সাড়ে নয়টা। তারমানে ওই সময়ই সে আততায়ীর নির্দেশে ঘড়িতে দম দিতে বাধ্য হলে বুদ্ধি করে ঘড়িগুলোতে ভুল সময় করে দিয়েছিলেন।

'আপনি ঘড়িগুলো দেখেছিলেন ছয়টা পঁয়তাল্লিশে। তখুনি যদি ছবি এঁকে নিয়ে থাকেন তা হলে সাড়ে নয়টা থেকে ছয়টা পঁয়তাল্লিশ বাদ দিলে হয় দুই ঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট। ঘড়িগুলোর সময়ের সঙ্গে এই দুই ঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট যোগ দিলেই পাওয়া যাবে সেই সময়, সাতটা ঘড়িতে যে সময় নির্দেশ করে ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে অদ্ভুত কোনও খবর জানিয়ে দিয়ে গিয়েছেন।'

'চমৎকার!' উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন পিটার। 'এক মিনিট, আমি এঁকে দেখাচ্ছি সব।'

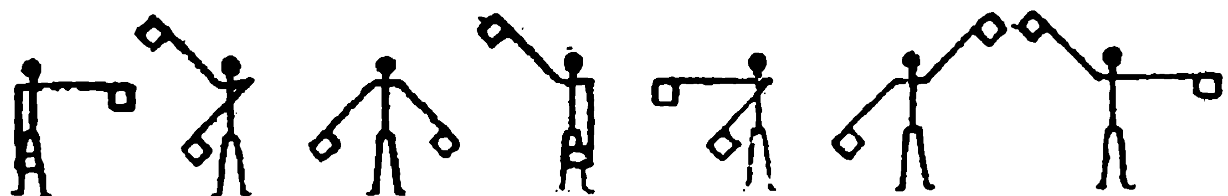
অবশ্যই এক মিনিটে আঁকা হলো না। বেশ কিছু সময় ধরে

তিনি আঁকলেন সাতটা ঘড়ি।



কাঁটা ঘুরিয়ে ভুল সময় করে রাখা সাতটা ঘড়ি

ঘড়িগুলোর নীচে কাঁটার অবস্থান অনুযায়ী আঁকলেন মানুষের স্কেচ। প্রত্যেকের দুই হাতে জুড়ে দিলেন দুটি করে পতাকা।



পিটারের হাত থেকে নোটবুক আর পেন্সিল নিয়ে প্রত্যেকটা নকশার নীচে চটপট করে একেকটা অক্ষর বসিয়ে দিল ড্যানিয়েল। অক্ষরগুলোর দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলেন পিটার, ভাঙাস্বরে বললেন, 'অক্ষরগুলো মিলিয়ে যার নাম হচ্ছে সে তোমার বাবার সন্দেহের তালিকায় আছে। ধন্যবাদ, ড্যানি, রহস্যের আসল সমাধানটা তুমিই করলে। এখন আরেকটি কাজ তোমাকে করতে হবে। তা হলো, তোমার বাবাকে বুঝিয়ে বলতে হবে, কেন এবং কীভাবে আমরা রহস্য উদঘাটন করেছি। খুনিটাকে ধরতে হলে, আমাদের কৌশলের আশ্রয় নিতে হবে। আমরা কীভাবে সমাধান করেছি তা তো আর আদালতকে বোঝাতে পারব না। ঘড়ির ব্যাপারটা বললে দুনিয়ার ফ্যাঁকড়া বাধবে। সুতরাং একটু অন্যায়ের আশ্রয় আমাদের নিতেই হচ্ছে।'

শেষ হলে ড্যানিয়েলকে বললেন, 'হ্যাঁ, এবার বল এই নির্দেশগুলোর অর্থ কী?'

এদিকে আপনাদের অবস্থা কী? খুব ধকল গেল, তাই না। সত্যিই দুঃখিত আমি, এটা ঠিক, রহস্যটা বড়ই জটিল। আমিও অবশ্য একটু ইচ্ছাকৃত কষ্ট আপনাদের দিচ্ছি, খুনির নামটা বলিনি

এখনও। বললেই সব ল্যাঠা চুকে যাবে। পরবর্তী ঘটনা জানার আগ্রহ থিতিয়ে যাবে। তাই বুঝতেই পারছেন...।

আরেকটা কথা, ঘড়ির ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন? আমি কিন্তু ভালমতই বুঝেছি। সেনাবাহিনীর সিগন্যালের সাঙ্কেতিক ভাষা নিশ্চয়ই আপনারা সবাই জানেন না। না জানলে লজ্জিত কিংবা দুঃখিত হবার কারণ নেই। এখান থেকেই শিখে নেবেন। আরও একটা সূত্র আছে, যা পিটার নিজেই এড়িয়ে গেছেন। খুনি ধরতে হলে বিশেষ জ্ঞান বা প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই। শুধু দৃষ্টি শক্তির প্রখরতা আর একটু বুদ্ধিমান হতে হয়। এক কাজ করুন, ফেলে আসা পৃষ্ঠা আবার একটু উল্টেপাল্টে দেখুন না, সূত্রটা চোখে পড়তেও পারে। অবশ্য অত ঝামেলায় না যেতে চাইলে সুবোধ বালকের মত পরেরটুকু পড়ে যান। সব জানতে পারবেন।

উপসংহার

ওই দিন সন্ধ্যায় ফ্রিৎজের দোকানের পেছনদিকের বড় ঘরটায় একত্রে মিলিত হয়েছেন সার্জেন্ট ম্যাগরু, তাঁর ছেলে ড্যানিয়েল, পিটার পারকিন্স, সন্দেহের তালিকাভুক্ত পাঁচজন (জ্যাক হারিসন, বিল লডেন, জোসেফ ফিঞ্চলে, বব রজার্স এবং টমাস ফেণ্ট্রিস) এবং ছয়জন সাদা পোশাক পরিহিত পুলিশ। মিলিত হবার কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে, ফ্রিৎজের আকস্মিক মৃত্যুতে বন্ধুবান্ধব মিলে শোক সভা ও তার আত্মার শান্তি কামনা করা।

ছদ্মবেশ নিয়েছেন পিটার। গায়ে ঝোলানো আলখাল্লা, মাথায় বিশাল পাগড়ি, গালভর্তি চাপ দাড়ি, সব মিলিয়ে এক অদ্ভুত চেহারা দাঁড়িয়েছে তাঁর।

পুরো পরিকল্পনাটাই পিটারের। ড্যানিয়েল তার বাবাকে সব বোঝাতে সক্ষম হয়েছে। পিটার বুঝিয়েছেন, নাম জানা সত্ত্বেও কেন খুনিকে গ্রেফতার করা সম্ভব নয়। তার পরিকল্পনা কার্যকরী হলে খুনি নিজেই স্বীকার করবে তার অপরাধ। যা হোক, অনেক

চেষ্টা ও বোঝানোর পরই তবে ম্যাগরু এসবে রাজি হয়েছেন।

টেবিলের সামনে ছোট্ট একটা টুলে বসে আছেন ছদ্মবেশি পিটার। সন্দেহভাজন পাঁচজন বসেছে অর্ধবৃত্তাকারে তার মুখোমুখি চেয়ারে। পুলিশেরা দাঁড়িয়েছে দরজার কাছাকাছি।

শোক প্রকাশের পালা শেষ হলে ম্যাগরু কেশে নিয়ে বললেন, 'উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ, আজ আমরা এখানে সমবেত হয়েছি বন্ধু ফ্রিৎজের মর্মান্তিক মৃত্যুতে শোকপালনের উদ্দেশ্যে। তাঁর মৃত্যু-রহস্য সমাধানেও নিশ্চয়ই আপনাদের আগ্রহ কম নয়। আপনারা সকলেই ছিলেন তাঁর বন্ধু-সুহৃদ। বিশিষ্ট একজন ব্যক্তিত্বও এখানে উপস্থিত আছেন। আসুন পরিচয় করিয়ে দিই,' বলে পিটারকে দেখিয়ে বললেন, 'ইনি প্রিন্স আলী, একজন পিশাচসিদ্ধ পুরুষ। গত রাতে উনি ফ্রিৎজের প্রেতাত্মার কাছ থেকে এক নির্দেশ পেয়েছেন। প্রেতাত্মা বলেছে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে ঘড়িতে দম দেবার সময় ফ্রিৎজ নাকি কাঁটাগুলো ঘুরিয়ে খুনির নামের ইঙ্গিত রেখে গেছেন। প্রিন্সের কাছ থেকে এ সংবাদ শোনা মাত্র আমরা এখানে পৌঁছে দেখি, সব ঘড়িগুলো ততক্ষণে বন্ধ হয়ে গেছে।'

আসলেই তখন ঘড়িগুলো সব বন্ধ ছিল। ফ্রিৎজের দেয়া দম ফুরিয়ে গেলে আর নতুন করে দম দেয়া হয়নি।

'এখন এই মুহূর্তে,' বলেই চললেন ম্যাগরু, 'প্রিন্স ফ্রিৎজের প্রেতাত্মার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। আপনারা কি তাঁর কাছ থেকে জানতে চান খুনি কে?'

পাঁচজনই একটু নড়েচড়ে বসল। কিন্তু কোনও কথা বলল না। পিটার জানেন, খুনি দম দিতে দেখেছিল ফ্রিৎজকে, এখন সে নিশ্চয়ই ভয়ে ঘামতে শুরু করেছে।

'এবার তা হলে শুরু করা যাক,' বললেন ম্যাগরু, 'এখনই নিভিয়ে দেয়া হবে ঘরের লাইট। তারপর প্রিন্স যা করার তাই করবেন।'

এতক্ষণ ধ্যানী যোগীর মত চোখ বুজে শান্ত সমাহিত ভঙ্গিতে বসেছিলেন পিটার। দপ করে নিবে গেল ঘরের আলোটা। ঘন কালো অন্ধকারে ডুবে গেল সব। গভীর নিস্তব্ধতা নেমে এল। শুধুই শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে। কেমন একটা থমথমে ভৌতিক পরিবেশ।

'স্যাণ্ডোজ...ফ্রিৎজ স্যাণ্ডোজ,' হঠাৎ নীরবতা ভেঙে গমগম করে উঠল পিটারের কণ্ঠ। 'আপনি কি এখানে উপস্থিত আছেন?'

কোনও জবাব এল না। দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দে আরও ভারি হয়ে উঠল আবহাওয়া। কে যেন কাঁপা গলায় খকখক করে কাশল।

আবার শোনা গেল পিটারের কণ্ঠ, 'ফ্রিৎজ স্যাণ্ডোজ জীবিতকালে আপনার কণ্ঠ ছিল রুদ্ধ। মরণের পরেও যদি বাকশক্তি ফিরে না পেয়ে থাকেন, তা হলে আমরা দুঃখিত, এখন দয়া করে যে-কোনও উপায়ে আপনার উপস্থিতির প্রমাণ দিন।'

খুব ধীরে ধীরে শূন্যে ভেসে উঠল একটুখানি মৃদু নীল আলো। কোনও অদৃশ্য হাত যেন সেই আলোর ওপর লিখে চলল, 'আমি এসেছি।'

ভয়ে কার যেন দাঁতে দাঁতে বাড়ি খেল। ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল শব্দ দুটি।

'আপনার খুনি কি এখানে আছে?' প্রশ্ন করলেন পিটার। আবার সেই একইভাবে লেখা হলো, 'হ্যাঁ, আছে।'

এবার কার গলা দিয়ে ঘড়ঘড় শব্দ বেরুল

'আপনি কি রাত বারোটায় খুন হয়েছিলেন?'

'না।'

'আপনি কি রাত সাড়ে নয়টায় খুন হয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

খুনি আপনাকে ঘড়িতে দম দিতে বাধ্য করাতেই কি আপনি কাঁটাগুলো ঘুরিয়ে খুনির নাম জানিয়ে গিয়েছেন?'

'হ্যাঁ।'

কোনও একজনের শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ দ্রুততর হলো, তা স্পষ্ট শোনা গেল।

'ঘড়িগুলো এখন বন্ধ হয়ে আছে। আপনি দয়া করে অন্য কোনও ভাবে খুনির নামটা জানান।'

খুব আস্তে চেয়ার টানার শব্দ হলো। বোঝাই গেল, কেউ একজন দৌড় দেবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছে।

কয়েক সেকেণ্ডের বিরতি। তারপর বিশাল দেয়াল ঘড়ির কাঁচের ওপর ভেসে উঠল একের পর এক সাতটা মৃদু নীল আলোর অক্ষর।

F-I-N-C-H-L-E

একই সঙ্গে ফিসফিসিয়ে উঠল কয়েকটি কণ্ঠস্বর 'ফিঞ্চলে!'

'না, না!' চিৎকার করে উঠল কেউ। 'আমি খুন করিনি। আমি করিনি।'

ছুটে পালানোর শব্দের সাথে সাথে হুটোপুটির শব্দ শোনা গেল। 'এই, আলো, আলো জ্বালো!' চেঁচিয়ে উঠলেন ম্যাগরু।

দপ করে জ্বলে উঠল ঘরের সব কয়টি আলো। দেখা গেল একজন জাপটে ধরে রয়েছে ফিঞ্চলেকে। নিজেকে মুক্ত করার জন্য হাত-পা ছুঁড়ছে সে।

চিৎকার করে বলল সে, 'ফ্রিৎজ বলে দিত। সব বলে দিত। আমি গোপনে রেসের বুকির কাজ করতাম। লোকের কাছ থেকে ছোটখাট বাজি নিয়ে রেস খেলতাম। ওর কাছে একদিন ধরা পড়ে গিয়েছিলাম। খুন না করলে ও পুলিশকে বলে দিত। নির্ঘাত বলে দিত।'

ম্যাগরুর নির্দেশে ফিঞ্চলেকে থানায় নিয়ে যাওয়া হলো। হাসি মুখে ম্যাগরু বললেন, 'যাক, প্রেতাত্মার পর্বটা তা হলে সার্থক হলো।' তারপর ছেলের পিঠ চাপড়ে গর্বভরে বললেন, 'পিটার, দেখে নিয়ো, আমার ছেলেটা বড় হলে বাঘা গোয়েন্দা হবে। আর

তোমাকেও বাহবা না দিয়ে পারছি না, ওই আলো এবং লেখার ব্যাপারটা তুমি কোত্থেকে আবিষ্কার করলে?'

'আর বোলো না,' একগাল হেসে বললেন পিটার। 'কাল এই দোকানে আসার আগে প্রেতপুরীতে ঢুকে পড়েছিলাম। ওখানে মমির ঘরে ঢুকেই আলোর ব্যাপারটা বুঝে গিয়েছিলাম। আরে বাবা, সাদা কাপড়ে বিশেষ রং মাখিয়ে মৃদু নীল অথবা বেগুনী আলো ফেললে কী ভয়ঙ্কর দেখায়! আজীবন ফিঞ্চলের কাছে চুল কেটেছি, তাই জানতাম ও কী রকম কুসংস্কারে বিশ্বাসী। কে না কে বলেছিল, দোকানে খরগোশের পা রাখলে হু-হু করে খদ্দের বাড়ে। তাই করেছিল সে। শুক্রবার আর তেরো তারিখে জীবনেও দোকান খুলত না। তাতেই বুঝতে পেরেছিলাম, ভয় দেখিয়ে ওকে বাগে আনা খুবই সহজ হবে।'

'তোমার মগজটা দেখছি বেশ সাফ হে। শুধুই ধাঁধা পণ্ডিত নও। তা আবার কোনও সূত্র-টুত্র বলতে এলে তোমায় আমি ভাগিয়ে দেব না। মন দিয়ে শুনব, বুঝলে?' বলে হা-হা করে হাসতে হাসতে ম্যাগরু এমন জোরে পিটারের পিঠে চাপড় মারলেন যে তার মাথার বিশাল পাগড়িটি ছিটকে পড়ল মাটিতে। ব্যথা কিছুটা পেলেও পিটার ওটাকে প্রশংসা হিসেবে হজম করে নিলেন।

আমার শেষ কথা এবার শুনে রাখুন। সাবধান, এরপর থেকে ভূত-প্রেত দেখলে আবার আলোর খেলা বলে উড়িয়ে দিতে যাবেন না। তাতে হিতে বিপরীত হতে পারে। তবে হ্যাঁ, ঘোর-প্যাঁচ দেখলে, তেমনি কিছু ভাবলে ক্ষতি নেই। আচ্ছা; কসম করে বলুন তো, ঘড়ির ব্যাপারটা পুরোপুরি বুঝেছেন কি না? না বুঝলে, যেভাবে যেভাবে বলা হয়েছে সেভাবেই বাড়ির পুরানো ঘড়ি দিয়ে প্রমাণ করে দেখতে পারেন। তবে হিসেবে না মিললে আমার কোনও দোষ নেই। সব দোষ প্রুফ রিডারের।

আর হ্যাঁ, সেই সূত্রটার কথা মনে আছে? ওই যে, যেটা

এড়িয়ে গিয়েছিলেন পিটার! এতই সোজা এটা যে বলতে আমারই লজ্জা লাগছে। তবু বলি আর কী, সন্দেহের তালিকায় যে পাঁচজনের নাম আছে, তাদের মধ্যে একজনের নামেই কিন্তু সাতটা অক্ষর। সব কয়জনের নাম ইংরেজি বানানে লিখলে একজনেরই নাম শুধু সাতটা অক্ষরে লেখা। বিশ্বাস না হলে লিখে দেখুন।

হ্যারিসন, ফেনট্রিস, লডেন, ফিঞ্চলে, রজার্স–লিখে দেখুন ইংরেজিতে। দেখবেন শুধু ফিঞ্চলেতেই সাতটা অক্ষর আছে, ঘড়িও কিন্তু ভুল ছিল সাতটাই। দেখেছেন, মিলে গেছে, কেমন!

কী বললেন, ভুল ঘড়ি কয়টা ছিল তা মনে নেই, যাঃ বাবা! তা হলে দেখুন আমার গল্পের নামটাই–

সাতটা ভুল ঘড়ির রহস্য।

মূলঃ আলফ্রেড হিচকক
রূপান্তরঃ শাহরিয়ার আহমেদ তাকি

সোহনি শাহ্ যখন রেগে যায়

লেখক পরিচিতি

জি ডি খোসলার জন্ম ১৯০১ সালে, লাহোরে। পড়াশোনা করেছেন ক্যামব্রিজে। ১৯২৫ সালে ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন তিনি। ১৯৪৪-এ পাঞ্জাব হাইকোর্টে বিচারক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয় তাঁকে এবং ১৯৫৯ সালে পাঞ্জাবের প্রধান বিচারক পদে পদোন্নতি ঘটে। তিনি প্রচুর বই এবং প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের মধ্যে রয়েছে হিন্দু-মুসলিম রাজনীতি এবং ভারত ভাগের ঘটনা নিয়ে 'স্টার্ন রেকর্ডিং', হিমালয়ের ভ্রমণ নিয়ে ট্রাভেলস 'হিমালয়ান সার্কিট', মহাত্মা গান্ধীর গুপ্তহত্যার উপর ভিত্তি করে 'মার্ডার অভ দা মহাত্মা', উপন্যাস 'দ্য লাস্ট মুঘল' এবং ছোট গল্পের সংকলন 'দ্য হরস্কোপ ক্যান নট লাই'।

সোহনি শাহ্ শহরের অন্যতম ধনাঢ্য বস্ত্র ব্যবসায়ীই শুধু নয়, সর্বদা হাসিখুশি একজন মানুষও বটে। তার সঙ্গে স্রেফ গল্প করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেয়া যায়। বিরাট দোকানের চারপাশে সূতি, সিল্ক আর উলের স্তূপের মাঝখানে পা মুড়ে বসে সোহনি শাহ্, গোলালু মার্কা গোলাপি মুখখানা বেঁচে থাকার আনন্দে জ্বলজ্বল করে। সে একসঙ্গে দশজন খদ্দের সামলানোর ক্ষমতা রাখে, সহকারীদেরকে জোর গলায় জানিয়ে দেয় কাস্টমার কী ধরনের কাপড় দেখতে চাইছে। কর্মচারীরা নির্দেশ মাফিক স্যাটিন, জর্জেট, শিফন, সার্জ, মসলিন, ফ্ল্যানেল, ছিট কিংবা টুকরো কাপড় ছুঁড়ে দেয়। দক্ষতার সাথে ওগুলো ক্যাচ ধরে সোহনি, বছরের পর বছর

প্র্যাকটিসের কুশলী হাতে কাস্টমারের সামনে ওগুলো মেলে দেয়।

আপনি যা চাইছেন ঠিক সে জিনিসটি আপনার সামনে হাজির করবে সোহনি শাহ্। তিন হাজার রকম কাপড়ের সম্ভারের প্রতিটির দাম তার জানা। আমার অবাক লাগে ভেবে সে এত নিখুঁতভাবে কাজ করে কীভাবে। কাপড় বিক্রির হিসাবটা রাখে তার পিছনে বসা এক অ্যাকাউনটেণ্ট। হাঁটুর উপর রাখা লম্বা খেরো খাতায় মনিবের দ্রুত, সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিখে রাখে সে।

'ছয় গজ সাংহাই, এক রূপী আট আনা; স্যাটিন ছাপা গজ, প্রতি গজ সাড়ে তিন রূপী; লতা ছবি মার্কা, এক পিস, চল্লিশ রূপী, মসলিন ছাব্বিশ, এক পিস, দশ রূপী।'

মাঝে মাঝে দোকানে ভিড় এমন বেড়ে যায় আর সোহনি শাহ্ তার খদ্দেরকে এমন দ্রুততার সঙ্গে কাপড় বিক্রি করে যে অ্যাকাউনটেণ্ট হিসেব লিখে রাখতে রীতিমত হিমশিম খেয়ে যায়। কিন্তু সোহনি শাহ্ মুখে দিব্যি সুখী মানুষের হাসি ধরে রেখে কাজ করে যাচ্ছে। আর এ হাসি সার্বক্ষণিক ধরে রাখে সে। তার ব্যবসা করার প্রক্রিয়া দেখেও শেখার অনেক কিছু আছে।

সোহনি শাহ্কে শহরের সবাই সম্মান করে, ভালবাসে। কাপড়ের ব্যবসা করে প্রচুর কামালেও সে কিন্তু অত্যন্ত সৎ। কখনও জোচ্চুরি করে না। হৃষ্টপুষ্ট গড়নের সোহনি শাহ্ সাদা শার্ট আর ধুতি পরে দোকানে আসে। মাথায় গান্ধি ক্যাপ, মোটাসোটা হাসিখুশি মুখখানা। সে যখন ভুঁড়ি বাগিয়ে হেলেদুলে রাস্তা দিয়ে হাঁটে, যার সঙ্গেই দেখা হয়, তাকে সম্বোধন করে 'শাহি মহারাজ' কিংবা 'নমস্তে শাহজি' বলে। হাসিমুখে সম্বোধন ফিরিয়ে দেয় সোহনি, ঘনিষ্ঠ দু'একজনের সঙ্গে ঠাট্টা মশকরাও করে।

কেউ কেউ ঈর্ষা করে সোহনি শাহ্কে। বলে পঞ্চাশ বছর বয়সে দ্বিতীয় বিয়েই সোহনি শাহ্কে এমন হাসিখুশি রেখেছে। দশ বছর আগে এক তরুণীকে বিয়ে করেছে সে। প্রথম স্ত্রী বিয়োগের পর। তার প্রথম স্ত্রী ছিল স্বামী আর সংসার অন্ত প্রাণ। স্ত্রীর মৃত্যুর

পরে হঠাৎ করেই দ্বিতীয় বিয়ের চিন্তা মাথায় আসে সোহনি শাহ্‌'র। সে লোহার ব্যবসায়ী শান্তা রামের সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করার পরেই নাকি যৌবন ফিরে পায়। 'জানেন না,' ঈর্ষাকাতর লোকগুলো মাথা দুলিয়ে বলে, 'বুড়ো বয়সে যৌবন ফিরে পেতে তরুণীদের সাহচর্যের তুলনা নেই?'

তবে অন্যেরা (এদের মধ্যে বেশিরভাগ স্থানীয় বাসিন্দা) সোহনি শাহ্‌'র প্রতি বেশ সহানুভূতিশীল। তারা সোহনি শাহ্‌কে কুড়ি বছর ধরে চেনে। আগে তার নাম ছিল সোহন লাল। ব্যবসা করে লাল হয়ে ওঠার বহু আগে থেকেই সে এরকম হাসিখুশি স্বভাবের। লোকে বলে 'সোহনি সুখী, কারণ নীতিবোধের প্রশ্নে সে অটল। সে জানে সে কখনও অন্যায় করে না, মানুষ ঠকায় না। সব কাজ সে করে ঈশ্বরের নামে। আর ঈশ্বরও তার প্রতি খুব সদয়।'

বছর আটেক আগে সোহনি শাহ্‌'র সঙ্গে আমার পরিচয়। তখনই বুঝতে পারি সে কত হৃদয়বান এবং বড় মাপের মানুষ। সে আমার কাছে এক পাইকারি বিক্রেতার বিরুদ্ধে মামলা করার জন্য এসেছিল। দাম পড়ে যাওয়ায় লোকটা বড় ধরনের একটা চালান নিতে অস্বীকার করছিল। সোহনি শাহ্‌ ক্ষতিপূরণের দাবি করছিল কিন্তু ডিলার তা দেবে না। আমি অবশ্য সোহনি শাহ্‌কে বলেছিলাম সে ক্ষতিপূরণ পেয়ে যাবে।

'ব্যারিস্টার সাহেব,' বলেছিল সোহনি, 'আমি ওদেরকে দেখিয়ে দিতে চাই সোহনি শাহ্‌কে কেউ বোকা বানাতে পারবে না। আমার পাওনা আমি আদায় করবই।'

সরকারের হুকুমে সোহনি শাহ্‌র দাবি পূরণ করা হয় এবং পাইকারি ডিলারের ফার্ম পুরো টাকা দিতে বাধ্য হয়। তারপর থেকে সোহনি শাহ্‌'র সঙ্গে পেশাদারী কাজে নানা সময় দেখা হয়েছে আমার। আমরা ক্রমে বন্ধু হয়ে যাই। ব্যবসায় কঠোর নীতিপরায়ণ, সোজাসাপ্টা লোকটি প্রায়ই ঝামেলায় পড়ে। যেতে হয় আদালতে। তখন ছুটে আসে আমার কাছে। ধূতির কোঁচা দিয়ে

ঘামে ভেজা মুখ মুছতে মুছতে বসে পড়ে টেবিলের সামনে ক্লায়েন্টদের জন্য রাখা উঁচু, হাতলহীন চেয়ারে। তারপর হাসিমুখে, সংক্ষেপে এবং পরিষ্কারভাবে তার কেস নিয়ে কথা বলে। তবে প্রতিপক্ষের প্রতি কখনও বিষোদগার করতে দেখিনি তাকে। 'আমি কেন ওদের মন্দ চাইব?' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলে সে। 'ঈশ্বরই ওদের শাস্তি দেবেন। কর্মফল ওরা এই জীবনে নতুবা পরের জীবনে ভোগ করবে।'

মাঝে মাঝে দু'একটা পার্টি কিংবা সাক্ষীর উপর ধৈর্য হারিয়ে রেগে যেতাম। আমাকে শান্ত করার চেষ্টা করত সোহনি শাহ্। 'সাহেব জী, আপনি রেগে যাচ্ছেন কেন? ক্রোধ আপনার বিরাট শত্রু। এ শত্রুকে কখনও ঘরে ঢুকতে দিতে নেই। আপনি সঠিক রাস্তায় থাকলে রেগে যাবার দরকারই হবে না। এবং, চোখ টিপে বলত সে, 'ভুল কিছু করে বসলেও আপনার করার কিছু থাকবে না। রাগ করে কখনও যুদ্ধে জেতা যায় না।'

একবার আমার অফিসে বসে আছে সোহনি শাহ্, এটা সেটা নিয়ে গল্প করছে। আমি বললাম, 'শাহ্ জী, আপনার রসবোধ আর অসীম ধৈর্যের আমি প্রশংসা করি। আপনাকে সবসময়ে সুখী আর হাসিখুশি দেখছি। তবে মাঝে মাঝে আপনাকে নিয়ে বেশ কৌতূহল হয়। আপনি কি কোনদিনই কারও উপর রাগ করেননি?'

হাসিটা মুছে গেল সোহনি শাহ্'র মুখ থেকে, ভাঁজ পড়ল কপালে। 'হ্যাঁ,' গম্ভীর চেহারায় জবাব দিল সে, যেন ভুলে যাওয়া অতীতের কোনও স্মৃতি মনে পড়েছে। 'হ্যাঁ, একবার আমি রেগে গিয়েছিলাম।'

'বলুন না সেই ঘটনা,' অনুরোধ করলাম আমি। সোহনি শাহ্ আমার আহ্বানে সাড়া দিল না। গলা খাকারি দিয়ে চেয়ারের কুশন ধরে মোচড়াতে লাগল। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আরেক দিন। আরেকদিন আপনাকে বলব কেন আমি রেগে গিয়েছিলাম, আর রেগে গিয়ে বিয়েও করে ফেলি।'

আমাকে রহস্যের মধ্যে রেখে চলে গেল সে।

এরপর বেশ কিছুদিন পরে রোববারের এক সন্ধ্যায় সোহনি শাহ্'র সঙ্গে দেখা হয়ে গেল আমার। বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আমরা পরস্পরের কুশল জিজ্ঞেস করলাম। নানা বিষয় নিয়ে গল্প হলো। হাঁটতে হাঁটতে ওর বাড়ির কাছে চলে এলাম। আমি থেমে দাঁড়ালাম। বিদায় নেব। বেশ প্রফুল্ল মনে আছে সোহনি শাহ্। আমার কাঁধে হাত রেখে বলল, 'সাহেবজী, আজ রাতে আমার সঙ্গে দুটো ডালভাত খাবেন।' আমি ইতস্তত করছি দেখে মিষ্টি হাসল। 'চলুন, বন্ধু। রোববার আমার জন্য শুভ দিন। এ দিনে আমার মন খুব ভাল থাকে। আমার রেগে যাওয়ার গল্প আজ বলব। গল্পটা শোনার আগ্রহ ছিল আপনার। তাই না?'

আমি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলাম।

সোহনি শাহ্ শহরের কেন্দ্রস্থলে বিরাট একটি বাড়িতে থাকে। পুরানো স্টাইলে তৈরি বাড়ি। বেশ সাজানো। অপ্রয়োজনীয় অনেক খিলান আর সিমেন্টের মূর্তি চোখে পড়ল। বাড়ির ভেতরটা বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। উঠোনের মাঝখানে বড়বড় কয়েকটি ঘর। সোহনি শাহ্ তার পুরো পরিবার নিয়ে এখানে থাকে। সে, তার তরুণী স্ত্রী আর দুই সন্তান বাড়ির সামনের অংশটা দখল করেছে, বড় ছেলে আর তার স্ত্রী তাদের বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে থাকে উঠোনের শেষ প্রান্তে। দুটি পরিবার একই রান্নাঘর ব্যবহার করে। সকল হিন্দু যৌথ পরিবারে তা-ই হয়ে আসছে। আমাকে সামনের বড় ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো। এ ঘরের জানালার কাঁচ রঙিন, রাস্তা দিয়ে দেখা যায়। অতিথি এলে ঘরটি একই সঙ্গে বৈঠকখানা এবং খাবার ঘর হিসেবে ব্যবহার করা হয়। পরিচ্ছন্ন ঘরটিতে অল্প কিছু আসবাব। দেয়ালে সোনালি ফ্রেমের বড় বড় রঙিন ছবি ঝুলছে, মেঝেতে লাল কার্পেট। একপাশে ধবধবে সাদা একটি চাদর পেতে রাখা। তার উপর মুঘল ঢঙে প্রকাণ্ড একটি তাকিয়া। জুতো খুলে এ ঘরে ঢুকতে হলো।

সোহনি শাহ্ রাতের খাবারের হুকুম দিল। একটু পরে এক চাকর নিচু, সরু একটি টেবিল এনে তাকিয়ার সামনে রাখল। তারপর নিকেলের মুরদাবাড়ি বেসিন এনে দরজার পাশে রেখে হাতে তোয়ালে আর জলের লোটা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। আমি হাত মুখ ধুয়ে নিলাম।

চাকর দুটো বড় রুপোর ট্রে নিয়ে এল। তাতে ছ'সাতটি রুপোর বাটিতে সাজানো সজির নানা পদ। মাংস নেই। সোহনি শাহ্ নিরামিশাষী জানি। তাই এ জিনিসের জন্য প্রস্তুত ছিলাম। তবে একটা ব্যাপারের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। তিন বাটি দই। তিন রকমের। প্রথম বাটিতে টক দই, দ্বিতীয়টিতে মিষ্টি, তৃতীয় বাটিতে টক-মিষ্টি দই। আমি না বলে পারলাম না, 'শাহ্জী, আপনি বোধহয় দই খুব পছন্দ করেন। জিনিসটা ভাল। তবে শুনেছি রাতে দই খেতে নেই।'

'দই আমি মোটেই পছন্দ করি না। খুব কমই খাই,' বলল সোহনি শাহ্।

চুপ করে রইলাম আমি বিষয়টি নিয়ে আর কথা বাড়ানো শোভন হবে না ভেবে। খাওয়ায় মন দিলাম।

আমার নিমন্ত্রণকর্তা হঠাৎ ফেটে পড়ল হাসিতে। আমার বিব্রত ভাবটা উপভোগ করছে। বলল, 'শুনে অবাক হয়েছেন, না? তবে এটাই সত্যি যে আমি খুবই কম দই খাই। যদিও প্রতিদিন দু'বার করে তিনরকম দই আমাকে দেয়া হয়। এর কারণ ব্যাখ্যা করার জন্য আজ আপনাকে আমার বাড়িতে ডেকে এনেছি। আমি কেন রেগে গিয়েছিলাম দইয়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক আছে।' বলে নীরব হয়ে গেল সোহনি শাহ্, কিছুক্ষণ চুপচাপ খেয়ে গেল।

বেশ আয়েশ করে ধীর গতিতে খায় সোহনি শাহ্। চাপাতির ছোট টুকরো ছিঁড়ে নিয়ে তাতে সজি রোল করে মুখে পুরল। চাপাতি খাওয়া শেষ, মুখে এখনও খাবার, প্রথমে ধীর গতিতে কথা বলা শুরু করল সে, তারপর দ্রুত হয়ে উঠল ভঙ্গি।

'আপনি জানেন ব্যারিস্টার সাহেব,' বলল সোহনি শাহ্, 'আপনাকে বহুবার বলেছি ঈশ্বর আমাকে ঢেলে দিয়েছেন। একজন মানুষ যা যা চায় সবই পেয়েছি আমি—পুত্র, কন্যা (এদের দু'জনেরই ভাল ঘরে বিয়ে হয়েছে) নাতি, লাভজনক ব্যবসা, চমৎকার একটি বাড়ি, ভাল বন্ধুবান্ধব, সকলের কাছ থেকে সম্মান। আমার জীবনে অভাব বলে কিছু নেই। আমি ভাবি আমি বিধাতার পছন্দের মানুষ। প্রতিদিন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যেন তার আশীর্বাদ এবং দয়া সবসময় আমার উপর বর্ষিত হয়। আমার প্রথম স্ত্রী দেখতে সুন্দরী ছিল না, তবে তার মনটা ছিল অত্যন্ত সুন্দর। আমার হৃদয় জয় করে নিয়েছিল সে। আমি তার কাছে ছিলাম ক্রীতদাসের মত। তার মত স্নেহশীলা, নিঃস্বার্থ নারী জীবনে দু'টি দেখিনি আমি। আমাকে নিয়ে সারাক্ষণ ভাবত সে, আমাকে খুশি করার জন্য সর্বক্ষণ প্রচেষ্টা থাকত তার। আমার গলার স্বর শুনেই বুঝে ফেলত আমি কী চাই, সন্ধ্যা বেলা দোকান থেকে ফিরে আসার পরে আমার হাতের সামান্য ইঙ্গিতেই বুঝে নিত আমার কী দরকার। জানত কখন হাসতে হবে, কখন কী করতে হবে। জানত আমি কী খেতে পছন্দ করি। সবসময় সে খাবার প্রস্তুত করে রাখত। আমার দিকে এমনভাবে খেয়াল রাখত, অবাকই লাগত আমার।

'লোকে বলত আমার স্ত্রী বাড়ির লক্ষ্মী। অবশ্যই সে তা-ই ছিল। বিয়ের কয়েক বছরের মধ্যে আমার ব্যবসা এমন ফুলে-ফেঁপে ওঠে যে সাধারণ কাট-পিস ডিলার থেকে আমি শহরের অন্যতম ধনী ব্যবসায়ীতে পরিণত হই। শৈশব কাটিয়েছি যে বাড়িতে সেটা ছেড়ে দিয়ে এ বাড়িটি তৈরি করি আমরা। ঈশ্বর আমাদেরকে একটি ছেলে এবং দু'টি মেয়ে উপহার দেন। আমরা ছেলের বিয়ে দিই। পুত্রবধূ ঘরে এলে আমার স্ত্রী তার গহনার অর্ধেকটা দিয়ে দিয়েছিল নববধূকে। মেয়েটিকে সে নিজের মেয়েদের চেয়েও বেশি ভালবাসত। আমাদের মেয়ে দুটিকেও

সুপাত্রে, ভাল ঘরে বিয়ে দিয়েছি। খুব শান্তিতে বাস করছিলাম আমরা। ঘরের শান্তি এবং সুখ কোনভাবেই বিঘ্নিত হওয়ার অবকাশ ছিল না।

কিন্তু আমার স্ত্রী যখন দশ বছর আগে, এক শীতে নিউমোনিয়ায় হঠাৎ মারা গেল, বাজ ভেঙে পড়ল মাথায়। মনে হলো আমার সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে কোনও অপদেবতা আমার স্ত্রীকে কেড়ে নিয়েছে আমার কাছ থেকে। প্রচণ্ড শোক এবং হতাশায় মুষড়ে পড়ি আমি, এমনভাবে আচরণ করতে থাকি যেন পৃথিবীর ধ্বংস চলে আসছে। দোকানে যেতাম না, ছেলে পুরো ব্যবসার ভার নিয়ে নেয়। বাড়িতে সারাদিন নিস্তেজ হয়ে বসে থাকতাম কিংবা রাতে একাকী হাঁটাহাঁটি করতাম। বন্ধুরা আমার সঙ্গে কথা বলত, ইঙ্গিতে বোঝাতে চাইত মূর্খের মত আচরণ করছি আমি। 'ঈশ্বরের ইচ্ছে ছিল এটাই,' বলত তারা। 'কাজেই হতাশা ছেড়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসো। ছেলেমেয়েদের নিয়ে শান্তিতে থাকার চেষ্টা করো।'

'আমার বন্ধু চুনিলাল বিয়ের প্রস্তাব দিল: 'আবার বিয়ে করছ না কেন তুমি?' জিজ্ঞেস করল সে। 'যারা বউদেরকে খুব ভালবাসে তারা একা থাকতে পারে না। স্ত্রীর শোক তোমাকে ধ্বংস করে দেবে। যদি বেঁচে থাকতে চাও আর স্ত্রীর স্মৃতি বাঁচিয়ে রাখতে চাও, তা হলে তার জায়গায় কাউকে নিয়ে এসো। তার উপস্থিতি তোমাকে শান্ত করে তুলবে, তোমাকে সে ভালবাসায় ভরিয়ে দিতে পারবে।' ব্যাংক কর্মকর্তা পরশুরাম বলল, 'প্রকৃতিগত ভাবেই তুমি একজন যথার্থ স্বামী; আবার বিয়ে করো এবং পুরানোর বদলে নতুন ভালবাসাকে নিয়ে উজ্জীবিত হও। দুঃখ ভুলে গিয়ে পুরুষ মানুষের মত হয়ে ওঠো। লোহার ব্যবসায়ী শান্তা রামের বিবাহযোগ্যা একটি কন্যা আছে। তোমার কাছে মেয়ে বিয়ে দিতে তার কোনও আপত্তি নেই।'

'সবাই যে যার মত করে তাদের মতামত জানাতে লাগল।

আমার কাছে কথাগুলো অর্থহীন মনে হচ্ছিল। আমি কী করে আমার স্ত্রীর জায়গায় আরেকজনকে বসাব? ভাবতেই বিদ্রোহী হয়ে উঠত মন। আমি বন্ধুদের অনুরোধ কিংবা পরামর্শ কানে তুলতাম না। বিয়ের সমস্ত প্রস্তাব এক এক করে প্রত্যাখ্যান করে চলি আমি।

'ভাবতাম আমার পক্ষে বিয়ে করা কিছুতেই সম্ভব নয়। কিন্তু বিধাতার কর্মকাণ্ড বড় রহস্যময়। জগতে যা ঘটে প্রতিটির পিছনে কারণ থাকে। আমরা যা করি বা ভাবি সবই আমাদের কর্ম এবং তা আমরা করি ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য। কারও জীবনে খারাপ কিছু ঘটলে সেটাকে সে দুর্ভাগ্য বা নিয়তি বলে ধরে নেয়। তবে আসল সত্য এটাই সব কিছুই পরিকল্পিত এবং আমাদের কর্মের অংশ।

'তো আমার ক্ষেত্রেও তা-ই ঘটল। মাস যায়, ধীরে ধীরে আমি স্বাভাবিক হয়ে উঠতে থাকি, আমার বেদনার মাত্রা কমতে থাকে। আমার ছেলে এবং পুত্রবধূ আমাকে খুশি রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করে। আমার আরাম-আয়েশের প্রতি তাদের তীক্ষ্ণ নজর। তারা কাজ থেকে আমাকে ছুটি নিতে বলে। কিন্তু শোকের প্রথম ধাক্কা খানিকটা সামলে ওঠার পরে ঘরে আর অলস বসে থাকতে ইচ্ছে করছিল না। আমি ফিরে এলাম দোকানে। কয়েকদিনের মধ্যে আবার মন দিলাম কাজে। এমনকী পুরানো দিনের মত হাসি-ঠাট্টাও করতে লাগলাম। আমার বন্ধুরা এসব দেখে খুব খুশি।

'একদিন দুপুরে খেতে বসেছি। হঠাৎ মন চাইল দই খাব খাওয়ার প্রতি খুব বেশি আকর্ষণ আমার নেই। তবে সেদিন চিনি মিশিয়ে একবাটি দই খেতে কেন ইচ্ছে করল কে জানে। আগের দিন হলে, বউ বেঁচে থাকলে দই খাওয়ার বাসনা মুখ ফুটে বলারও দরকার হত না। আমি কি চাই না চাই বুঝে ফেলার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল তার। কিন্তু ছেলের বউয়ের কাছে দই খেতে চাইলে সে বলল আজ দই বানাতে পারেনি। দুর্ঘটনাক্রমে দুধটা পাত্র থেকে

পুরোটাই পড়ে গেছে। আমি এ নিয়ে তাকে মন খারাপ করতে নিষেধ করে নিজের খাওয়া শেষ করলাম।

'আমি সারা জীবন চেষ্টা করেছি লোভ না করতে। গুণীজনরা বলেছেন নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে লোভ জয় করার জন্য। আমি জানি, ব্যারিস্টার সাহেব, এসব তত্ত্ব কথা আপনার কাছে হাস্যকর শোনাবে, আমাদের ধর্মে আছে সুন্দরী নারীর মুখ দেখলে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকতে যাতে মনে কোনও কুভাবের জন্ম নিতে না পারে। আপনার ভিতরে খিদেবোধ হলে অনেক কিছু খেতে ইচ্ছে করবে। সেক্ষেত্রে এ চাহিদা নিয়ন্ত্রণ করতে হলে উপবাস করা উচিত। কিন্তু আমরা সে কাজটি কখনোই করি না। আমি নিশ্চয় দই খেতে না পেয়ে একটু অসন্তুষ্ট ছিলাম যে কারণে অর্ধেক পথ যাওয়ার পর মনে পড়ল ক্যাশ বাক্সের চাবিটি বাড়িতে ফেলে এসেছি। আবার বাড়ির পথ ধরলাম। মনে মনে নিজেকে তিরস্কারও করলাম। সামান্য দই খেতে না পেয়ে আমি এমন ভুলোমনা হয়ে গেলাম কীভাবে। 'ঘরে ঢুকে দেখি আমার ছেলে আমার জায়গায় খেতে বসেছে। ওখানে ক্যাশ বাক্সের চাবি রেখে গেছি। চাবি আনতে গিয়ে দেখে ফেললাম দৃশ্যটা। ওর থালার পাশে প্রকাণ্ড একটা বাটিতে দই–কমপক্ষে চারজন খেতে পারবে। আমার পুত্রবধূ তার স্বামীর পাশেই দাঁড়ানো! ভয়ঙ্কর ক্রোধের একটা হল্কা উঠে এল শরীর বেয়ে, পুত্রবধূর দিকে কটমট করে তাকালাম। প্রচণ্ড রাগে আমার মুখের কথা জড়িয়ে গেল, 'তুমি বললে না যে দই নেই? সমস্ত দুধ পড়ে গেছে?'

'আমার পুত্রবধূ বুঝতে পেরেছিল ভয়ানক রেগে গেছি আমি। আমাকে এ চেহারায় কোনওদিন দেখেনি সে। ভয়ে রীতিমত কাঁপতে লাগল সে। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল তারপর এক ছুটে পালিয়ে গেল রান্নাঘরে। সামনে দইয়ের বাটি নিয়ে পাথর হয়ে বসে থাকল আমার ছেলে। ঈশ্বরের অনুগ্রহে রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারলাম আমি, চাবির গোছা মুঠিতে পুরে বেরিয়ে এলাম ঘর

থেকে।

'দোকানে যেতে যেতে ভাবতে লাগলাম আর কখনও ও বাড়িতে ফিরব না আমি। ব্যারিস্টার সাহেব, আমি মেজাজ হারিয়ে ফেলেছিলাম। এ জন্য নিজেকে ক্ষমা করতে পারছিলাম না। ভাবছিলাম সামান্য দইয়ের জন্য কী কেলেঙ্কারি কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলতে পারতাম। এরকম ঘটনা আবার ঘটলে ভয়াবহ কিছু একটা হয়ে যেতে পারে। আমি আমার পুত্রবধূর গায়ে হাত তুলতে পারি। আমি–আমি এমনকী খুনও করে ফেলতে পারি। এসব চিন্তা মাথায় আসার পরে দোকানে যাওয়ার উৎসাহ হারিয়ে ফেললাম। গেলাম বন্ধু পরশুরামের বাড়িতে। জানতে চাইলাম লোহার ব্যবসায়ী শান্তারামের মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে কিনা। না হয়ে থাকলে আমার সঙ্গে বিয়ে দেবে কিনা। আমার কথা শুনে আনন্দের সঙ্গে পরশুরাম বলল, শান্তারামের মেয়ের বিয়ে এখনও হয়নি। সে তক্ষুণি শান্তারামের বাড়ি গেল। একঘণ্টার মধ্যে শান্তারামের মেয়ের সঙ্গে আমার এনগেজমেণ্ট হয়ে গেল। আমি পরশুরামের বাড়িতে থাকলাম। দুইদিন পরে বিয়ে হয়ে গেল। বউ নিয়ে আমি বাড়ি ফিরলাম।'

সোহনি শাহ্ তাকিয়ায় হেলান দিল। রুপোর কৌটা থেকে একটা পান নিয়ে মুখে পুরল। আমি গভীর একটি শ্বাস ফেললাম–আমার আমন্ত্রণ কর্তার জন্য সহানুভূতির বহিঃপ্রকাশ। সোহনি শাহ্ কিছুক্ষণ পান চিবানোর পরে বলল, 'ব্যারিস্টার সাহেব, এই হলো আমার রেগে যাওয়া এবং বউ পাওয়ার গল্প।'

আমি সান্ত্বনা দিয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু সোহনি শাহ্কে এমন তৃপ্ত এবং সুখি লাগছে, বলার প্রয়োজন বোধ করলাম না। তবে তিন রকমের দইয়ের রহস্য এখনও আমার কাছে পরিষ্কার নয়। প্রতিদিন দু'বার তিনবাটি দই খেতে দেয়া হয় সোহনি শাহ্কে অথচ সে নাকি এগুলো ছুঁয়েও দেখে না। এ ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করব কিনা ভাবছি। সোহনি শাহ্ হঠাৎ আনমনা হয়ে পড়েছে,

আমার উপস্থিতিও যেন ভুলে গেছে। নীরবতা আমার ওপর চাপ সৃষ্টি করল। সহ্য করতে না পেরে শেষে বলেই ফেললাম, 'কিন্তু শাহ্‌জী, আপনি তো তিন রকম দইয়ের রহস্য ব্যাখ্যা করলেন না?'

হাতের তালু দিয়ে হাঁটু ঘষছিল সোহনি শাহ্‌। থেমে গেল। মুচকি হাসল।

'ব্যারিস্টার সাহেব, ওই দই আমাকে মনে করিয়ে দেয় আমি আমার পুত্রবধূর সঙ্গে অন্যায় আচরণ করেছিলাম। নিজেকে ছোট্ট একটা শাস্তি দিই আমি এ জন্য। যখন দই খেতে ইচ্ছে করে না তখন জোর করে খাই। তবে আমার চেয়েও বড় শাস্তি পেয়েছে আমার ছেলে আর তার বউ। দ্বিতীয় স্ত্রীর দৌলতে আমি দুটি সন্তান পেয়েছি। আমার বড় ছেলেরই পুরো সম্পত্তি পাবার কথা ছিল। কিন্তু সে এখন মাত্র তিনভাগের এক ভাগ পাবে।'

হয়তো আমার কল্পনা, তবে মনে হলো কথাটা বলার পরে সোহনি শাহ্‌'র ঠোঁটে ফুটে উঠল শয়তানী একটা হাসি।

মূলঃ জি.ডি. খোসলা
রূপান্তরঃ অনীশ দাস অপু

পাগল বিনিময়

লেখক পরিচিতি

সাদত হাসান মাণ্টো (১৯১২-১৯৫৫) সেরা উর্দু সাহিত্যিকদের অন্যতম। তিনি একজন সাংবাদিক এবং চিত্রনাট্যকারও ছিলেন। মাণ্টো দুই দশকে দুই শতাধিক গল্প লিখেছেন। পাশাপাশি রচনা করেছেন নাটক, ছায়াছবির চিত্রনাট্য, উপন্যাস এবং প্রবন্ধ। তাঁর সেরা গল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে টোবাটেক সিং, মোজেল এবং মাম্মি। জীবদ্দশা তিনি কাটিয়েছেন অমৃতসর, বোম্বে এবং লাহোরে। খুশবন্ত সিংয়ের সবচেয়ে প্রিয় গল্পের একটি হলো টোবাটেক সিং, যা তিনি 'দ্য এক্সচেঞ্জ অভ লুনাটিকস' শিরোনামে উর্দু থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন। দ্য এক্সচেঞ্জ অভ লুনাটিকস বাংলায় অনুবাদ করা হলো 'পাগল বিনিময়' শিরোনামে—অনুবাদক।

ভারত উপমহাদেশ ভাগ হওয়ার কয়েক বছর পরে পাকিস্তান এবং ভারত সরকারের মাথায় এল, যেহেতু তারা দু'দেশের মধ্যে কুখ্যাত অপরাধীদের বিনিময় করেছেন, কাজেই এবার দু'দেশের পাগলদেরও বিনিময় করা উচিত। এর মানে হলো, ভারতের পাগলাগারদে যে সব মুসলমান পাগল আছে তাদেরকে পাঠানো হবে পাকিস্তানে এবং পাকিস্তানের উন্মাদ হিন্দু এবং শিখদেরকে হস্তান্তর করা হবে ভারতের কাছে।

এটা সুস্থ সিদ্ধান্ত ছিল কিনা তা আমরা জানি না। তবে জ্ঞানীগুণীরা বলেন পাগল বিনিময়ের চূড়ান্ত চুক্তি এবং তাতে

দস্তখতের আগে দু'দেশের সর্বোচ্চ মহলের আমলাদের মধ্যে নাকি বেশ কয়েকবার বৈঠক হয়।

পাগল বিনিময়ের সংবাদ লাহোরের পাগলাগারদে পৌঁছার পরে সেখানে বেশ একটা হুলস্থূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো। জমিন্দার পত্রিকার নিয়মিত পাঠক এক মুসলিম রোগীকে একজন জিজ্ঞেস করল, 'মৌলভি সাব, এই পাকিস্তানটা কী জিনিস?' সে অনেক ভেবে চিন্তে জবাব দিল, 'এটা ভারতের একটা জায়গা যেখানে ওরা দাড়ি কামানোর ব্লেড তৈরি করে।' এক শিখ পাগল অপরজনকে প্রশ্ন করল, 'সর্দারজী, আমাদেরকে কেন ভারতে পাঠানো হচ্ছে? আমরা তো ওদের ভাষা বলতে পারি না।'

সর্দারজী হেসে জবাব দিল, 'আমি হিন্দুস্তানীদের ভাষা বুঝি।' সে ভাষার পাণ্ডিত্য বোঝাতে ছন্দহীন একটা কবিতা আউড়ে ফেলল:

হিন্দুস্তানীদের মনে খালি শয়তানি
তারা গৃহপালিত মুরগির মত গটগট করে হাঁটে

একদিন সকালে এক পাগল মুসলমান 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' বলে এত জোরে স্লোগান দিল যে চিৎকারের জোশে সে মেঝেতে পা পিছলে আলুর দম হয়ে গেল। অজ্ঞান।

পাগলাগারদের কিছু বাসিন্দা কিন্তু সত্যিকারের পাগল ছিল না। এরা ছিল খুনে। তাদের আত্মীয়স্বজন এদেরকে পাগল সাজিয়ে ফাঁসির দড়ি থেকে রক্ষা করে। এদের ধারণা ঠিক পরিষ্কার নয় কেন ভারত ভাগ করা হলো এবং পাকিস্তান কী জিনিস। এরা আসল সত্য খুব কমই জানত। খবরের কাগজে খুব কমই তথ্যবহুল প্রতিবেদন ছাপা হত আর কারারক্ষীগুলো এমন গর্দভ যে এরা কী বলে তা বোঝা দায়। এদের কথা শুনে একজন যেটুকু সার সংক্ষেপ উদ্ধার করতে পারল তা হলো মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ নামে এক লোক আছে যাকে কায়েদে আযম নামেও সবাই চেনে। আর এই মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ওরফে কায়েদে আযম

মুসলমানদের জন্য আলাদা একটি দেশ বানিয়েছে, যার নাম পাকিস্তান।

কেউ জানে না এই পাকিস্তান কোথায় কিংবা এর বিস্তৃতি কতদূর। এ কারণে যারা পুরো পাগল ছিল না তারাও সম্পূর্ণ উন্মাদ হয়ে গেল ভাবতে গিয়ে যে তারা পাকিস্তানে রয়েছে নাকি ভারতে। আর তারা যদি পাকিস্তানেই থাকে তা হলে ভারত বলে পরিচিত দেশটির সঙ্গে এর পার্থক্য কতটুকু?

এক বেচারা মুসলমান পাগল ভারত-পাকিস্তান আর পাকিস্তান-ভারত নিয়ে কথা শুনতে শুনতে এমন বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল যে তার দশা আগের চেয়ে শোচনীয় হয়ে উঠল। একদিন ঝাড়ু দিয়ে মেঝে ঝাঁট দেয়ার সময় পাগলামিতে পেয়ে বসল তাকে। সে ঝাড়ু ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তরতর করে উঠে পড়ল একটা গাছে। গাছের ডালে বসে পরবর্তী দু'ঘণ্টা সে ভারত-পাকিস্তানের সমস্যা নিয়ে একটানা বক্তৃতা দিয়ে গেল। রক্ষীরা এসে তাকে গাছ থেকে নামানোর চেষ্টা করতে গেলে সে মগডালে উঠে বসল। রক্ষীরা তাকে হুমকি দিলে সে বলল, 'আমি ভারত কিংবা পাকিস্তান কোথাও যেতে চাই না। আমি যেখানে আছি সেখানে অর্থাৎ এই গাছের মগ ডালেই থাকতে চাই।'

কিছুক্ষণ পরে পাগলামির মাত্রা একটু কমে এলে লোকটাকে নীচে নামিয়ে আনা হলো। সে নীচে নামা মাত্র তার হিন্দু এবং শিখ বন্ধুদেরকে জড়িয়ে ধরে ভেউ ভেউ কান্না জুড়ে দিল। তার মনে চিন্তা জেগেছে তার বন্ধুরা তাকে ছেড়ে ভারতে চলে যাবে।

পাগলাগারদের আরেক বাসিন্দা, রেডিও ইঞ্জিনিয়ারিং-এ মাস্টার্স করা। সে অন্যদের চেয়ে নিজেকে আলাদা ভাবত। বাগানের এক কিনারে হাঁটাহাঁটি করে কাটিয়ে দিত দিন। হঠাৎ কী যেন হয়ে গেল তার। পরনের সমস্ত জামা-কাপড় খুলে ধরিয়ে দিল হেড-কনেস্টবলের হাতে। তারপর পুরো আদম হয়ে হাঁটতে লাগল বাগানে।

আরেক মোটাসোটা পাগল ছিল এখানে, মুসলিম লীগের নেতা ছিল এক সময়। দিনে পনেরো/ষোলোবার গোসল করে সে। হঠাৎ গোসল করা একেবারেই বাদ দিয়ে দিল সে।

এই মোটু মুসলমানের নাম মোহাম্মদ আলী। একদিন নিজের সেল থেকে সে ঘোষণা করল আজ থেকে তার নাম মোহম্মদ আলী জিন্নাহ। আর তার সেলের অপর বাসিন্দা এক শিখ নিজেকে দাবি করল মাস্টার তারা সিং বলে। এরপর দু'জনের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়ে গেল। তাদেরকে 'বিপজ্জনক' ঘোষণা করে আলাদা সেলে রাখার ব্যবস্থা করা হলো।

লাহোরের এক হিন্দু আইনজীবী ছিল। প্রেমিকার কাছ থেকে ছ্যাঁকা খেয়ে সে পাগল হয়ে যায়। সে যখন শুনল অমৃতসর ভারতের মধ্যে চলে গেছে, খুবই হতাশ হয়ে পড়ল। কারণ তার হৃদয়েশ্বরী অমৃতসরে থাকে। মেয়েটি তার সঙ্গে প্রতারণা করলেও পাগল হওয়া সত্ত্বেও প্রেমিকাকে সে ভুলতে পারেনি। সে সারা দিন হিন্দু আর মুসলমানদেরকে গালিগালাজ করতে লাগল কারণ তারা ভারত ভেঙে দু'টুকরো করেছে এবং তার প্রেমিকা হয়ে গেছে ভারতীয় আর সে পাকিস্তানী।

পাগল বিনিময়ের কথা বাতাসে ছড়িয়ে পড়লে পাগলাগারদের অন্যান্য বাসিন্দারা হিন্দু আইনজীবীকে সান্ত্বনা দিল এই আশায় যে তাকে শীঘ্রি ভারতে পাঠানো হবে-যে দেশে তার প্রেমিকা বাস করে। তবে নিশ্চিন্ত হতে পারল না আইনজীবী। সে লাহোর ছেড়ে যেতে চায় না কারণ তার আশঙ্কা অমৃতসরে সে বৈধ আইন ব্যবসা করতে পারবে না।

ইউরোপীয় ওয়ার্ডে দু'জন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পাগল আছে। ইংরেজরা ভারতকে স্বাধীনতা দিয়ে ঘরে ফিরে গেছে শুনে তারা খুবই মুষড়ে পড়ল। পাগলাগারদে ভবিষ্যতে তাদের অবস্থান বা মর্যাদা কতটুকু থাকবে তা নিয়ে দু'জনে গোপনে শলা-পরামর্শ করল: পাগলাগারদে ইউরোপীয়দের জন্য আলাদা ওয়ার্ডের ব্যবস্থা

কি থাকবে? তাদেরকে কি আগের মত সকালের নাস্তা পরিবেশন করা হবে? নাকি তাদেরকে টোস্ট খাওয়া থেকে বঞ্চিত করে চাপাতি খেতে বাধ্য করা হবে?

এক শিখ ছিল, পনেরো বছর ধরে পাগলাগারদে আছে। এই পনেরো বছরে তাকে লোকে খুব কম কথাই বলতে শুনেছে। সে শুধু মাঝে মাঝে গুনগুন করেঃ ও, পরদি, গুড় গুড় দি, আনেকা দি, বেদিহানা দি, মুংদি ডাল অব দি ল্যাণ্টার্ন।'

এই শিখকে কেউ দিনে বা রাতে ঘুমাতে দেখেনি। ওয়ার্ডাররা বলে গত পনেরো বছরে কেউ তাকে সামান্য চোখ পিটপিট করতেও দেখেনি। মেঝেতে শুতোও না সে। মাঝে মাঝে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে বিশ্রাম নেয়। তার পায়ের গোড়ালি ফুলে ঢোল হয়ে গিয়েছিল।

পাকিস্তান এবং ভারত নিয়ে কথা বলার সময় কিংবা পাগল বিনিময় নিয়ে আলোচনার সময় এই শিখ খুব মনোযোগী শ্রোতা বনে যায়। কেউ তার দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করতে বললে সে অত্যন্ত গম্ভীর মুখে বলেঃ 'ও পরদি, গুড়গুড় দি, আনেকা দি, বেদিহানা দি, মুং ডি ডাল অব দা পাকিস্তান গভর্নমেণ্ট।'

কিছুক্ষণ পর সে 'অব দা পাকিস্তান গভর্নমেণ্ট'-এর বদলে বলে 'অব দা টোবাটেক সিং গভর্নমেণ্ট।'

সে তার পাগল সঙ্গীদের প্রশ্ন শুরু করল টোবাটেক সিং-এর গাঁ ভারতে নাকি পাকিস্তানে। কেউ এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারল না। কেউ চেষ্টা করলে ফেঁসে যেত যখন ব্যাখ্যা করা হত কীভাবে শিয়ালকোট আগে ভারতে ছিল, এখন পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। কেউ নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারে না একই ভাগ্য লাহোরকেও বরণ করে নিতে হবে কিনা এবং আজকে যারা পাকিস্তানী কাল তারা ভারতীয় হয়ে যাবে কিনা। তা ছাড়া কেই বা নিশ্চিত করে বলতে পারে যে গোটা ভারত পাকিস্তানের অংশ হয়ে যাবে না?

ওই শিখের লম্বা চুল বেশিরভাগ ঝরে গেছে। খুব কমই গোসল করত বলে মাথার চুল দাড়ির সঙ্গে কেমন জট পাকিয়ে থেকে তাকে ভয়ঙ্কর দেখাত। তবে লোকটা ছিল সহজসরল। পনেরো বছর হলো পাগলাগারদে আছে সে, কারও সঙ্গে মারামারি দূরে থাক কথা কাটাকাটি পর্যন্ত হয়নি। বুড়ো পাগলরা জানে তার বাড়ি টোবাটেক সিংয়ের গাঁয়ে এবং তার বাবা একজন সমৃদ্ধ কৃষক। মাথায় গোলমাল দেখা দিলে তার আত্মীয়স্বজন তাকে গায়ে শিকল জড়িয়ে পাগলাগারদে নিয়ে আসে। মাসে একবার তার দু'একজন আত্মীয় এসে সে কেমন আছে দেখে যায়। ভারত-পাকিস্তান ভাগ হয়ে যাওয়ার পরে তাদের আসাও কমে গেল।

এই শিখের নাম বিষেন সিং। তবে সবাই তাকে টোবাটেক সিং নামে ডাকে। বিষেন সিং দিন-রাত, সপ্তাহ, মাস, কোনকিছুর হিসেব রাখতে পারে না। জানে না কতদিন ধরে পাগলাগারদে আছে। তবে তার বন্ধু-ব্যান্ধব কিংবা আত্মীয়-স্বজন তাকে দেখতে এলে বুঝতে পারে এক মাস পার হয়েছে। তাকে হেড ওয়ার্ডার জানায় তার সঙ্গে দেখা করতে 'মিস ইণ্টার ভিউ' এসেছে। সে তখন সারা গায়ে সাবান এবং চুল ও দাড়িতে তেল মাখে। গোসল সেরে দর্শনার্থীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যায়। কোন প্রশ্ন করলে হয় সে চুপ করে থাকে নতুবা জবাব দেয়, 'ও পরদি, আনেকা দি, বেবিয়ানা দি, মুং দি ডাল অব দি লণ্ঠন।'

বিষেন সিংয়ের পনেরো বছর বয়সী একটি মেয়ে আছে। তবে সন্তানকে নিয়ে তার কোন অনুভূতি নেই। বাপকে দেখতে এলে মেয়ে অঝোরে কাঁদে।

ভারত-পাকিস্তান নিয়ে কথা বলার সময় বিষেন সিং অন্য পাগলদের কাছে জানতে চাইল টোবাটেক সিং কোথায় থাকে। কেউ তাকে সন্তুষ্ট করার মত জবাব দিতে পারল না। তার বিরক্তি দিন দিন বেড়ে চলল। ইদানীং মিস ইণ্টারভিউও আসে না তার সঙ্গে দেখা করতে। এখন সে তার আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে

সাক্ষাতের জন্য মুখিয়ে আছে। তাদের সঙ্গে দেখা হলে জিজ্ঞেস করবে টোবাটেক সিং ভারতে আছে নাকি পাকিস্তানে। কিন্তু কেউ আসে না। বিষেন সিং তথ্য পাবার জন্য আরেকজনের দ্বারস্থ হলো।

পাগলাগারদে এক পাগল আছে, নিজেকে সে ঈশ্বর বলে দাবি করে। বিষেন সিং তাকে প্রশ্ন করল টোবাটেক সিং ভারতে আছে নাকি পাকিস্তানে। চেহারা গম্ভীর করে 'ঈশ্বর' জবাব দিল। 'এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করার হুকুম আমরা এখনও পাইনি।'

বিষেন সিং একই জবাব বহুবার পেল। সে ঈশ্বরকে আর্তি জানাল বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার জন্য, যাতে সে সঠিক তথ্য পেতে পারে। কিন্তু তার আবেদন বিফলে গেল: 'ঈশ্বর'-এর আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে আলোচনা করার হুকুম পাবার জন্য। বিষেন সিং-এর ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। একদিন সে ঈশ্বরকে গালাগাল দিয়ে যা বলল তার সারমর্ম হলো ঈশ্বর শুধু মুসলমানদের। ঈশ্বর শিখদের হলে তিনি অবশ্যই একজন শিখের আবেদন শুনতে পেতেন।

পাগল বিনিময়ের তারিখ নির্ধারিত হওয়ার দিন কয়েক আগে টোবাটেক সিংয়ের গাঁ থেকে এক মুসলমান এল বিষেন সিংয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।

এ লোক আগে কখনও পাগলাগারদে আসেনি। বিষেন সিং তাকে দেখে মুখ ফিরিয়ে চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়াল। ওয়ার্ডাররা তাকে বাধা দিল, 'এ তোমাকে দেখতে এসেছে। এ তোমার বন্ধু, ফজল দীন।'

বিষেন সিং কটমট করে তাকাল ফজল দীনের দিকে। বিড়বিড় করতে লাগল। ফজল দীন বিষেন সিংয়ের কাঁধে হাত রাখল। 'অনেক দিন ধরেই তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসব ভাবছিলাম। কিন্তু কিছুতেই সময়ে কুলোতে পারিনি। তোমার পরিবার নিরাপদে সীমান্ত পার হয়ে ভারতে চলে গেছে। আমি ওদের জন্য যতদূর

সম্ভব করেছি। তোমার মেয়ে রূপ কাউর...' ফজল দীন এখানে এসে একটু থেমে গেল। তারপর ইতস্তত ভঙ্গিতে বলল, 'ও ভাল আছে। অন্যদের সঙ্গে সে-ও গেছে।'

বিষেন সিং চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। একটি কথাও বলছে না। ফজল দীন শুরু করল আবার, 'ওরা তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেছে আমাকে। শুনলাম তুমি ভারতে যাবে। তোমার ভাই বলবীর সিং এবং বধোয়া সিংকে আমার সালাম দিয়ো...বোন অমৃতা কাউরকেও...ভাই বলবীর সিংকে বোলো ফজল দীন ভাল আছে, সুখে আছে। ওরা যে বাদামী রঙের মোষ জোড়া রেখে গেছে ওগুলো বাচ্চা দিয়েছে–একটা ছেলে। অন্যটা মেয়ে...মেয়েটা ছয়দিন পরে মারা গেছে। ওদের জন্য কিছু করার থাকলে আমি সবসময়ই তা করব। আমি তোমার জন্য কিছু মিষ্টি ভুট্টা নিয়ে এসেছি।'

বিষেন সিং ভুট্টার ব্যাগ নিয়ে ওয়ার্ডারের হাতে দিল।

ফজল দীনকে জিজ্ঞেস করল, 'টোবাটেক সিং কোথায়?' ফজল দীনকে বোকা বোকা লাগল, জবাব দিল, 'কোথায় আবার থাকবে? যেখানে সবসময় ছিল সেখানেই আছে।'

আবার জানতে চাইল বিষেন সিং, 'পাকিস্তানে, নাকি ভারতে?'

'না, ভারতে নয়, পাকিস্তানে,' জবাব দিল ফজল দীন।

বিষেন সিং বিড়বিড় করতে করতে ঘুরে দাঁড়াল, 'ও পরদি, গুড গুড দি, আনেকা দি, বিধায়ানা দি, মুং দি ডাল অব দি পাকিস্তান অ্যাণ্ড হিন্দুস্তান অব দূর ফিট্টি মুহ্।'

পাগল বিনিময় করার সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন হলো। দু'পক্ষের পাগলদেরকেই যে যার জায়গায় পাঠিয়ে দেয়ার তালিকা করে এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্টদেরকে খবর দেয়া হলো। বিনিময়ের দিনও নির্ধারিত হয়ে গেল।

প্রচণ্ড ঠাণ্ডা এক সকালে শিখ আর হিন্দু পাগলরা লাহোর

পাগলাগারদ ছাড়ল কড়া পুলিশ প্রহরায়। ওয়াগা সীমান্তে দু'দেশের সুপারিনটেণ্ডেন্টরা মিলিত হলেন।

বাস থেকে পাগলদের নামিয়ে দু'দেশের কাস্টডি অফিসারদের হাতে তুলে দেয়ার সময় বেজায় ঝক্কি পোহাতে হলো। কেউ কেউ বাস থেকে নামবেই না, যারা নামল তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করাও কঠিন হয়ে পড়ল। কেউ বা ভেগে পড়ার চেষ্টা করল। তাদেরকে আবার ধরে আনা হলো। ন্যাংটো পাগলদের জামা-কাপড় পরানো হলো। কিন্তু জামা পরানো মাত্র তারা সে কাপড় ছিঁড়ে শত টুকরো করল। কেউ কুৎসিত ভাষায় গালাগাল দিতে দিতে বাস থেকে নামল। কেউ গলার রগ ফুলিয়ে গান গাইছে, কেউ জবুথবু হয়ে বসে থাকল, আবার কেউ গলা ফাটিয়ে কাঁদল, গর্জন ছাড়ল। এমন একটা হট্টগোল শুরু করে দিল তারা যে কেউ কারও কথা বুঝতে পারছে না। মহিলা পাগলরাও যোগ দিল এদের সঙ্গে। আর এরকম অবস্থা চলতে লাগল দাঁত কপাটি লেগে যাওয়ার মত ভয়াবহ ঠাণ্ডার মধ্যে।

বেশিরভাগ পাগল এই বিনিময়ের প্রবল প্রতিবাদ জানাল। কারণ তারা বুঝতে পারছিল না কেন তাদেরকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় জোর করে পাঠানো হচ্ছে। কেউ চিৎকার করে স্লোগান দিচ্ছে, 'পাকিস্তান দীর্ঘজীবী হোক,' কেউ বা বলছে 'পাকিস্তান মুর্দাবাদ'। কেউ কেউ এমন উন্মাদ হয়ে উঠল যে মারামারি শুরু করে দিল। তাদেরকে বহু কষ্টে থামানো হলো।

অবশেষে এল বিষেন সিংয়ের পালা। ভারতীয় কর্মকর্তা তার নাম লিখছেন রেজিস্টারে, বিষেন সিং জিজ্ঞেস করল, 'টোবাটেক সিং কোথায়? ভারতে নাকি পাকিস্তানে?'

'পাকিস্তান।'

এটাই বিষেন সিংয়ের জানা দরকার ছিল। সে ঘুরেই পাকিস্তানের দিকে দৌড় দিল। পাকিস্তানি সৈন্যরা তাকে ধরে ফেলল এবং ভারতের মধ্যে ঠেলে ঢোকাবার চেষ্টা করল। বিষেন

সিং কিছুতেই যাবে না। 'টোবাটেক সিং এই পাশে আছে।' সে চিৎকার করে উঠল। তারপর গলার স্বর সপ্তমে তুলে চেঁচাতে লাগল, 'ও পরদি, গুড়গুড় দি, আনেকা দি, বেধিয়ানা দি, মুং দি অব টোবাটেক সিং অ্যাণ্ড পাকিস্তান।' ওরা তাকে শান্ত করার চেষ্টা করল, ব্যাখ্যা করল টোবাটেক সিং নিশ্চয় ভারতে চলে গেছে। এ নামে কাউকে পাকিস্তানে পাওয়া গেলে অবশ্যই তাকে তৎক্ষণাৎ ভারতে পাঠিয়ে দেয়া হবে। কিন্তু বিষেন সিং কোন কথা মানতে রাজি নয়। সে ভারতে যাবেই না। ওরা শক্তি প্রয়োগের চেষ্টা করল। বিষেন সিং ভারত-পাকিস্তান সীমান্তরেখার মাঝখানে অটল পাহাড়ের মত দাঁড়িয়ে রইল। ঠেলা-ধাক্কা দিয়ে কিছুতেই তাকে সরানো গেল না। মাটির মধ্যে আঙুল গেড়ে দাঁড়িয়ে থাকল বিষেন সিং।

জোর খাটিয়ে লাভ হবে না বুঝতে পেরে ক্ষান্ত দিল ওরা। নিজের ইচ্ছে হলে আসবে বিষেন সিং। সে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে ওখানেই তাকে রেখে বাকি পাগল বিনিময়ের কাজ শুরু হয়ে গেল।

সূর্য ওঠার খানিক আগে, বিষেন সিংয়ের গলা দিয়ে আর্তচিৎকার বেরিয়ে এল। যে লোক গত পনেরো বছর পাগলাগারদে ঠায় দাঁড়িয়ে থেকেছে, এবার সে মাটির উপর দড়াম করে পড়ে গেল। কাঁটাতারের বেড়ার একপাশে ভারতের সীমান্ত চিহ্নিত করা, অপর পাশে পাকিস্তানের সীমানা। দুই কাঁটাতারের মাঝখানে, নো ম্যানস ল্যাণ্ডে মাটিতে মুখ গুঁজে পড়ে রইল টোবাটেক সিংয়ের গাঁয়ের বাসিন্দা বিষেন সিং।

মূলঃ সাদত হাসান মান্টো
রূপান্তরঃ অনীশ দাস অপু

ভেড়ার মাংস

ঘরটি উষ্ণ এবং পরিচ্ছন্ন। জানালার পর্দা ফেলা। দুটি টেবিল ল্যাম্পই জ্বলছে। একটি ওর সামনে, অন্যটি খালি চেয়ারটির বিপরীতে। ওর পেছনের সাইডবোর্ডে সাজানো একজোড়া লম্বা গ্লাস, সোডা ওয়াটার, হুইস্কি। থার্মোস ঝুড়িতে আইস কিউব। এসব সাজিয়ে স্বামীর কাজ থেকে ফেরার অপেক্ষায় বসে আছে মেরী ম্যালোনি।

মাঝে মাঝে মুখ তুলে ঘড়ি দেখছে ও। মেরীর স্বামীর আসার সময় হয়ে গেছে। একটা হাসি খুশি আবহ ঘিরে রেখেছে ওকে। ছ'মাস চলছে ওর। কল্পনায় সন্তানের চেহারা দেখতে পায় মেরী। নরম মুখ, কালো চোখ, ঝকমকে চাউনি।

পাঁচটা বাজার দশ মিনিট আগে শব্দটা শোনার জন্যে কান পাতল মেরী। কয়েক মুহূর্ত পরে, প্রতিদিন ঠিক যেভাবে ঘটনাটা ঘটে, টায়ারের সাথে নুড়ি পাথরের সংঘর্ষের আওয়াজ ভেসে এল বাইরে থেকে। দরজা সশব্দে বন্ধ হবার শব্দ শোনা গেল, এবার পায়ের শব্দ আসছে জানালা দিয়ে। তালায় চাবি ঘুরছে। ক্লিক। হাতের সেলাইয়ের সরঞ্জাম পাশে রেখে দিল মেরী। সিধে হলো। এগিয়ে গেল স্বামীর দিকে। চুমু খাবে।

'হ্যাল্লো, ডার্লিং,' বলল মেরী।

'হ্যাল্লো,' জবাব দিল ওর স্বামী।

কোটটা খুলে ক্লজিটে ঝুলিয়ে রাখল মেরী। তারপর দুটো ড্রিঙ্ক বানাল। কড়াটা স্বামীর জন্যে। নিজের জন্যে কমজোরী। দু'হাতে

ড্রিঙ্কের গ্লাসটা ধরল ওর স্বামী, দোলাচ্ছে। কাঁচের গায়ে আইস কিউব বাড়ি খেয়ে শব্দ তুলল টিং টিং।

এ সময়টাকে বেশ উপভোগ করে মেরী। জানে প্রথম ড্রিঙ্কটা শেষ না করা পর্যন্ত কথা বলবে না ওর স্বামী। ততক্ষণ স্বামীর পাশে চুপচাপ বসে থাকে মেরী। দীর্ঘসময় একা থাকার পরে স্বামীর বাড়ি ফেরাটা আনন্দদায়ক মনে হয় তার কাছে। স্বামীর সান্নিধ্য পছন্দ করে সে। সূর্য স্নানকারীদের কাছে সূর্য যেমন উপভোগ্য, এই মানুষটি পাশে থাকলে তেমন একটা অনুভূতি হয় মেরীর। মানুষটি যেভাবে পা ছড়িয়ে বসে চেয়ারে কিংবা আস্তে আস্তে লম্বা পা ফেলে পায়চারি করে ঘরে, সবই দেখতে ভাল লাগে ওর। তবে সবচে' ভাল লাগে যখন হুইস্কির গ্লাস হাতে চুপচাপ বসে থাকে এবং ক্লান্তি নিয়ে বকবক করে না, ওই সময়টি।

'ক্লান্ত, ডার্লিং?' জিজ্ঞেস করল মেরী।

'হ্যাঁ,' জবাব এল, 'আমি ক্লান্ত।' কথাটা বলে অদ্ভুত এক কাণ্ড করে বসল সে। এক চুমুকে প্রায় অর্ধেক খালি করে দিল গ্লাস। তারপর এগিয়ে গেল আরেকটি ড্রিঙ্ক আনতে।

'আমি নিয়ে আসছি,' চেঁচিয়ে উঠল মেরী। এক লাফে উঠে দাঁড়াল। 'তুমি বসে থাকো।'

গ্লাস ভরে নিয়ে নিজের জায়গায় আবার ফিরে এল মেরীর স্বামী।

'ডার্লিং, তোমার স্লিপার জোড়া নিয়ে আসব?'

'দরকার নেই।'

মেরী দেখছে গাঢ় হলুদ রঙের তরল বোঝাই গ্লাসে চুমুক দিতে শুরু করেছে তার স্বামী।

'ব্যাপারটা অন্যায়ই বটে,' বলল মেরী। 'বিশেষ করে তোমার মত সিনিয়র অফিসারকে ডিঙিয়ে জুনিয়র কাউকে প্রমোশন দেয়া কিছুতেই মেনে নেয়া যায় না।'

জবাবে অপর পক্ষ কিছু বলছে না দেখে সেলাইতে মন দিল

মেরী। তবে আইস কিউবের টিং টিং শব্দে বুঝতে পারল মদ পান ঠিকই চালিয়ে যাচ্ছে লোকটি।

'ডার্লিং' অবশেষে চাইল সে স্বামীর দিকে। 'তোমার জন্যে কিছু চিজ নিয়ে আসি? আজ বিষ্যুদবার বলে কিছু রান্না করিনি।'

'দরকার নেই,' জানাল সে।

'তবে তোমার খুব বেশি খিদে পেলে কিছু খাবার বানিয়ে আনতে পারি,' বলে চলল মেরী, 'ফ্রিজে মাংস তো আছেই।'

হাসি হাসি মুখ করে স্বামীর দিকে তাকিয়ে রইল সে। কিন্তু লোকটি কিছুই বলল না।

'আচ্ছা, আগে কিছু চিজ আর বিস্কিট খাও,' বলল মেরী।

'বললাম তো দরকার নেই,' গম্ভীর মুখে জানাল স্বামী।

অস্বস্তি নিয়ে নড়েচড়ে বসল মেরী। বড় বড় চোখ মেলে এখনও লক্ষ করছে স্বামীকে। 'কিন্তু সাপারে তুমি তো কিছু খাবে, নাকি? আর রান্না করতে আমার মোটেই কষ্ট হবে না। ভেড়ার মাংসের চপ চলবে? কিংবা শুয়োরের? যা চাও পাবে। ফ্রিজেই আছে সব।'

'কিচ্ছু দরকার নেই।'

'কিন্তু কিছু তো খেতেই হবে। আমি নিয়ে আসি,' বলে আবার উঠে দাঁড়াল মেরী, সেলাই কাঁটা রাখল টেবিলে, ল্যাম্পের ধারে।

'আহ্, বসো তো,' বলল ওর স্বামী। 'এক মিনিট বসো।'

গলার স্বরে এমন কিছু আছে যে ভয় পেয়ে গেল মেরী। আস্তে আস্তে বসে পড়ল। বড় বড় চোখ মেলে চেয়ে রইল। দ্বিতীয় ড্রিঙ্কটিও শেষ। ওর স্বামী ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে খালি গ্লাসের দিকে।

'শোনো,' বলল সে। 'তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

'কী কথা, ডার্লিং? কী হয়েছে?'

চুপচাপ বসে রইল স্বামী। পাথরের মত স্থির। মাথাটা নিচু করে আছে। কী যেন ভাবছে। বাতির আলোয় তার মুখের ওপরের

অংশটা আলোকিত, চিবুক এবং মুখমণ্ডলে ছায়া পড়েছে। মেরী লক্ষ করল স্বামীর বাম চোখের পাশের পেশীটা তিরতির করে কাঁপছে।

'কথাটা শুনে তুমি হয়তো কষ্ট পাবে,' শুরু করল সে। 'কিন্তু ভেবে দেখলাম কথাটা বলা উচিত তোমাকে। আশা করি ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করবে তুমি। পরিস্থিতির জন্যে দায়ী করবে না আমাকে।'

তারপর চার-পাঁচ মিনিট অনর্গল কথা বলে গেল সে। পুরো সময়টুকু আতঙ্ক নিয়ে স্বামীর দিকে তাকিয়ে রইল মেরী।

'তো ব্যাপারটা হলো এই,' উপসংহার টানল লোকটি। 'তোমার এ অবস্থায় কথাগুলো বলা উচিত হয়নি বুঝতে পারছি। কিন্তু উপায়ও ছিল না। তবে দুশ্চিন্তা কোরো না, আমি তোমাকে টাকা পাঠাব। আর এটা নিয়ে তুমি হৈ চৈ করবে না বলেই আমার বিশ্বাস। তা হলে চাকরি নিয়ে আরও সমস্যায় পড়ে যাব আমি।'

মেরীর ইচ্ছে করল লোকটার কথা বিশ্বাস না করতে, স্রেফ অগ্রাহ্য করতে। ভাবতে চাইল এ ধরনের কিছু সে শোনেনি। তার ছয় মাস চলছে। এমন সময় কোন স্বামী তার স্ত্রীকে চাকরির ধুয়ো তুলে বাড়ি থেকে চলে যেতে বলে? এটা একটা অজুহাত মাত্র, ভাবছে মেরী। আসলে লোকটার গার্লফ্রেণ্ড সম্পর্কে যেসব কথা শুনেছে ও তাই সত্যি। মেরীকে তাড়িয়ে দিয়ে গার্লফ্রেণ্ডকে নিয়ে থাকতে চায় সে। কিন্তু মেরীর দোষটা কী?

'আমি সাপার নিয়ে আসছি,' ফিসফিস করে বলল মেরী। এবার আর লোকটা বাধা দিতে পারল না তাকে। আচ্ছন্নের মত ঘর থেকে বেরিয়ে এল মেরী। টেরই পাচ্ছে না হাঁটছে। সবকিছু কেমন ভোঁতা লাগছে ওর—শুধু বমি বমি ভাব হচ্ছে। ইচ্ছে করছে বমি করে দেয়। সবকিছুই যেন স্বয়ংক্রিয় ভাবে ঘটে চলেছে—সিঁড়ি বেয়ে সেলারে চলে এল মেরী, বাতি জ্বালল। ডীপ ফ্রিজ খুলল। হাতে মাংসের যে খণ্ডটি ঠেকল ওটাই বের করল। জিনিসটা কাগজে

মোড়া। কাগজ খুলে ফেলল মেরী।

ভেড়ার একটা রান।

ভেড়ার মাংস দিয়েই আজ সাপার বানাবে মেরী। দু'হাতে রানটা ধরে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল ও। চলে এল লিভিং-রুমে। লোকটাকে দেখল জানালার ধারে দাঁড়িয়ে আছে, তার দিকে পেছন ফেরা। থেমে দাঁড়াল মেরী।

'ফর গডস সেক,' মেরীর দিকে না ঘুরেই বলল সে। 'বললাম তো সাপারের দরকার নেই। আমি বাইরে যাচ্ছি। বাইরে থেকে খেয়ে আসব।'

তার মানে আজ তার বাইরে খাওয়ার প্রোগ্রাম আগেই ঠিক করা।

কোথায়?

নিশ্চয়ই গার্লফ্রেণ্ডের বাড়িতে। কথাটা ভাবতেই রাগে যেন বিস্ফোরিত হলো মেরীর মাথা। এরপর যা ঘটল, মেরী নিজেও বোধহয় জানত না যে এমন কাণ্ড করে বসবে। মেরী হেঁটে চলে এল লোকটার পেছনে। তারপর ভেড়ার বিরাট, শক্ত রানটা দু'হাতে উঁচু করে ধরল মাথার ওপর, সর্বশক্তি দিয়ে মুগুর চালানোর মত ধাঁই করে বাড়ি মারল খুলির পেছনে।

এক পা পিছিয়ে এল মেরী। দেখছে। চার-পাঁচ সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে টলল লোকটা। তারপর দড়াম করে পড়ে গেল মেঝেতে।

মেঝেতে পড়ে যাওয়ার শব্দ, ছোট টেবিলটার উল্টে যাবার দৃশ্য-ইত্যাদি হঠাৎ সংবিৎ ফিরিয়ে আনল মেরীর। ধীরে ধীরে পা বাড়াল। গা শিরশির করছে ওর, কি ঘটেছে বুঝতে পারছে না। চিত হয়ে পড়ে থাকা শরীরটার দিকে পিট পিট করে তাকাল বার কয়েক, হাতে এখনও শক্ত করে ধরা মাংস খণ্ডটি।

আচ্ছা, মনে মনে বলল মেরী। আমি তা হলে ওকে মেরে ফেলেছি।

ব্যাপারটা অবিশ্বাস্যই বলতে হবে, হঠাৎই মাথাটা পরিষ্কার হয়ে

এল মেরীর। দ্রুত চিন্তা করতে পারছে এখন ও। একজন গোয়েন্দার স্ত্রী হিসেবে ওর জানা আছে হত্যাকাণ্ডের সাজা কী। ফাঁসি হলে আপত্তি নেই মেরীর। তা হলে সংসারের যন্ত্রণা থেকে চিরতরে মুক্তি মেলে। কিন্তু ওর পেটের সন্তান? সে তো কোন দোষ করেনি। গর্ভবতী খুনী মা'র বিরুদ্ধে কি আইন আছে জানে না মেরী। ওরা কি অনাগত শিশু এবং মা দু'জনকেই মেরে ফেলবে? নাকি সন্তানের জন্ম পর্যন্ত অপেক্ষা করবে?

কী করবে ওরা?

এ প্রশ্নের জবাব জানা নেই মেরী ম্যালোনির। তবে পেটের সন্তানকে সে মেরে ফেলতে চায় না। তাকে পৃথিবীর আলো দেখাতে চায়। প্রয়োজনে সন্তানের জন্যে ঝুঁকি নেবে মেরী।

ভেড়ার রানটা নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকল। রাখল একটা প্যানে। জ্বালিয়ে দিল আভন। সিদ্ধ হতে থাকল মাংস। হাত ধুলো মেরী। দৌড়ে চলে এল দোতলার বেডরুমে। বসল আয়নার সামনে। ঠোঁট আর মুখে হাত বোলাল। হাসার চেষ্টা করল। অদ্ভুত হাসি ফুটল মুখে। ভাল লাগছে না দেখতে। আবার চেষ্টা করল হাসতে।

'হ্যাল্লো, স্যাম,' জোরে, খুশি খুশি গলায় বলল সে।

কিন্তু কণ্ঠস্বরও কেমন আড়ষ্ট শোনাল।

'আমাকে কিছু আলু দাও, স্যাম। আর এক কৌটো মটরশুঁটি।'

এবার আগের চেয়ে ভাল শোনাচ্ছে। হাসি এবং কথায় আড়ষ্ট ভাবটা অনেকটাই দূর হয়েছে। অনেকবার রিহার্সাল দিল মেরী। শেষে সন্তুষ্ট হয়ে নেমে এল নীচে। কোট গায়ে দিয়ে পেছনের দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ল। বাগান পার হয়ে উঠে এল রাস্তায়।

এখনও ছটা বাজেনি। তবে মুদি দোকানটাতে আলো জ্বলছে। 'হ্যালো, স্যাম,' খুশি খুশি গলায় বলে উঠল মেরী কাউন্টারের পেছনে দাঁড়ানো লোকটাকে উদ্দেশ্য করে।

'গুড ইভনিং, মিসেস ম্যালোনি। কেমন আছেন?'

'আমাকে কিছু আলু দাও, স্যাম। আর এক কৌটো মটরশুঁটি।'

ঘুরল লোকটা। শেলফ থেকে মটরশুঁটির ক্যান নামাল। 'প্যাট্রিক বলল, ও নাকি খুব ক্লান্ত, তাই আজ আর বাইরে খেতে যাবে না,' বলল মেরী। 'আমরা বিষ্যুদবার কখনও বাড়িতে খাই না, নিশ্চয়ই জানো তুমি? বাসায় সব্জি টব্জি নেই। তাই আসতে হলো।'

'মাংস লাগবে না, মিসেস ম্যালোনি?'

'নাহ্। ফ্রিজে মাংস আছে। ভেড়ার আস্ত একটা ঠ্যাং।'

'ওহ্ আচ্ছা।'

'ফ্রোজেন মাংস রান্না করতে ভাল্লাগে না আমার। তবে এবার পরীক্ষা করে দেখব পারি কিনা।'

'ফ্রোজেন বা তাজা দু'রকম মাংসই আমার কাছে সমান,' বলল দোকানদার। 'দুটোর মধ্যে খুব একটা পার্থক্য আছে বলেও মনে হয় না। যাকগে, আপনি আইডাহো পটেটো নেবেন?'

'দুটো দিতে পারো। ভালই তো খেতে।'

'আর কিছু?' দোকানি মাথা কাত করে জানতে চাইল। 'সাপারের পরে কী নেবেন? মানে মিষ্টি টিষ্টি কিছু?'

'কী মিষ্টি নিলে ভাল হবে বলো তো?'

'চিজ কেক নিয়ে যান। প্যাট্রিক সাহেব এটা খুব পছন্দ করেন।'

'বেশ তো। দাও একটা।'

জিনিসপত্রগুলো ঠোঙায় পুরে দিল স্যাম। দাম চোকাল মেরী। ঝলমলে হেসে বলল, 'ধন্যবাদ, স্যাম। গুড নাইট।'

'গুড নাইট, মিসেস ম্যালোনি। এবং ধন্যবাদ।'

বাড়ির দিকে দ্রুত পা চালাল মেরী। এখন সে খুব সুন্দরভাবে রান্না করবে, ভাবছে ও। কারণ স্বামী বেচারী খিদেয় কাহিল হয়ে আছে। আর ঘরে ঢুকে যদি দেখে ভয়ানক কিছু ঘটে গেছে, স্বভাবতই শকড্ হবে মেরী। আতঙ্কে এবং কষ্টে উন্মাদিনী হয়ে উঠবে সে। তবে, নিজেকে মনে করিয়ে দিল মেরী, সে কিন্তু কিছু ঘটার আশঙ্কা নিয়ে বাসায় ঢুকছে না। সব্জি কিনে বাড়ি যাচ্ছে

মিসেস প্যাট্রিক ম্যালোনি। কারণ তার স্বামীকে সজি রান্না করে খাওয়াবে সে।

গোটা ব্যাপারটা এভাবেই সাজাতে হবে, মনে মনে বলল মেরী। স্বাভাবিক ভাবে সমস্ত কাজ করতে হবে। উল্টোপাল্টা কিছু করা যাবে না। সবকিছু স্বাভাবিক থাকলে অভিনয়ের প্রয়োজন পড়বে না।

পেছনের দরজা দিয়ে রান্নাঘরে ঢুকল মেরী চেনা গানের একটা সুর ভাঁজতে ভাঁজতে। মুখে হাসি।

'প্যাট্রিক!' গলা ছেড়ে ডাকল সে। 'কেমন আছ, ডার্লিং?'

কাগজের ঠোঙাটা টেবিলে রাখল মেরী, চলে এল লিভিংরুমে। প্যাট্রিকের দুপা ভাঁজ করা, হাতটা বেকায়দা ভঙ্গিতে পিঠের নীচে চাপা পড়েছে। দৃশ্যটা শক্ড্ হবার মতই। হঠাৎ স্বামীর জন্যে ভালবাসা যেন উথলে উঠল মেরীর। এক দৌড়ে চলে গেল লাশের কাছে, বসে পড়ল হাঁটু গেড়ে। তারপর গলা ছেড়ে কাঁদতে শুরু করল। কাজটা খুব সহজ। অভিনয়ের প্রয়োজন নেই।

কিছুক্ষণ পরে উঠে দাঁড়াল মেরী, পা বাড়াল ফোনের দিকে। থানার নাম্বার মুখস্থ ওর। ডায়াল করার পরে ওপাশে কে যেন ধরল ফোন। ফুঁপিয়ে উঠল মেরী, 'জলদি! জলদি আসুন! মারা গেছে প্যাট্রিক!'

'কে বলছেন?'

'মিসেস ম্যালোনি। মিসেস প্যাট্রিক ম্যালোনি।'

'প্যাট্রিক ম্যালোনি মারা গেছে!'

'মনে হয়।' ফোঁপানি বেড়ে গেল মেরীর। 'চিত হয়ে পড়ে আছে মেঝেতে। দেখে মনে হচ্ছে মারা গেছে।'

'থাকুন আপনি। আমরা আসছি এখুনি।' ওধার থেকে জানাল লোকটা।

খুবই দ্রুত চলে এল পুলিশের গাড়ি। সদর দরজা খুলে দিল মেরী। দু'জন পুলিশ ঢুকল ঘরে। দু'জনকেই চেনে মেরী।

প্যাট্রিকের কলিগ। একজন জ্যাক নূনান, অপরজন ও'ম্যালি। নূনানকে দেখে গলা ছেড়ে কেঁদে উঠল মেরী। জড়িয়ে ধরল। নূনান ওকে আস্তে করে বসিয়ে দিল একটা চেয়ারে। তারপর গেল ও'ম্যালির কাছে। লাশের পাশে বসে পরীক্ষা করছে সে।

'ও কি সত্যি মারা গেছে?' কাঁদতে কাঁদতে জানতে চাইল মেরী।

'জি। কিন্তু ব্যাপারটা ঘটল কীভাবে?'

সংক্ষেপে গল্পটা ওদেরকে বলল মেরী। জানাল মুদি দোকানে গিয়েছিল সব্জি কিনতে, এসে দেখে প্যাট্রিকের এই দশা।

বর্ণনা দিচ্ছে মেরী, হেঁচকি তুলছে মাঝে মাঝে, ওই সময় নূনান লক্ষ করল মৃত মানুষটির মাথার পেছনে জমাট বেঁধে আছে রক্ত। ও'ম্যালিকে দেখাল সে। ও'ম্যালি সাথে সাথে কোথায় যেন ফোন করল।

একটু পরে আরও কিছু লোকের আগমন ঘটল মেরীর বাসায়। প্রথমে এলেন একজন ডাক্তার, তারপর দু'জন ডিটেকটিভ। এদের একজনকে নামে চেনে মেরী। পুলিশের এক ফটোগ্রাফার এসে ছবি তুলল। আরেকজন এল আঙুলের ছাপ নিতে। লাশটাকে ঘিরে সবাই ফিসফিস করে কথা বলছে, গোয়েন্দারা নানা প্রশ্ন করল মেরীকে। তবে সদয় ব্যবহার করল তারা মেরীর সঙ্গে। গল্পটা শুরু থেকে আবার বলল মেরী। জানাল সে সেলাই করছিল। এমন সময় প্যাট্রিক আসে। খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল তাকে। এত ক্লান্ত যে বাইরে খেতে যেতে চাইছিল না। তখন মেরী আভনে মাংস চাপিয়ে দেয়।

'ওখানে রান্না হচ্ছে মাংস,' রান্নাঘরের দিকে ইঙ্গিত করল মেরী। তারপর বলল সে মুদি দোকানে গিয়েছিল সব্জি কিনতে। দোকান থেকে ফিরে এসে দেখে মেঝেতে চিত হয়ে পড়ে আছে তার স্বামী।

'কোন্ দোকান?' জিজ্ঞেস করল এক গোয়েন্দা।

স্যামের কথা বলল মেরী। গোয়েন্দাটি তার সঙ্গীর দিকে ফিরে

কানে কানে কি যেন বলল। মাথা ঝাঁকিয়ে তক্ষুণি বেরিয়ে গেল সে।

মিনিট পনেরো পরে ফিরে এল সে। হাতে এক তাড়া কাগজ। আবার ফিসফিসানি শুরু হয়ে গেল। মেরী আবার কান্না শুরু করে দিয়েছে। ফোঁপাতে ফোঁপাতে টুকরো টাকরা কথা ভেসে এল কানে–'ওঁকে স্বাভাবিক লাগছিল...হাসি খুশি...প্যাট্রিককে সাপার রান্না করে দেয়ার কথা বলছিলেন...মটরশুঁটি... চিজকেক...এটা অসম্ভব যে উনি...'

কিছুক্ষণ পরে ফটোগ্রাফার এবং ডাক্তার চলে গেল। এল আরও দু'জন। এরা স্ট্রেচারে করে নিয়ে গেল লাশ। তারপর ফিঙ্গার প্রিণ্টঅলাও চলে গেল। রইল দুই গোয়েন্দা আর দুই পুলিশ অফিসার। এরা মেরীর সাথে এ পর্যন্ত একটুও খারাপ ব্যবহার করেনি। জ্যাক নূনান বলল মেরী ইচ্ছে করলে কোথাও থেকে ঘুরে আসতে পারে, পারে তার বোনের বাড়ি গিয়ে থাকতে।

না, জানাল মেরী। কোথাও যাবে না সে। তার শরীর একদম চলছে না। সে কোথাও যেতে চায় না।

নূনান তাকে বেডরুমে গিয়ে বিশ্রাম নিতে বলল। কিন্তু নড়ল না মেরী। বলল আপাতত এখানেই থাকবে সে। ভাল লাগলে, শরীরে একটু শক্তি ফিরে এলে বেডরুমে যাবে।

মেরীকে তার নিজের জায়গায় রেখে পুরুষরা যে যার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ঘর সার্চ করছে ওরা। ডিটেকটিভ দু'জন মাঝে মাঝে প্রশ্ন করল মেরীকে। জ্যাক নূনানও দু'একটা বিষয় জানতে চাইল ওর কাছে। জানাল তার স্বামীকে কেউ মাথার পেছনে ভারী কিছু দিয়ে আঘাত করে মেরে ফেলেছে। ভোঁতা, ধাতব বড় কোন কিছু। অস্ত্রটার খোঁজ করছে ওরা। খুনী হয়তো অস্ত্রটা সঙ্গে নিয়ে গেছে। আবার ফেলে রেখে যাওয়াও বিচিত্র নয়। লুকিয়েও রাখতে পারে কোথাও।

'সেই পুরানো গল্পের মত,' বলল নূনান। 'অস্ত্রটা খুঁজে পেলেই

খুনীর সন্ধান পাওয়া যাবে।’

খানিক বাদে এক গোয়েন্দা এসে বসল মেরীর পাশে, জানতে চাইল বাড়িতে এমন কিছু কি আছে যা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। মেরী কি একটু কষ্ট করে দেখবে বড় কোন স্প্যানার বা ভারী কোন ধাতব ফ্লাওয়ার ভাস-টাস হারিয়ে গেছে কিনা। ওদের কোন ধাতব ফ্লাওয়ার ভাস নেই, জানাল মেরী।

‘কিংবা বড় স্প্যানার?’

স্প্যানারও নেই। তবে গ্যারেজে এরকম কিছু একটা থাকতে পারে, বলল মেরী।

খোঁজাখুঁজি চলছে পুরোদমে। বাগানেও পুলিশ সার্চ করছে। ওদের পায়ের শব্দ পাচ্ছে মেরী। মাঝে মাঝে পর্দার ফাঁক দিয়ে ঝিলিক দিচ্ছে টর্চের আলো। ঘড়ি দেখল মেরী। প্রায় ন’টা বাজে। চারজন মানুষ ঘর সার্চ করতে করতে ভয়ানক ক্লান্ত।

‘জ্যাক,’ নূনান ওর পাশ দিয়ে যাবার সময় ডাকল মেরী। ‘আমাকে একটা ড্রিঙ্ক দেবেন?’

‘নিশ্চয়ই। কী নেবেন? হুইস্কি?’

‘দিন। তবে অল্প। হুইস্কি খেলে একটু চাঙা লাগবে।’

নূনান হুইস্কির গ্লাস দিল মেরীকে।

‘আপনিও একটা নিন,’ বলল মেরী। ‘আপনাকে খুব ক্লান্ত লাগছে।’

‘ডিউটির সময় মদ পান নিষেধ,’ বলল নূনান। ‘তবে এক গ্লাস হুইস্কি খেলে এখন ভালই লাগবে আমার।’

জ্যাক নূনান ছাড়া অন্য তিনজনকেও হুইস্কি দিল মেরী। হাতে ড্রিঙ্কের গ্লাস নিয়ে ওরা সান্ত্বনা দিল মেরীকে। তবে চেহারা দেখে বোঝা যায় অস্বস্তি লাগছে সবার।

সার্জেন্ট নূনান গিয়েছিল কিচেনে, দ্রুত এসে বলল, ‘মিসেস ম্যালোনি, আপনার চুলো এখনও জ্বলছে। আভনে মাংস দেখলাম।’

‘ওহ্ হো?’ চেঁচিয়ে উঠল মেরী। ‘মাংসের কথা আমি ভুলেই

গেছিলাম।'

'আভন বন্ধ করে আসব?'

'যদি দয়া করেন,' বলল মেরী।

আভন বন্ধ করে চলে এল নূনান। তার দিকে অশ্রু সজল, বড় বড় চোখ মেলে তাকাল মেরী, বলল, 'জ্যাক নূনান...'

'বলুন?'

'একটা ছোট্ট উপকার করবেন আমার...আপনারা সবাই?'

'চেষ্টা করব, মিসেস ম্যালোনি।'

'বেশ,' বলল মেরী। 'আপনারা সবাই এখানে এসেছেন। সবাই প্যাট্রিকের বন্ধু। এসেছেন ওর খুনীকে ধরতে। অনেকক্ষণ হয়ে গেল। সবারই নিশ্চয়ই খুব খিদে পেয়েছে। আপনারা আমার এখানে না খেয়ে গেলে কষ্ট পাবে প্যাট্রিকের আত্মা। কোনদিন ক্ষমা করবে না সে আমাকে। আভনে মাংস রান্না করাই আছে। ভেঁড়ার মাংস। আপনারা খেয়ে যান, প্লীজ।'

'না, না, তা কী করে হয়,' বলল নূনান।

'প্লীজ,' অনুনয় করল মেরী। 'আপনারা অভুক্ত থেকে কাজ করেছেন। আমার খুব খারাপ লাগছে। মাংসটা প্যাট্রিকের জন্যে রান্না করেছিলাম। ও তো আর খেয়ে যেতে পারল না!' দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। 'ও মাংস আমার গলা দিয়ে নামবে না। আপনারা প্যাট্রিকের বন্ধু। খেয়ে গেলে আমার মনটা শান্তি পাবে। দয়া করে আর না বলবেন না।'

চারজনেরই দারুণ খিদে পেয়েছে। তবু খানিক ইতস্তত করে রাজি হয়ে গেল ওরা। ঢুকল রান্নাঘরে। মেরী বসে থাকল নিজের জায়গায়। কিচেনের দরজা খোলা। ওদের কথা শোনা যাচ্ছে। খাওয়া শুরু করে দিয়েছে ওরা।

'আরেকটু দিই, চার্লি?'

'আরে না। আগে এটা শেষ করে নিই।'

'উনি বললেন পুরোটাই খেতে। শুনলে না এ মাংস তাঁর গলা

দিয়ে নামবে না।'

'ঠিক আছে। তা হলে দাও আরেকটু।'

'খুনী ভারী মুগুর দিয়ে প্যাট্রিকের মাথা ফাটিয়েছে,' বলল একজন। 'ডাক্তার বললেন খুলি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে ওর।'

'এ জন্যেই খুনীকে খুঁজে বের করা সহজ হবে।'

'আমারও তাই ধারণা।'

'যে-ই কাজটা করে থাকুক অমন ভারী জিনিস নিশ্চয়ই বয়ে বেড়াবে না সে।'

তৃপ্তির ঢেকুর তুলল একজন।

'আমার ধারণা জিনিসটা এখানেই কোথাও আছে।'

'হয়তো আমাদের নাকের ডগায়। তুমি কী বলো, জ্যাক?'

ওদিকে অন্য ঘরে, ওদের কথা শুনে খিক খিক হাসতে শুরু করল মেরী।

মূলঃ রোল্ড ডাহ্ল
রূপান্তরঃ অনীশ দাস অপু

৯৮

ওরা

উইলশায়ার বুলেভার্ডের অন্ধকার রাস্তা দিয়ে সতর্ক ভঙ্গিতে হেঁটে চলেছে লুইস স্টিলম্যান। সাবধানে নিঃশ্বাস ফেলছে ও, হাতে উদ্যত অটোমেটিক পিস্তল। ওয়েস্টার্ন এভিনিউয়ের দিকে মোড় নিল লুইস। রাস্তার দু'ধারে দোকানপাটের কোনও জানালায় একটা কাঁচ আস্ত নেই, দরজাগুলো ভাঙা, বাতাসে মাঝে মাঝে দুলছে। লস অ্যাঞ্জেলেস শহরটাকে চাঁদের আলোয় ভৌতিক এবং মৃত মনে হচ্ছে, যেন একটা কবরস্থান। লম্বা, সাদা দালানগুলো খাড়া হয়ে আছে আকাশের দিকে মুখ তুলে, গাঢ় ছায়া পড়েছে রাস্তায়। ট্রাক, বাস আর বিভিন্ন গাড়ি যত্রতত্র ছড়িয়ে আছে ধাতব লাশের মত।

ফক্স উইলটার্নের বিরাট তাঁবুর নীচে থমকে দাঁড়াল লুইস। মাথার ওপর ভাঙা বাল্বের সারি, যেন খুরের মত ধারাল দাঁত বের করে আছে। লুইসের মনে হলো সবগুলো বাল্ব এখনই ওর ওপর ছিটকে পড়ে ওকে ফালাফালা করে ফেলবে।

আরও চারটে ব্লক পার হতে হবে ওকে। উইলশায়ারের দক্ষিণে খাবারের দোকানটা। লুইস ঠিক করেছে আজ রাতে সে সেফওয়ে কিংবা থ্রাফটিমার্ট-এর মত বড় স্টোরগুলোতে হানা দেবে না। এসব দোকানে প্রচুর বিদেশি খাবার পাওয়া যায়। কিন্তু লুইসের যা প্রয়োজন সেটা ছোট কোনও গ্রোসারিতেই পাওয়া যাবে। ইদানীং সাধারণ, প্রয়োজনীয় খাবার সংগ্রহ করাটাও ওর জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। বড় সুপার-মার্কেটগুলো শুধু বিদেশি খাবারেই ভর্তি। কিন্তু লুইসের এখন দরকার ক্যাভিয়ার আর ঝিনুক।

ওয়েস্টার্ন এভিনিউ পার হওয়ার আগেই সে দেখতে পেল ওদেরকে। একটা ভাঙা গাড়ির পেছনে হাঁটু গেড়ে ঝপ করে বসে পড়ল লুইস। গাড়িটার পেছনের দরজা খোলা, সাবধানে ব্যাকসিটে উঠে বসল সে। অটোমেটিকের সেফটি ক্যাচ রিলিজ করে গাড়ির কাঁচশূন্য জানালা দিয়ে উঁকি দিল। সংখ্যায় ওরা ছ'সাতজন। এক লাইন ধরে আসছে। ঈশ্বর! ওকে ওরা দেখে ফেলেনি তো? নিশ্চিত হতে পারল না লুইস। হয়তো ওরা তার অবস্থান টের পেয়ে গেছে। খোলা রাস্তায় থাকলে দৌড়ে পালাবার তবু একটা সুযোগ থাকত। গুলি করারও সাহস হলো না ওর। পিস্তলে সাইলেন্সার পেঁচানো থাকলেও গুলির শব্দ শোনা যেতে পারে। তা হলে অন্যরাও চলে আসবে। ধরা না পড়া পর্যন্ত গুলি করবে না, সিদ্ধান্ত নিল লুইস।

আরও কাছে চলে এল ওরা। ছ'জন। কথা বলতে বলতে হাঁটছে। ওদের নিষ্ঠুর মুখগুলো খোলা, চাঁদের আলোয় ঝিকিয়ে উঠছে চোখ। আরও কাছে চলে এল ওরা। ওদের মুখ দিয়ে তীক্ষ্ণ শিসের আওয়াজ বেরুচ্ছে, ক্রমশ চড়া হয়ে উঠল শব্দটা। ওরা এবার এত কাছে যে লুইস ওদের ধারাল দাঁতগুলো স্পষ্ট দেখতে পেল। গাড়ি থেকে মাত্র কয়েক হাত দূরে ওরা...অটোমেটিক চেপে ধরা হাতের মুঠি পিচ্ছিল হয়ে গেল লুইসের; হৃৎপিণ্ড দড়াম দড়াম বাড়ি খেতে লাগল বুকের খাঁচায়। আর কয়েক সেকেণ্ড...

এখন!

লুইস স্টিলম্যান এলিয়ে পড়ল ধুলোমাখা সিটে, কাঁপা হাতে আলগা হয়ে গেল পিস্তল। ওরা ওকে পাশ কাটিয়ে চলে গেছে, লক্ষ করেনি। শিসের শব্দ ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে এল। মিলিয়ে গেল দূরে।

কবরের নীরবতা গ্রাস করল ওকে।

খাবারের দোকানটা যেন সত্যি ঈশ্বরের আশীর্বাদ। তাকে থরেথরে সাজানো খাদ্যসামগ্রী, দেখেই বোঝা যায় কেউ স্পর্শ করেনি। শুধু

টিনবন্দী খাবারগুলো নেবে, ঠিক করল লুইস। কাছের তাক থেকে ক্যানগুলো নামাতে শুরু করল সে।

পেছন থেকে শব্দটা এল—ঘড়ঘড় একটা শব্দ।

বিদ্যুৎ বেগে ঘুরল লুইস স্টিলম্যান, হাতে অটোমেটিক।

বিরাট এক দো-আঁশলা কুকুর, ঘড়ঘড় করে আওয়াজ বেরুল ওটার গলা দিয়ে, চারটে পা টানটান, আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত। ওটার কান দুটো লেপ্টে আছে খুলির সঙ্গে, ভয়ঙ্কর চোয়াল বেয়ে লালা ঝরছে।

বন্দুকটা কোনও কাজেই আসবে না, জানে লুইস; গুলির শব্দ ওরা শুনতে পাবে। শরীরের সব শক্তি দিয়ে বাঁ হাতে ঝট্ করে একটা ভারি ক্যান তুলেই ওটা ছুঁড়ে মারল সে কুকুরটার মাথায়। প্রচণ্ড আঘাতে ছিটকে গেল জানোয়ারটা, বার কয়েক পা দাপাদাপি করে স্থির হয়ে গেল। আর নড়ল না। দ্রুত ক্যানগুলো তুলে নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ল লুইস।

আমার ভাগ্য আর কতদিন সুপ্রসন্ন থাকবে? অবাক হয়ে ভাবল লুইস স্টিলম্যান, দরজার হুড়কো টেনে দিল। কাঠের একটা টেবিলের ওপর বাক্সগুলো রাখল, বাতি জ্বালল। কমলা রঙের আলোয় ভরে উঠল সরু, নিচু ছাদের ঘরটা।

আজ রাতে দু'বার, নিজেকে শোনাল সে, দু'বার তুমি ওদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে—ওরা যদি তোমাকে খুঁজত তা হলে আজ তুমি নির্ঘাত ধরা পড়তে। ওরা জানে না তুমি বেঁচে আছ। যখন জানবে...

জোর করে চিন্তাটা মাথা থেকে দূর করে দিল লুইস। বাক্স খুলে ক্যানগুলো বের করতে শুরু করল। সাজিয়ে রাখল ঘরের কোণে লম্বা একটা শেলফে।

তারপর সে ভাবতে লাগল জোয়ান নামের মেয়েটিকে নিয়ে, যাকে সে ভালবাসত...

লুইস স্টিলম্যানের জীবনে কোনও বৈচিত্র্য নেই; জগৎটা রসকষহীন। এই মুহূর্তে লুইস হেঁটে চলেছে লম্বা এক টানেল দিয়ে। অনেকক্ষণ হলো হাঁটছে ও। পাথুরে, ঠাণ্ডা দেয়াল যেন চেপে আসছে চারপাশ থেকে। মাঝেমাঝে দৌড়াচ্ছে লুইস। পায়ের পেশীগুলোকে সবল রাখতে হবে তো! পাতলা, হলুদ একটা আলোর রেখা লক্ষ করে হেঁটে চলেছে লুইস। কী যেন খুঁজছে।

আজ রাতে, ভাবল সে, আমার মত একজনকে খুঁজে বের করতেই হবে। অবশ্যই সেরকম কেউ একজন আছে; খুঁজতে থাকলে তার সন্ধান আমি পাবই। অবশ্যই তাকে পেতে হবে!

গত তিন বছর ধরে মাটির নীচের এই পৃথিবীতে সে একজন নারী অথবা পুরুষকে হন্যে হয়ে খুঁজছে। তিন বছর হলো সে লসঅ্যাঞ্জেলেস নগরীর মাটির নীচের ড্রেনে, যেটা দানবীয় কোনও শরীরের শিরা উপশিরার সঙ্গেই একমাত্র তুলনীয়, সেই সাতাশ মাইল লম্বা ভূগর্ভস্থ পয়ঃনালীতে পাগলের মত খুঁজে ফিরছে একজন সঙ্গীকে–কিন্তু কারও দেখা পায়নি সে। কাউকে না।

আজও, সারাদিন আর রাত অবিশ্রাম খোঁজাখুঁজির পরেও সে এই সত্যটা মেনে নিতে পারছে না যে সে একা, সত্তর লাখ নাগরিক অধ্যুষিত নগরীতে সেই একমাত্র এবং সর্বশেষ জীবিত ব্যক্তি...

অপূর্ব সুন্দরী মেয়েটি চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে। অন্ধকারেও তার চোখে অদ্ভুত আলোর দ্যুতি; টকটকে লাল ঠোঁট জোড়া হাসছে। পরনের ফোম সাদা গাউনটা ফুলে উঠছে বাতাসে।

'কে তুমি? জিজ্ঞেস করল সে, কণ্ঠটা অপ্রাকৃত শোনাল, যেন ভেসে এল দূর থেকে।

'নাম জানার কি সত্যি কোনও প্রয়োজন আছে, লুইস?' তার সুশ্রাব্য কণ্ঠ যেন পাথর বেয়ে নেমে আসা ঝর্ণা, শিহরিত হলো সে, কুলুকুলু ঢেউ উঠল শরীরে।

‘না,’ বলল সে। ‘পরস্পরের দেখা পেয়েছি আমরা। আর কিছু জানার দরকার নেই আমার। ঈশ্বর, কতদিন পর! ভেবেছিলাম আমিই সর্বশেষ মানুষ। আর কোনওদিন তোমার দেখা পাব...’

‘আস্তে, আমার সোনা,’ ঝুঁকে এল সে তার দিকে, চুমু খাবে। তার ঠোঁট ভেজা, আত্মসমর্পণের আবেদনে ভরা। ‘এই তো আমি তোমার কাছে।’

হাত বাড়াল সে, চেটোয় তুলে নেবে ফুলের মত মুখখানা। হঠাৎ অস্পষ্ট হয়ে যেতে লাগল তার আকৃতি, যেন গলতে শুরু করল অন্ধকারে। চিৎকার করে উঠল সে, মেয়েটির বাড়ানো হাত ধরার জন্য অন্ধের মত হাতড়াল। কিন্তু চলে গেছে সে, তার আঙুল ঘষা খেল কর্কশ আর স্যাঁতসেঁতে কংক্রিট দেয়ালে।

দুধসাদা কুয়াশার একটা মেঘ পাক খেতে খেতে মিলিয়ে গেল গুহার সীমাহীন দূরত্বে।

বৃষ্টি আর বৃষ্টি। সারা দিনভর বৃষ্টি। ড্রেনগুলো এমনভাবে তৈরি যে বন্যার পানি কোনও ক্ষতি করতে পারে না। তাই লুইস স্টিলম্যান বৃষ্টি নিয়ে তেমন ভাবিত নয়। টানেল ফ্লোর থেকে হাত তিনেক ওপরে সে তার থাকার জায়গা করেছে। আর পানি অতখানি উচ্চতায় কখনোই উঠতে পারে না। কিন্তু বৃষ্টির শব্দ পছন্দ নয় ওর। গুহার ভেতর বজ্রপাতের বুক কাঁপানো আওয়াজ, যেন অ্যামপ্লিফায়ারে একনাগাড়ে বেজেই চলেছে। বৃষ্টির দিনে কোথাও বেরুবার জো নেই। বই পড়েই সময়টা পার করে লুইস। ওয়েলটি, গর্ডিমার, আইকেন, আরউইন শ এবং হেমিংওয়ের ছোট গল্প ওর খুব প্রিয়; পছন্দ করে ফ্রস্ট লোরকা, স্যাণ্ডবার্গ, মিলে, ডিলান টমাসের কবিতা। এঁদের গল্প-কবিতা যখন সে পড়ে তখন কেমন অবাস্তব মনে হয় সবকিছু। অবাস্তবতার ব্যাপারটি যেন ভাসমান কিছু একটা, যে মুহূর্তে সে বই বন্ধ করে, একাকিত্ব আর ভয় তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মনে মনে প্রার্থনা করল সে, বৃষ্টিটা যেন তাড়াতাড়ি থামে।

স্যাঁতসেঁতে ভাব। ঠাণ্ডা দেয়াল, শীত আর স্যাঁতসেঁতে ভাব, এই তিনটা জিনিস যেন তাকে ঠেসে ধরে থাকে সবসময়। ড্রেনের পানি বয়ে চলার বিরামহীন শব্দ, বৃষ্টির টিপটিপ, গুহা, মাটিতে পড়ে ফেটে যাওয়া বৃষ্টির ফোঁটা। বিছানায়, মোটা কম্বল মোড়া অবস্থায়ও স্যাঁতসেঁতে ভাবটা যেন সাপের মত হিলহিল করে ঢুকে যায় তার শরীরে। শব্দগুলো...ক্ষীণ চিৎকার, শিস ও ফিসফাস যেন ষড়যন্ত্রের জট পাকায় তার মাথার ওপর। রাস্তা দিয়ে কী যে একটা হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে ওরা। কিছু একটাকে হত্যা করেছে, কোনও সন্দেহ নেই; কোনও প্রাণী—হয় বিড়াল কিংবা কুকুর...লুইস স্টিলম্যান পাশ ফিরে শুলো, কম্বল টেনে দিল মাথার ওপর। শক্ত করে চোখ বন্ধ করে রাখল। কান পাতল। পেভমেন্ট থেকে শব্দটা আসছে। মারামারি করছে কারা যেন, গাল দিচ্ছে।

'মর সবাই,' বলল সে। 'মর তোরা সবাই।'

লুইস স্টিলম্যান দৌড়াচ্ছে। দৌড়াচ্ছে লম্বা টানেল ধরে। ওকে ধাওয়া করেছে অতি ক্ষুদ্র কতগুলো জীব। তাদের ছায়া পড়ছে দেয়ালে। ওদের তীক্ষ্ণ, তীব্র চিৎকার সুচের মত বিধছে তার কানে। জীবগুলোর বাড়ানো থাবা এবার প্রায় ধরে ফেলল লুইসকে; ঘাড়ের ওপর গরম ধোঁয়ার মত নিঃশ্বাসের স্পর্শ পেল সে; ওর ফুসফুস ফেটে যেতে চাইল, গোটা শরীরে যেন আগুন জ্বলে উঠেছে।

পায়ের দিকে তাকাল লুইস। টানেলের মেঝেতে জুতোর শব্দ সমান একটা ছন্দ তুলেছে। ভাবল সে; আমি যে কোনও সময় মারা যেতে পারি, কিন্তু আমার পা জোড়া আমাকে রক্ষা করবে। ড্রেনের অফুরন্ত পথে ওরা দৌড়ে মরবে কিন্তু কখনও আমাকে ধরতে পারবে না। ওরা খুব দ্রুত ছুটছে, কিন্তু আমি ওদের ক্রমেই পেছনে ফেলে দিচ্ছি, ক্লান্ত করে তুলছি ওদের—রাগিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু আমার পা কি এত পরিশ্রম সইতে পারবে! ওদের গতিও যে আরও বেড়ে চলেছে!

হঠাৎ সে টের পেল তার শরীরটা দু'ভাগ হয়ে যাচ্ছে। শরীরের ওপরের অংশ থেকে পা দুটো বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করল। আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল সে, খামচি মেরে ধরতে চাইল বাতাস, মিনতি করল ওরা যেন তাকে ছেড়ে না যায়। কিন্তু পা জোড়া নিষ্ঠুরের মত হাঁটুর নীচ থেকে খুলে যেতে লাগল। শেওলা ধরা মেঝেতে ছিটকে পড়ে গেল লুইস স্টিলম্যান, বিস্ফারিত চোখে দেখল পা জোড়ায় যেন প্রাণ সঞ্চার হয়েছে, বুনো প্রাণীর মত লাফিয়ে উঠল শূন্যে। মুখ হাঁ করল সে, বুক ফাটানো আর্তনাদ করে উঠল।

ঘুম ভেঙে গেল লুইস স্টিলম্যানের।

ধড়মড় করে উঠে বসল সে বিছানায়, ঘন ঘন শ্বাস ফেলছে, সারা গা ঘামে জবজবে। বুক কাঁপিয়ে নিঃশ্বাস ফেলল সে একটা, কাঁপা হাতে সিগারেট ধরাল।

দুঃস্বপ্নের মাত্রাটা দিন দিন বাড়ছে। দিনের সমস্ত ভয় রাতে, ঘুমের মধ্যে তাকে তাড়া করে ফেরে।

ছয় বছর আগের কথা আবারও মনে পড়ে গেল লুইস স্টিলম্যানের। অবাক হয়ে ভাবল এখনও সে বেঁচে আছে কী করে। ছয় বছর আগে ভিনগ্রহবাসীরা হঠাৎই আক্রমণ করে বসে পৃথিবী। তাদের আক্রমণ ছিল ভয়ঙ্কর এবং পৈশাচিক। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ভিনগ্রহবাসীরা তাদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে–পৃথিবীর সকল নারী পুরুষ ধ্বংস হয়ে যায়। অল্প কয়েকজন মাত্র বেঁচে ছিল, সে তাদের একজন। তাদেরকে সে কখনও দেখেনি, কিন্তু নিশ্চিত যে তারা বেঁচে আছে। লস এঞ্জেলেস নিয়েই গোটা পৃথিবী নয়, আর সে যখন পালিয়ে বেঁচেছে, অন্যরাও নিশ্চয়ই অন্য কোথাও ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। ভিনগ্রহবাসীদের আক্রমণের সময় সে মাটির নীচে, ড্রেনে, টানেল বি-তে একটা কন্সট্রাকশন কোম্পানির কাজ করছিল। এখনও কান পাতলে সে যেন নৃশংস ভিনগ্রহবাসীদের বিশাল স্পেসশিপের শব্দ আর ঝটিকা আক্রমণের আওয়াজ শুনতে পায়।

খিদে তাকে বাধ্য করেছিল বাইরে বেরুতে। তারপরই সে বুঝতে পারে এই নগরীতে সে ছাড়া আর কেউ বেঁচে নেই। প্রথম তিন বছর তার কোনও বিপদ হয়নি। ওই সময় সে তাদের সঙ্গে কাজ করেছে, ওদের অনেক কাজ শিখিয়েছে, ওদের বিশ্বাস অর্জনের চেষ্টা চালিয়েছে। কিন্তু একদিন হঠাৎ একজন ওকে ঈর্ষা করতে শুরু করল অন্যদের সঙ্গে তার সুসম্পর্কের কারণে। ভাগ্যিস সে ব্যাপারটা টের পেয়ে আগেভাগে ড্রেনে পালাতে পেরেছিল বলে রক্ষা। এটা সেই তিন বছর আগের ঘটনা। এতদিনে ওরা নিশ্চয়ই তাকে ভুলে গেছে।

মাটির ওপরের দুনিয়া লুইস স্টিলম্যানের কাছে ভয় আর আতঙ্কের এক জগৎ। তার খাবার ফুরিয়ে গেলে, একান্ত বাধ্য হয়ে সে ওখানে যায়। নর্দমার একটা জাফরির নীচে, টানেলে সে একরুমের একটা ঘর বানিয়েছে। ওরা উঁকি দিলেও ওকে দেখতে পাবে না বটে, কিন্তু সূর্যের আলো ঠিকই তার ঘরে ঢোকে। তবে আলোর সরাসরি উত্তাপ উপভোগ করার সৌভাগ্য তার হয় না, যেমন সে মানুষের সঙ্গ থেকে বঞ্চিত। তবুও সে ভুলেও দিনের বেলা ড্রেনের ওপর ওঠে না।

বৃষ্টি থামলে সে হামাগুড়ি দিয়ে জাফরির নীচে এসে দাঁড়াল। সূর্যের উত্তাপ যতটা শুষে নেয়া যায়। কিন্তু আলো এত কম যে তার নগ্ন কাঁধজোড়া শুধু উত্তাপটুকু উপভোগ করতে পারল।

স্বপ্ন...শুধুই স্বপ্ন।

'তোমার শীত করছে, লুইস?'

'হ্যাঁ। আমার শীত করছে।'

'তা হলে বাইরে যাও, প্রিয়। সূর্যের কাছে যাও।'

'পারব না। আমি বাইরে যেতে পারব না।'

'কিন্তু লস অ্যাঞ্জেলেসই তোমার পৃথিবী, লুইস! এখানকার সর্বশেষ বাসিন্দা তুমিই। এই পৃথিবীর শেষ মানুষ।'

'হ্যাঁ, কিন্তু ওরা সব দখল করে আছে। সমস্ত রাস্তাঘাট ওদের দখলে, সব বাড়িঘর। ওরা আমাকে বাইরে যেতে দেবে না। আমি মরে যাব। ওরা আমাকে খুন করবে।'

'বাইরে যাও, লুইস।' তরল, স্বপ্নালু কণ্ঠটা ক্রমশ অস্পষ্ট থেকে অস্পষ্টতর হয়ে যেতে লাগল। 'বাইরে সূর্যের নীচে, প্রিয় আমার। ভয় নেই।'

সেই রাতে প্রায় একঘণ্টা সে জাফরির আড়াল দিয়ে চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকল। অন্ধকার আকাশের বুকে গোল চাঁদখানা যেন বিশাল এক হলুদ ফ্লাডল্যাম্প। এই প্রথম তার মনে পড়ে গেল ক্যানসাস সিটির ব্লুজ স্টেডিয়ামে রাতের বেলা বেসবল খেলার কথা। বাবার সঙ্গে খেলাটা দেখতে যেত সে। মাঠটাকে মনে হত বড় একটা পুকুর, খেলোয়াড়রা যেন হাওয়ায় ভেসে বেড়াত। নাইট বেসবল ওর কাছে সব সময় যাদুর খেলা মনে হত।

মাঝে মাঝে ওর মাথায় পাগলামি ঢোকে। রাতের নির্জনতা এত ভয়ঙ্কর ঠেকে যে সে আর সহ্য করতে পারে না। ভাবে ওদের একটাকে ধরে নীচে নিয়ে আসবে। একদিন নিশ্চয়ই ওদেরকে কব্জা করা যাবে। কিন্তু ওদের ক্রুর বুনো চোখ, পশুসুলভ হিংস্রতার কথা মনে পড়লেই ও মিইয়ে যায়। জানে ওটা একেবারেই অসম্ভব একটা কাজ। ওদের কেউ যদি হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যায় কোনও কারণ ছাড়াই, অন্যরা সন্দিহান হয়ে উঠবে, খুঁজতে বেরুবে নিখোঁজ সঙ্গীকে—তারপরই সর্বনাশের ষোলোকলা পূর্ণ হবে।

লুইস স্টিলম্যান বালিশে মাথা দিয়ে আবার শুয়ে পড়ল; বন্ধ করল চোখের পাতা। মাথার ওপরের রাস্তা দিয়ে ভেসে আসা চিৎকার, চেঁচামেচি, শিসের আওয়াজ ভুলে থাকার চেষ্টা করল।

একসময় ঘুমিয়ে পড়ল সে।

বিকেলটা লুইস কাটাল সুন্দরী মেয়েদের ছবি দেখে। ওর কাছে বেশ কয়েকটা ফ্যাশন ম্যাগাজিন আছে। পত্রিকা বোঝাই অপরূপ সব মডেলের রঙিন ছবি। সবগুলো মেয়েই স্লিম ফিগারের, দামি

পোশাক গায়ে, গায়ের রঙ কাঁচা সোনা, ঝলমল করছে। সযত্নে আঙুল বোলায় সে ছবিগুলোর ওপরে, যেন যাদুর পরশে সে মিশে যায় ওদের সঙ্গে। কিন্তু পরক্ষণে বুকের মধ্যে কষ্ট জেগে ওঠে। এত সুন্দর মেয়েদের কেউ বেঁচে নেই ভাবলেই বেদনাহত হয় সে। সে আর মডেল কন্যাদের নিয়ে ভাবতে চায় না, কীভাবে তারা মারা গেল সেই কথাও মনে করতে চায় না।

'সাহসের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে।' হাসল লুইস স্টিলম্যান, উঁচু করে ধরল মদের গ্লাসটা। ঘরটার রঙ টকটকে লাল। 'সাহসের প্রতি এবং যে মানুষটি সত্যিকারভাবে এই সাহস ধারণ করে তার উদ্দেশ্যে!' এক চুমুকে গ্লাসটা খালি করল সে, টেবিলের ওপর রাখা লম্বা বোতলটা থেকে ওটাতে দ্রুত পানীয় ভরল।

'আপনি আমার সঙ্গে যোগ দেবেন না, মি. এইচ?' টেবিলের ওপর মাথায় হাত রেখে জবুথুবু হয়ে বসা লোকটিকে জিজ্ঞেস করল সে। 'নাকি আমি একাই পান করব?'

লোকটা কোনও জবাব দিল না।

'ঠিক আছে, তা হলে...' গ্লাসটা আবারও শূন্য করল সে, নামিয়ে রাখল টেবিলে। আমি জানি একজন মানুষ কী কী করতে পারে। একাই সব কিছু করার ক্ষমতা তার রয়েছে। একাই রাবিশ দুনিয়াটাকে সে শায়েস্তা করতে পারে। একটা পাহাড়ের মত মাছকে কব্জা করার ক্ষমতাও সে রাখে, তাই না? আচ্ছা, পিতা এইচ, দুনিয়াটা যদি শুধু বড় বড় মাছে পূর্ণ থাকত তা হলে কী হত? তা হলে কি সবগুলোকে ধরতে পারত সে? একা, একজন মানুষ? অবশ্যই পারত না। না, স্যর। কখনওই সেটা তার পক্ষে সম্ভব হত না।'

উঠে দাঁড়াল স্টিলম্যান, একটা শেলফের দিকে এগোল। পাতলা একটা বই বের করল তাক থেকে।

'এই যে, এটা, মি. এইচ। আপনার সেরা রচনা, দ্য ওল্ডম্যান এণ্ড দ্য সী। আপনি জব্বর দেখিয়েছিলেন বিশাল সমুদ্রের বিরুদ্ধে

কী করে একা একজন মানুষ টিকে থাকে।' থামল সে। গলা টানটান এবং উচ্চকিত হয়ে উঠল। 'এখন, এখন আমাকে বলুন কী করে ওই সাগরের বিরুদ্ধে লড়াই করব আমি। আমার সমুদ্র খুনে মাছে ভরা। কিন্তু আমি একা, সম্পূর্ণ একা। কেউ সাহায্য করার নেই আমাকে। বলুন আমাকে। আমি শুনব।'

লোকটা কোনও জবাব দিল না। একভাবে বসে থাকল।

'আমার কথা শুনতে পাননি, পিতা? আসলে এই প্রশ্নের কোনও জবাব নেই, তাই না? শুধু সাহসেই সবকিছু হয় না। একা থাকা, একা যদ্ধ করার জন্য মানুষের জন্ম হয়নি—এমনকী একা মদ্যপান করার জন্যেও নয়। একা একা সে অনেক কিছুই করতে পারে, কিন্তু সেটা শেষ পর্যন্ত কোনও ফল বয়ে আনে না। আমি বলব এই চেষ্টা নিরর্থক। আপনার বই নিপাত যাক। সেই সঙ্গে আপনিও নিপাত যান!'

লুইস স্টিলম্যান বইটা সজোরে ছুঁড়ে মারল স্থির শরীরটার দিকে। লোকটা চেয়ার উল্টে পড়ে গেল; তার হাত দুটো পিছলে গেল টেবিল থেকে, শূন্যে দুলতে থাকল।

বাবার কথা লুইস স্টিলম্যানের আজ খুব মনে পড়ছে। মিসৌরির গ্রামে ঘুরে বেড়ানো, শিকার, ক্যাম্পফায়ার, গ্রীষ্মের সেই সজীব, সবুজ দিনগুলো, আহা! ওকে ঘিরে বাবার কত আশা ছিল, এখনও তাঁর গমগমে গলা যেন শুনতে পায় লুইস।

'বড় হয়ে তুমি ডাক্তার হবে, লুইস। মস্ত ডাক্তার। পড়াশোনা করো, কঠিন পরিশ্রম করো, অবশ্যই সাফল্য আসবে। আমি জানি তুমি পারবে।'

শীতের লম্বা সন্ধ্যাগুলো লুইস কাটাত তার বাবার স্টাডিরুমে। মেহগনি কাঠের বিরাট দেরাজ বোঝাই ছিল ডাক্তারি বই আর পত্রিকায়। সে ওখানে বসে নোট করত, পড়ত। একটা বইয়ের কথা ওর বেশ মনে আছে। সার্জারীর ওপর লেখা এরিকসনের

ঢাউস সাইজের তিনটে ভল্যুম। ভল্যুমগুলো বাঁধাই ছিল খুব শক্ত, সোনার জলে নাম লেখা। এই ভল্যুম তিনটে ওর খুব প্রিয় ছিল।

কিন্তু কী হতে কী হয়ে গেল! স্বপ্নের রঙ ক্রমশ ধূসর হয়ে উঠল, উজ্জ্বলতম লক্ষ্য গেল উবে। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে মেডিসিনের ওপর বছর খানেক পড়াশোনা করার পর সাবজেক্টটার প্রতি সে বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠে এবং কলেজ ছেড়ে এক কনস্ট্রাকশন কোম্পানিতে লেবারের কাজ নেয়। আর এই কাজটাই কিনা ওর জীবন বাঁচিয়েছে! সে শারীরিক পরিশ্রম করতে চয়েছে, চেয়েছে শক্ত কাজে হাতের পেশি শক্ত হয়ে উঠবে, ঘামে ভিজবে শরীর। প্রচুর টাকা আয় করে সে জোয়ানকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। তারপর হয়তো সে তার ডাক্তারী কোর্স শেষ করত। কিন্তু এখন সবকিছুই কত দূরের স্মৃতি মনে হয়।

পুরানো দিনের কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ বাসনা তীব্র হয়ে উঠল লুইসের মনে। ইচ্ছে করল এরিকসনের বইটা আবার দেখবে, ডুবে যাবে ওটার মধ্যে, সামান্য সময়ের জন্য হলেও শৈশবের আনন্দ আর সুখ ফিরে পেতে চায় সে।

হলিউডের পিকউইক স্টোরের তিনতলায় সে বইটার একটা ডুপ্লিকেট কপি দেখেছিল। ওরা ওই তলাটাকে আজেবাজে বইয়ের গুদামঘর হিসেবে ব্যবহার করত। লুইস ঠিক করল সে যাবে ওখানে, বইগুলো নিয়ে আসবে, রাখবে নিজের কাছে। জানে ইচ্ছেটা বিপজ্জনক এবং বোকার মত, কিন্তু কাজটা তাকে করতেই হবে। মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়েও সে ওই বইগুলোর সন্ধানে যাবে। আজ রাতেই।

লুইস স্টিলম্যানের ঘরের একটা কোনা বিভিন্ন অস্ত্রে বোঝাই। লস অ্যাঞ্জেলেস পুলিশ আরসেনাল থেকে জোগাড় করা একটা থম্পসন সাব মেশিনগানও রয়েছে গাদাটার মধ্যে। আছে দুটো অটোমেটিক রাইফেল, একটা ল্যুগার, সাইলেন্সার সহ .৪৫ এবং .২২ ক্যালিবারের হরনেট পিস্তল এবং একটা কোল্ট। এ ছাড়া

লুইস সব সময় বগলের নীচে স্প্রিং দিয়ে আটকানো হোলস্টারে ছোট একটা পিস্তল রাখে। তবে শহরে সে কখনোই ভারি অস্ত্র নিয়ে ঢোকে না। কিন্তু আজ রাতের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আলাদা।

ড্রেনটা শেষ হয়েছে হলিউডে, এখান থেকে মাইল দুয়েক দূরে। তার মানে বুকস্টোরে পৌঁছতে হলে তাকে অনেকক্ষণ এবং অনেকখানি পথ পাড়ি দিতে হবে। .৩০ ক্যালিবারের স্যাভেজ রাইফেলটা সঙ্গে নেবে, ঠিক করল লুইস।

তুমি একটা বোকা, লুইস, লেদার কেস থেকে রাইফেলটা বের করতে করতে নিজেকে তিরস্কার করল ও, সামান্য কয়েকটা বইয়ের জন্যে নিজের জীবন বিপন্ন করতে চলেছ। ওগুলো কি এতই গুরুত্বপূর্ণ? হ্যাঁ, ওর ভেতর থেকে কে যেন বলল, ওগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বইগুলো তোমার দরকার এবং ওগুলো তোমার পাওয়া চাই। যা তুমি চাও, ভয়ে যদি সেই চাওয়া থেকে সরে আসো, যদি ভয় তোমাকে অন্ধকারে ইঁদুরের মত গ্রাস করে তা হলে তো তুমি একটা কাপুরুষের চেয়েও খারাপ। তুমি একটা বিশ্বাসঘাতক, নিজের সঙ্গে এবং সভ্যতার সঙ্গে বিশ্বাসঘাকতা করছ। কোন মানুষ ভাল কিছু চাইলে অবশ্যই তার সেটা পাবার চেষ্টা করা উচিত, তাতে যতই ঝুঁকি থাক। কাপুরুষতা নিয়ে বেঁচে থাকার চাইতে সাহস নিয়ে মরে যাওয়া অনেক ভাল।

আহ, পিতা হেমিংওয়ে, শ্বাস টানল লুইস, নিজের উদ্ভট ভাবনা আর স্বপ্নের কথা মনে করে হাসছে। দেখতে পাচ্ছি তুমি আমার সঙ্গে রয়েছ। দেখতে পাচ্ছি তোমার লেখনি আমাকে উজ্জীবিত করে তুলছে। ঠিক আছে, তা হলে চলো যাই–মৎস্য শিকারে বেরিয়ে পড়ি? হয়তো সমুদ্র আজ শান্তই থাকবে...

ভারি রাইফেলটা এক কাঁধে ঝুলিয়ে লুইস স্টিলম্যান যাত্রা শুরু করল।

রাতের ঠাণ্ডা বাতাস ওকে ছুঁয়ে যাচ্ছে, দৌড়াচ্ছে লুইস। একে একে সে ছাড়িয়ে গেল সান্তামোনিকা বুলেভার্ড, হাইল্যাণ্ড, তারপর

হলিউড বুলেভার্ড, সবশেষে–যখন ক্লান্তির চরমে পৌঁছেছে লুইস, ওই সময় পৌঁছে গেল বুকস্টোরের কাছে।

পিকউইক।

কাঁধে রাইফেল, হাতে চকচকে অটোমেটিক নিয়ে নিঃশব্দে এগোল সে স্টোরের দিকে।

কাগজপত্রের একটা এলোমেলো দৃশ্য চোখে পড়ল। জানালার ফাঁক দিয়ে ঢোকা চাঁদের আলোয় লুইস দেখল সমস্ত মেঝে জুড়ে শুধু ছেঁড়া বই আর বই। শিউরে উঠল লুইস; কল্পনায় দৃশ্যটা দেখল সে–ওরা বইয়ের শেলফগুলো ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিচ্ছে, ছুঁড়ে ফেলছে দামি বইগুলো, পৃষ্ঠা ছিঁড়ছে। আর অনবরত ধ্বংসের আনন্দে পৈশাচিক উল্লাস করে চলেছে।

অন্য ফ্লোরগুলোর কী অবস্থা? মেডিকেল সেকশন?

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করল লুইস। বইয়ের ছেঁড়া পৃষ্ঠাগুলো শরতের ঝরা পাতার মত খচখচ করে উঠল পায়ের নীচে। সে দ্রুত তিনতলায় উঠে এল। বুক কাঁপছে আশঙ্কায়, না জানি আবার কী দেখতে হয়।

এই তলার বইপত্রগুলো অক্ষত অবস্থায় আছে। হয়তো ওরা এখানে আসার আগে বই নষ্ট করার বিধ্বংসী খেলায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তাই এগুলোর ওপর হামলা চালায়নি।

রাইফেলটা কাঁধ থেকে নামাল লুইস, রাখল সিঁড়িতে। চারদিকে ধুলো। সরু একটা প্যাসেজ ধরে এগোল সে। বাতাসে বাসি একটা গন্ধ।

'মেডিকেল সেকশন,' হাতে লেখা সাইনবোর্ডটার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল লুইস স্টিলম্যান। যা ভেবেছে, এখানকার অবস্থা ঠিক তাই। একহাতে ছোট অটোমেটিকটা ধরে অন্য হাতে ওটার গায়ে একটা দেশলাই ঠুকল সে। জ্বলে উঠল আগুন, আলোটা যাতে না নেভে সেজন্যে দু'হাতে দেশলাইটাকে আড়াল করল সে, তাকের বইগুলোর ম্লান টাইটেলগুলো পড়তে শুরু করল।

কারটার...ডেভিডসন...এনরাইট... এরিকসন। দম যেন বন্ধ হয়ে এল লুইসের। তিনটে ভল্যুমই আছে এখানে, ধুলো জমেছে কিন্তু তারপরও প্রায় স্পষ্ট পড়া গেল সোনার জলে লেখা নাম।

অন্ধকারে, লুইস স্টিলম্যান সাবধানে সবগুলো ভল্যুম সরাল, ধুলো ঝাড়ল। যাক বাবা, শেষ পর্যন্ত কাজটা করতে পেরেছে সে। বইগুলো পেয়েছে লুইস। এখন এগুলোর মালিক সে একা।

হাসল লুইস, টেবিলে বসে আর এই সম্পদের ওপর চোখ বোলাচ্ছে, কল্পনার চোখে ফুটে উঠল দৃশ্যটা, ভারি তৃপ্তি বোধ করল সে।

স্টোরের পেছনে একটা খালি কার্টুন দেখতে পেল লুইস। বইগুলো ওটার মধ্যে ঢোকাল। ফিরে এল সিঁড়ির কাছে, রাইফেলটা আবার কাঁধে তুলে নিল, নামতে শুরু করল।

এখনও, নিজেকে বলল ও, ভাগ্য আমাকে সহায়তা করে চলেছে।

কিন্তু সিঁড়ির শেষ ধাপের লুইস স্টিলম্যানের পা স্পর্শ করামাত্র ভাগ্য ওর ওপর থেকে চোখ উল্টে নিল।

গোটা নীচতলা জুড়ে গিজগিজ করছে ওরা!

এক ঝাঁক পঙ্গপালের মত ছুটে এল ওর দিকে, আলো ছায়ার ভেতর ওদের চোখ চকচক করে উঠল, একসঙ্গে ধেয়ে এল সব ক'জন। ওর জন্যেই অপেক্ষা করছিল।

এখন বই আর কোন প্রয়োজনীয় বস্তু নয়। এখন একমাত্র প্রয়োজনীয় বস্তু তার জীবন, অন্য কিছু নয়। শক্ত কাঠের সিঁড়ির রেইলিঙে ভর দিয়ে পিছু হটল সে, হাত থেকে বইয়ের বাক্সটা পিছলে গেল। সিঁড়ির গোড়ায় এসে থমকে দাঁড়াল ওরা; সব ক'টা চুপ, তাকিয়ে আছে ওর দিকে, দৃষ্টিতে প্রবল ঘৃণা।

যদি আমি রাস্তায় পৌঁছুতে পারি, দ্রুত চিন্তা করছে লুইস, তা হলে বাঁচার আধাআধি একটা চান্স থাকবে। কিন্তু তা হলে ওকে ওদের ডিঙিয়ে দরজার কাছে পৌঁছতে হবে। ঠিক আছে, আমি তাই

করব, সিদ্ধান্ত নিল সে।

অটোমেটিকের ট্রিগার টানল লুইস। বুলেটের আঘাতে ওদের দু'জন ছিটকে পড়ল মাটিতে। একই সঙ্গে দৌড় দিল লুইস।

শার্টে ধারাল নখের আঁচড় অনুভব করল লুইস, জামাটা ফড়ফড় করে ছিঁড়ে ওদের হাতে রয়ে গেল খানিকটা। দৌড়াতে দৌড়াতে গুলি ছুঁড়তে লাগল লুইস, আরও তিনজন ধরাশায়ী হলো, ব্যথা এবং বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠল। অন্যরা চেঁচাতে চেঁচাতে দরজার সামনে থেকে সরে দাঁড়াল।

পিস্তলে গুলি নেই। লুইস ওটাকে ছুঁড়ে ফেলল, এক ঝটকায় কাঁধ থেকে স্যাভেজ রাইফেলটা নামাল। রাস্তায় পৌঁছে গেছে ও। রাতের ঠাণ্ডা বাতাস মুহূর্তের জন্য ওর ভেতর উদ্দীপনা যোগাল।

আমি বাঁচতে পারব, ভাবল লুইস। ফুটপাথ দিয়ে দৌড়াতে শুরু করল। গুলির শব্দ যদি অন্যেরা না শোনে তা হলে আমি আমার গন্তব্যে পৌঁছুতে পারব। আমার পা যথেষ্ট সবল। সহজেই ওদের পেছনে ফেলে দেব।

কিন্তু লুইসের প্রতি ভাগ্য আজ রাতে একেবারেই বিরূপ। হলিউড বুলেভার্ড এবং হাইল্যাণ্ডের সঙ্গমস্থলে যেন ভূতের মত উদয় হলো ওরা। ধাওয়া করল ওকে।

এক হাঁটু গেড়ে লক্ষস্থির করল লুইস, গর্জে উঠল রাইফেল, ওর হাতে ঝাঁকি খেতে লাগল অস্ত্রটা। মুহূর্তে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল দলটা।

হলিউড বুলেভার্ডের মাঝ রাস্তা দিয়ে আবার দৌড়াতে শুরু করল লুইস। ভারি রাইফেলটার বাঁট দিয়ে ব্যাটের মত আঘাত করে ফেলে দিতে লাগল যেটা কাছে এল সেটাকেই। হাইল্যাণ্ডের কাছে ও পৌঁছেছে, এই সময় তিনজনের একটা দল ওর পথ রোধ করে দাঁড়াল। গুলি করল লুইস। দুটো মারা গেলেও একটা হিংস্র আক্রোশে ছুটে এল ওর দিকে। কিন্তু ওটাকেও চোখের পলকে মেরে ফেলল লুইস।

লুইসের সামনের রাস্তা এখন পরিষ্কার। এখন বাঁচা মরা নির্ভর করবে ওর পায়ের ওপর। দুই মাইল। ওর পা দুটো কি পারবে এই দুই মাইল পথ তাকে টেনে নিয়ে যেতে? আবারও কোন আক্রমণ আসার আগে?

দৌড়াতে দৌড়াতে রাইফেল রিলোড করে গুলি করতে লাগল লুইস। এর ছেঁড়া শার্টে ঘামের বন্যা, মুখে ঘামের নদী, ভুরু বেয়ে চোখে পড়ছে, ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে দৃষ্টি। এক মাইল পথ অতিক্রম করল সে। আর অর্ধেক পথ বাকি। ওরা অনেক পেছনে পড়ে আছে।

কিন্তু ওদের সংখ্যাটা ক্রমশ বাড়ছে। গলি, স্টোর, বাড়ি সব জায়গা দিয়ে পিলপিল করে বেরুচ্ছে।

ফুসফুস ফেটে যেতে চাইছে লুইসের, ফুরিয়ে আসছে দম। ওদের কি শেষ নেই? একশো? দুইশো? আরও আসছে। ঈশ্বর!

ঠোঁট কামড়ে রক্ত বের করে ফেলল লুইস। পারবে না, তুমি ওদের সঙ্গে দৌড়ে পারবে না, কে যেন ভেতর থেকে চিৎকার করে বলছে ওকে। সামনের ব্লকেই তুমি ওদের হাতে ধরা পড়ে যাবে, তুমি জানো!

রাইফেলটা কাঁধে ফিট করল লুইস, স্থির করল লক্ষ্য, ট্রিগার টানল। রাতের নিস্তব্ধতা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল একের পর এক গুলির আওয়াজে। বারবার গুলি করল ও, রাইফেলের বাঁট ঢুকে গেল মাংসে, পাউডারের পোড়া গন্ধ নাকে এসে লাগল।

কোনও লাভ নেই। ওদের শেষ নেই। পারবে না সে সবাইকে শেষ করতে।

লুইস স্টিলম্যান উপলব্ধি করল, মারা যাচ্ছে সে। রাইফেলের গুলি একসময় শেষ হয়ে গেল, শেষ বুলেটটাও ছুটে গেল শত্রুপক্ষের দিকে। কিন্তু সংখ্যায় ওরা আগের মতই থাকল।

দৌড়ে পালাবার উপায় নেই লুইস স্টিলম্যানের। কারণ চারদিক থেকে তাকে ঘিরে ফেলেছে ওরা, বৃত্ত রচনা করে এগিয়ে

আসছে।

ছোট, নির্দয় মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে লুইস ভাবল: ভিনগ্রহবাসীরা তাদের উদ্দেশ্য ঠিকই সফল করে ফিরে গেছে—পৃথিবীর মানুষ মহাশূন্য জয় করার আগে, অন্য গ্রহের জন্যে হুমকি হওয়ার আগেই তারা ধরিত্রীকে স্থবির করে দিয়ে গেছে। কী সাংঘাতিক ধূর্ত পরিকল্পনা ছিল ওদের! পৃথিবীর সকল নারী-পুরুষকে হত্যা করেছে ওরা। শুধু বাঁচিয়ে রেখেছে ছয় বছরের নীচে যাদের বয়স সেইসব শিশুকে। যেভাবে দ্রুত এসেছিল, কাজ সেরে তেমনি দ্রুত চলে গেছে তারা আমাদের সভ্যতাকে আদিম যুগে ফিরিয়ে দিয়ে। যাওয়ার আগে সন্তুষ্ট হয়ে জেনেছে পৃথিবীর মেরুদণ্ড তারা ভেঙে দিয়েছে, যারা বেঁচে আছে, এই খুদে বাচ্চারা, ওরা যখন বড় হবে তখন প্রত্যেকে মনমানসিকতায় বুনো হয়ে উঠবে, হিংস্রতাই হবে ওদের বেঁচে থাকার একমাত্র অনুভূতি।

লুইস স্টিলম্যান খালি রাইফেলটা ফেলে দিল মাটিতে, হাত তুলল। 'শোনো,' মিনতি করল সে। 'আমি তোমাদেরই একজন। বড় হয়ে তোমরা আমার মতই হবে। শোনো, দয়া করে, আমার কথা শোনো।'

কেউ ওর কথা শুনল না, নিষ্ঠুর চেহারায় কোন ভাব ফুটল না। বৃত্তটা ঘন হয়ে এল ওর দিকে। কাছে, আরও কাছে।

মূল: উইলিয়াম এফ. নোলান
রূপান্তর: অনীশ দাস অপু

বিষ্ণুর চিহ্ন

লেখক পরিচিত

খুশবন্ত সিং ভারতের সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখক এবং সাংবাদিক। প্রথম উপন্যাস 'ট্রেন টু পাকিস্তান' লিখেই তিনি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেন। তারপর অসংখ্য ছোট গল্প এবং সমসাময়িক বিষয়ে প্রচুর বই লিখেছেন। এর মধ্যে রয়েছে ইন্দিরা গান্ধি রিটার্নস এবং ট্রাজেডি অভ পাঞ্জাব। তিনি জোকসের ওপর দুটো বই লিখেছেন, যা পেয়েছে বেস্ট সেলারের মর্যাদা। ১৯৬৯ সালে দ্য ইলাস্ট্রেটেড উইকলি অভ ইণ্ডিয়ায় সম্পাদক হিসেবে যোগ দিয়ে পত্রিকাটির সার্কুলেশন বাড়িয়ে তোলেন বহুগুণ। তারপর নিউদিল্লী সাময়িকী এবং দ্য হিন্দুস্তান টাইমস-এ সম্পাদকের পদ অলংকৃত করেছেন। তাঁর লেখা দ্য মার্ক অভ বিষ্ণু তাঁকে ছোট গল্পের লেখক হিসেবে পরিচিত করে তোলে। লণ্ডনে ১৯৫০ সালে 'দ্য মার্ক অভ বিষ্ণু অ্যাণ্ড অস্কার স্টোরিজ' নামে গল্প সংকলনটি বের হওয়ার পর থেকে তাঁর কলম আর থেমে থাকেনি। আজও লিখে চলেছেন নিরন্তর।

'এটা কালনাগের জন্য,' একটা প্লেটে দুধ ঢালতে ঢালতে বলল গঙ্গারাম। 'প্রতি রাতে দেয়ালের কাছের গর্তের সামনে আমি দুধটা রেখে আসি। সকাল বেলায় দেখি পিরিচে দুধ নেই।'

'বোধহয় বেড়ালে খেয়ে যায়,' আমরা, কিশোররা বলি।

'বেড়াল!' মুখ বাঁকায় গঙ্গারাম। 'কোনও বেড়ালের গর্তের ধারে যাবার সাহস নেই। কালনাগ থাকে ওখানে। ওকে যতদিন দুধ

খাওয়াব ও ততদিন বাড়ির কাউকে কামড়াবে না। খালি পায়ে তোমরা ওখানে যেতে পারো, খেলতে পারো।'

'তুমি একটা বোকা ব্রাহ্মণ,' বলি আমি। 'জানো না সাপ দুধ খায় না? বিশেষ করে প্রতিদিন তো এক প্লেট করে দুধ খাওয়ার প্রশ্নই নেই। স্যর বলেছেন সাপ অনেক দিন না খেয়ে থাকতে প্যারে। সেদিন একটা ঢোঁড়া সাপকে ব্যাঙ খেতে দেখেছি। গিলতে পারেনি। গলার কাছে ঠেকে ছিল। কয়েকদিন সময় লেগেছে গিলতে। মেথিলেটেড স্পিরিটের মধ্যে, ল্যাবে আমরা এরকম সাপ ডুবিয়ে রাখি। গতমাসে আর এক সাপুড়ের কাছ থেকে দু'মুখো একটা সাপ কিনে এনে আমাদের দেখিয়েছেন। ল্যাবের একটা বোতলও খালি ছিল না বলে রাসেলস ভাইপারের জারে ওটা রাখেন তিনি। তারপর যা মজা হলো। জারের মধ্যে যেন ঝড় বয়ে যেতে লাগল। বড় সাপটা টুকরো টুকরো করে ফেলল রাসেলস ভাইপারটাকে।'

গঙ্গারাম আঁতকে উঠে বুজে ফেলল চোখ। 'এ জন্য তোমাদেরকে একদিন ভুগতে হবে। অবশ্যই ভুগবে।'

গঙ্গারামের সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই। সে অনেক হিন্দুর মত ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিবের পরম ভক্ত। এদের মধ্যে বিষ্ণুর প্রতি তার ভক্তি সবচেয়ে বেশি। প্রতিদিন সকালে সে চন্দন কাঠ জলে গুলে কপালে ইংরেজি 'ভি' অক্ষরের মত তিলক কাটে। ব্রাহ্মণ হলেও সে অশিক্ষিত, কুসংস্কারে ভরা মন। তার কাছে সকলের জীবন পবিত্র। সে সাপ, বিছে আর কেন্নো হোক। আমরা এগুলো দেখতে পেলেই মেরে ফেলি। আর গঙ্গারাম ওগুলোর কোনটাকে রাস্তায় বা মাঠে পড়ে থাকতে দেখলে দ্রুত নিরাপদ স্থানে সরিয়ে রাখে যাতে আমাদের চোখে না পড়ে। ব্যাডমিন্টন র‍্যাকেটের বাড়ি মেরে আমরা সোৎসাহে ভিমরুল কিংবা বোলতা আহত করি। আর গঙ্গারাম আহত বোলতার পাখা জোড়া লাগানোর চেষ্টা করতে গিয়ে হুলের দংশন খায়। তবু তার বিশ্বাস বিন্দুমাত্র টলে না। যে প্রাণী

যত বেশি বিপজ্জনক, তার প্রতি গঙ্গরামের শ্রদ্ধা তত বেশি। আর সাপের মধ্যে সে সবচেয়ে বেশি ভক্তি করে গোখরা অর্থাৎ তার কাল নাগকে।

'তোমার কালনাগকে দেখতে পেলেই মেরে ফেলব,' বলি আমরা।

'তোমাদেরকে অমন কাজ করতেই দেব না। ও শখানেক ডিম পেড়েছে। কালনাগকে মেরে ফেললে সবগুলো ডিম ফুটে গোখরা বেরিয়ে এসে ভরিয়ে ফেলবে বাড়িঘর। তখন কী করবে?'

'ওগুলোকে জ্যান্ত ধরে বোম্বে পাঠিয়ে দেব। ওগুলোকে দুধ দুইয়ে ওরা সাপে কাটার ওষুধ বানাবে। একটা জ্যান্ত গোখরা সাপের জন্য ওরা দুই রূপী দেয়। তারমানে দুশো রূপী পাব আমরা।'

'আমি কোনদিন শুনিনি সাপের দুধ হয়। দেখিওনি। তবে সাবধান, এটার গায়ে হাত দিতে যেয়ো না। এটা ফণিহার-ফণা আছে। আমি দেখেছি। তিন হাত লম্বা। লেজ থেকে মস্ত ফণা পর্যন্ত।' হাতের তালু মেলে ফণার আকার দেখায় গঙ্গারাম। 'মাঠে ওকে রোদ পোহাতে দেখবে।'

'তুমি আমাদের সঙ্গে মিথ্যা কথা বলছ। পুরুষ সাপের ফণা থাকে। কাজেই একশো ডিম পাড়ার প্রশ্নই ওঠে না। তুমিই নির্ঘাত ডিমগুলো পেড়েছ।'

অট্টহাসিতে ফেটে পড়ি আমরা।

'ওগুলো অবশ্যই গঙ্গরাজের পাড়া ডিম। আমরা শীঘ্রি একশো গঙ্গারাম পেতে চলেছি।'

গঙ্গারামকে নিয়ে তামাশা শুরু করে দিলাম। চাকরবাকরদের নিয়ে তামাশা করতে মজাই লাগে। তবে আমাদের ঠাট্টা-মশকরা তেমন গায়ে মাখে না গঙ্গারাম। সে আছে তার প্রবল বিশ্বাস নিয়ে। সাপ মাটির পৃথিবীতে ঈশ্বরের সবচেয়ে নিকৃষ্ট সৃষ্টি বলেই সে তাদেরকে খেতে দেয়, রক্ষা করে। তার মতে, সাপকে হত্যা না

করে ভালবাসতে পারলে সাপও তোমাকে ভালবাসবে। তাই সে প্রতি রাতে গর্তের সামনে দুধের পিরিচ রেখে আসে। পরদিন সকালে দেখে পিরিচ থেকে দুধ অদৃশ্য।

একদিন আমরা কালনাগকে দেখতে পেলাম। বর্ষা শুরু হয়েছে। অঝোরে ঝরছে বৃষ্টি। সারারাত ধরে বৃষ্টি। সূর্য তাপে ফেটে যাওয়া মাটি যেন জীবন ফিরে পেল। ছোট ছোট ডোবায় মনের সুখে ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ কোরাস শুরু করে দিল ব্যাঙের দল। কর্দমাক্ত মাটিতে কিলবিল করে হেঁটে বেড়াতে লাগল কেঁচো আর কেন্নো। সবুজ ঘাসে ছেয়ে গেল মাঠ, চকচক করতে লাগল কলাগাছের সবুজ পাতা। বৃষ্টি জলে ভরে গেল কালনাগের আস্তানা। গর্ত ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল সে। খোলা মাঠে চলে এল। রোদ পড়ে ঝিলিক দিচ্ছে তার কালো ফণা। বেশ বড় সে–লম্বায় প্রায় ছয় ফুট, আমার কব্জির সমান মোটা। 'রাজ গোক্ষুরের মত দেখাচ্ছে ওটাকে। চলো সাপটাকে ধরি।' কালনাগ ছুটে পালাবার সুযোগ পেল না। মাটি পিচ্ছিল, তা ছাড়া ইঁদুরের গর্তগুলো বৃষ্টির জলে সব ভরাট হয়ে আছে। গঙ্গারামের কাছ থেকে কোন সাহায্য পেল না কাল নাগ। বাড়িতে নেই সে।

উঠোন ভর্তি কাদা। কালনাগ গড়িয়ে গড়িয়ে চলল। তবে পাঁচ হাত দূরেও যেতে পারেনি, দড়াম করে একটা লাঠি আছড়ে পড়ল তার শরীরের মাঝখানে, ভেঙে দিল পিঠ। তারপর একের পর এক লাঠির বাড়িতে অল্পক্ষণের মধ্যে সাদা-কালো জেলির একটা পিণ্ডে পরিণত হলো সে, রক্তাক্ত এবং কর্দমাক্ত। তবে মাথাটা এখনও অক্ষত।

'ফণায় মেরো না,' আমাদের একজন চেঁচিয়ে উঠল। 'কালনাগকে স্কুলে নিয়ে যাব।'

সাপটার পেটের মধ্যে একটা লাঠি ঢুকিয়ে মাটি থেকে তুলে ফেললাম। বড় একটা বিস্কিটের টিনের মধ্যে ঢোকালাম, টিন বেঁধে ফেললাম রশি দিয়ে। বিছানার নীচে লুকিয়ে রাখলাম।

রাতের বেলা গঙ্গারামের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম কখন সে কালনাগের জন্য দুধ নিয়ে যায় দেখতে। 'আজ কালনাগের জন্য দুধ নেবে না?'

'হ্যাঁ,' বিরক্ত গলায় জবাব দিল গঙ্গারাম। 'তুমি ঘুমাতে যাও।'

'ওর আর দুধ খাওয়ার দরকার হবে না।'

ভুরু কুঁচকে গেল গঙ্গারামের। 'কেন?'

'না, এমনি বললাম। পুকুরে এত ব্যাঙ। কালনাগ দুধের চেয়ে ওগুলো বেশি পছন্দ করবে।'

পরদিন গঙ্গারাম দুধের পিরিচ নিয়ে এল। পিরিচ ভর্তি দুধ। গঙ্গারামকে বিমর্ষ লাগল। একই সঙ্গে সন্দেহ ঝিলিক দিচ্ছে চোখে।

'তোমাকে তো বললামই সাপ দুধের চেয়ে ব্যাঙ খেতে বেশি ভালবাসে।'

আমরা জামা-কাপড় পরলাম, নাস্তা খেলাম। সারাক্ষণ গঙ্গারাম আমাদের পাশে ঘুরঘুর করতে লাগল। স্কুল বাস এলে বিস্কিটের টিন নিয়ে উঠে পড়লাম গাড়িতে। ছেড়ে দিল বাস। গঙ্গরামকে বিস্কিটের টিন দেখালাম।

'এই যে তোমার কালনাগ। বাক্সের মধ্যে নিরাপদে আছে। ওকে স্পিরিটের মধ্যে চুবিয়ে রাখব।'

নির্বাক গঙ্গারাম। তাকিয়ে রইল চলে যাওয়া বাসের দিকে।

স্কুলে দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হলো। আমরা চার ভাই। সবাই জানে আমরা বদের হাড্ডি। ব্যাপারটা আবার প্রমাণ করলাম।

'রাজ গোক্ষুর।'

'ছয় ফুট লম্বা।'

'ফণিহার।'

বিস্কিটের টিন বিজ্ঞান স্যারের কাছে দেয়া হলো।

টিনটা সারের টেবিলে। অপেক্ষা করছি উনি কখন ওটা খুলবেন এবং আমাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠবেন। স্যর ব্যস্ততার ভান

করে টিনের দিকে তাকালেন না। তারপর অনেকটা অন্যমনস্কতার ভঙ্গিতে একজোড়া ফরসেপ আর একটা কাঁচের জার টেবিলে রাখলেন। ওটার ভেতরে একটা কেউটে, মেথিলেটেড স্পিরিটে ড়োবানো। বিজ্ঞান স্যর গুনগুন করতে করতে টিনের বাক্সের রশি খুলতে লাগলেন।

রশি আলগা হয়ে যেতেই শূন্যে ছিটকে গেল ঢাকনা, একটুর জন্য বিজ্ঞান সারের নাকে বাড়ি খেল না কালনাগ। অঙ্গারের মত জ্বলছে চোখ। অক্ষত ফণা মেলে ধরা। হিস্‌হিস্‌ করে উঠল সে, ছোবল দিল সারের মুখ লক্ষ্য করে। সার চট করে মাথা সরিয়ে নিলেন এবং তাল সামলাতে না পেরে চেয়ার উল্টে পড়ে গেলেন। মেঝেতে শুয়ে রইলেন তিনি, আতঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন সাপটার দিকে, নড়তে ভুলে গেছেন। ছাত্ররা ডেস্কের উপর দাঁড়িয়ে তারস্বরে চিৎকার করতে লাগল।

কালনাগ রক্ত লাল চোখ মেলে দৃশ্যটা দেখল। চেরা জিভ মুখ থেকে ঘন ঘন বেরোচ্ছে আর ভেতরে ঢুকছে। থুথু ছিটাল সে। তারপর পালাবার চেষ্টা করল। টিন থেকে মেঝেতে নেমে পড়ল কালনাগ শব্দ করে। পিঠের কয়েক জায়গা ভেঙে গেছে, যন্ত্রণাকাতর শরীরটাকে মেঝের উপর দিয়ে টেনে টেনে নিয়ে চলল। দোরগোড়ায় পৌঁছে আবার ফণা তুলল নতুন কোন বিপদের মোকাবেলা করার জন্য।

ক্লাসরুমের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে গঙ্গারাম। হাতে একটা পিরিচ আর জগভর্তি দুধ। কালনাগকে দেখে হাঁটু গেড়ে বসল সে। পিরিচে দুধ ঢেলে ওটা দোরগোড়ায় রাখল। প্রণামের ভঙ্গিতে হাত জড়ো করে মাথা ঠেকাল মাটিতে। মানুষের নিষ্ঠুরতার জন্য ক্ষমা চাইছে। প্রচণ্ড ক্রোধে হিসিয়ে উঠল গোক্ষুর, থুতু ছিটাল। তারপর প্রবল আক্রোশে কয়েকবার ছোবল মারল গঙ্গারামকে। শেষে একটা গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়ল, চলে গেল দৃষ্টিসীমার বাইরে।

গঙ্গারাম হাত দিয়ে মুখ ঢেকে পড়ে আছে মাটিতে। গোঙাচ্ছে।

বিষ তাকে তাৎক্ষণিকভাবে অন্ধ করে দিয়েছে। কয়েক মিনিটের মধ্যে তার শরীর নীল হয়ে গেল; ফেনা বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে। ওর কপালে রক্তের ফোঁটা। শিক্ষক রুমাল দিয়ে মুছে দিলেন রক্ত। কালনাগ কপালের যেখানটাতে ছোবল মেরেছে সেখানে ইংরেজি ভি অক্ষরের মত দাগ ফুটে উঠেছে-বিষ্ণুর চিহ্ন।

মূলঃ খুশবন্ত সিং
রূপান্তরঃ অনীশ দাস অপু

সাক্ষী

কেসটা সাধারণ। বৃদ্ধা মিসেস অ্যাগনেস থমসন গভীর রাতে রাস্তা পার হতে গিয়ে মার্সিডিজ বেনজ গাড়ির ধাক্কায় মারা যান। সাক্ষীর কাঠগড়ায় হেনরি ব্যাবকক। এক হতভাগ্য নাগরিক। ওকে এবার জবাই করা হবে।

নাওমি শ্যান তার স্বামীর জেরা শুনছে আজ মি. জাস্টিস ডাটনের বিচারালয়ে বসে। কামরায় বেশ অনেক লোক। একদিকে অভিযুক্ত আসামী মি. জেরোম–তার স্বামীর মক্কেল। অন্যদিকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় হেনরি ব্যাবকক। পুলিশ ঘটনাটাকে এমনভাবে সাজিয়েছে, কোটিপতির উচ্ছৃঙ্খল ছেলে জেরোম বেকসুর খালাস নাও পেতে পারে।

জেরোমের বাবা কিন্তু নিশ্চিন্ত। জানে একটা আঁচড়ও লাগবে না তার ছেলের গায়ে। নাওমি শ্যানও তা জানে। সামনের ওই সুদর্শন লোকটি তার স্বামী আরনল্ড শ্যান। ও একজন প্রথম সারির ব্যারিস্টারই শুধু নয়, অ্যাগন থিয়েটারের একজন নায়কও। অভিনেতা হিসেবেও এক নম্বর। গলা কখনও ভারি, কখনও সহানুভূতিতে নরম, কখনও বা শ্লেষে পূর্ণ। চোখে মনস্তত্ত্ববিদের প্রখর তীক্ষ্ণতা। এক বিরাট গম্ভীর ব্যক্তিত্ব নিয়ে একবার সে জজের দিকে তাকাচ্ছে আবার ফিরে যাচ্ছে সাক্ষীর টেবিলের কাছে। তাকাচ্ছে কোর্টের দর্শকদের দিকে। তারপর আবার জজের দিকে তাকিয়ে আবেগপূর্ণ গলায় বলছে, 'ইওর অনার...'

নাওমি শ্যান শুধু একটি কথাই ভাবছে। এটা সাধারণ হত্যা বা

দলাদলি করে খুন নয়, কিংবা ঠাণ্ডা মাথায় খুনও নয়। বৃদ্ধা অ্যাগনেস তো মারা গেছে অ্যাক্সিডেন্টে, আর একটু বাদে যুক্তিতর্কের বেড়াজালে গলা টিপে মারা হবে এক নিরীহ নাগরিকের সত্যবাদিতাকে। অ্যাগনেসকে কবর দেয়া হয়েছিল মৃত্যুর পর। আর এই নিরীহ সাক্ষীকে কবরে যেতে হবে মারা যাবার আগেই। পার্থক্য শুধু এইটুকুই।

ঘোরলাগা চোখে স্বামীর দিকে তাকিয়ে আছে নাওমি শ্যান। পঁচিশ বছরে আগের তুলনায় স্বামীর চেহারায় ব্যক্তিত্ব আর পৌরুষের ঝিলিক যেন অনেক বেশি। সেই সঙ্গে বেড়েছে আত্মবিশ্বাস, পশার আর গুণগ্রাহীদের করতালি। আরেকটি জিনিসও সে লাভ করেছে–তা হলো স্ত্রীর অপরিসীম ঘৃণা!

এই তো আজ সকালেই বলল আরনল্ড, ভয়ঙ্কর সেই সত্যি কথাটা। নাওমির কানে বাজছে, 'আমি নিষ্ঠুর নই, নাওমি। বলতে পারো একজন খাঁটি মানুষ। সহজেই আমি তোমাকে ফাঁকি দিতে পারতাম। বলতে পারতাম, আমি তোমাকে খুব ভালবাসি। আমার প্রেমে কোনও খাদ নেই। কিন্তু মিথ্যে আমি বলব কেন? আসলে আমি কোনওদিনই ভালবাসিনি তোমাকে। আমার জীবনে আরেকটি মেয়ে আছে, তাকে আমি সত্যিই ভালবাসি।'

তন্ময় হয়ে শুনছে নাওমি। মনের গোপন চিন্তাটা হঠাৎ দূর থেকে ছুটে এসে আঘাত করছে মস্তিষ্কে। শুনতে পাচ্ছে আরনল্ডের গলা। বাদী-প্রতিবাদীর যুক্তি-তর্কের জাল ছড়ানো আর গোটানো এ নয়। এ এক সংসারের বাস্তব চিত্র। স্বামী আর স্ত্রীর মধুর দাম্পত্য কথা নয়। জীবনকে ভোগ করার সব উপকরণই টাকা দিয়ে কেনা যায়। কিন্তু প্রেম? প্রেমহীন জীবনে বাইরের পোশাকটা ঝলমলে হলেও তা ভেতরে বিবর্ণ, মলিন। সীমাহীন বিত্ত বৈভবের মাঝে নিঃস্ব এক নারী নাওমি শ্যান।

ভাবনার সুতো ছিঁড়ে গেল আরনল্ডের গলার স্বরে। সমস্ত বিচার কক্ষে যেন সেই একমাত্র মানুষ। সাক্ষীর দিকে আঙুল তুলে বলল,

'মি. ব্যাবকক, সাক্ষী হিসেবে শপথ নেয়ার পর আপনি বলছেন, আমার মক্কেলের গাড়ি ট্রাফিক সিগন্যাল অমান্য করে ছুটতে গিয়েই মিসেস অ্যাগনেসকে ধাক্কা মারে। ফলে সঙ্গে সঙ্গেই তার মৃত্যু হয়। মিসেস অ্যাগনেসকে চাপা দিয়ে প্রায় পঞ্চাশ গজ এগিয়ে গিয়েছিল আমার মক্কেলের গাড়ি। আবার গাড়ি নিয়েই সে পিছিয়ে এসে মৃত মিসেস অ্যাগনেসের পাশে দাঁড়ায়। এরপর সে গাড়ি থেকে নামে, আবার দ্রুত গাড়িতে উঠে ঝড়ের বেগে...'

'না, নাওমি, আমি তোমাকে ঠকাইনি। আমি অতি সজ্জন ব্যক্তি। তাই সত্যি করেই বলছি আমি তোমাকে কখনও ভালবাসিনি। অন্তত একজন পুরুষ একজন মেয়েকে যেরকম ভালবাসা দেয় তা আমি তোমাকে দিতে পারিনি। তোমার বাবার বিপুল প্রতিপত্তিটুকুর ভারি দরকার ছিল আমার। জীবনে প্রতিষ্ঠা চেয়েছিলাম, পেয়েছিও, তোমার বাবার সহযোগিতায়। তোমাকে বিয়ে না করলে এসব সম্ভব হত না। বুঝতেই পারছ, বাধ্য হই। একেবারে বাধ্য হয়েই তোমাকে...' আবার তলিয়ে গিয়েছিল নাওমি চিন্তার গভীরে। কিন্তু চিন্তায় ডুবে যেতে তো সে চায় না। এই আদালত কক্ষে সে এসেছে সত্যকে কীভাবে হত্যা করা হয় তাই দেখতে।

হেনরি ব্যাবকককে উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে। রোগা মানুষ। চোখে চশমা। কাঁচদুটো যেন ম্যাগনিফাইং গ্লাস। সমস্যার ভারে নুয়ে পড়া লোকটাকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় ঠিক প্যাঁচার মত লাগছে। আরনল্ডের বয়সী হবে লোকটা, ভাবল নাওমি। চেহারা, পোশাক, সবকিছুতেই দাঁত বের করা দারিদ্র। শুধু বেঁচে থাকার তাগিদে যেন লড়ে যাচ্ছে।

আর ওই আরনল্ড, বিচার কক্ষের মূর্তিমান বিভীষিকা। চাল-চলন পোশাক-আশাকে ঐশ্বর্য আর আভিজাত্যের বিপুল গৌরব। আরনল্ডের আকর্ষণীয় গম্ভীর গলা শোনা গেল, 'আর আপনি ওই সময় ফুটপাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন?'

'না, ঠিক দাঁড়িয়ে ছিলাম না,' সাক্ষী ব্যাবকক বলল। 'বাস স্টপের বেঞ্চে বসে আমি তখন বাসের জন্য অপেক্ষা করছিলাম।'

'অ্যাকসিডেন্টের জায়গা থেকে ওই বেঞ্চটার দূরত্ব কতটা ছিল?'

একটু ইতস্তত করল ব্যাবকক। 'সঠিক বলা কঠিন, তবে বেশি দূরে ছিল না।'

'বেশি দূরে নয়, না?' হাসল আরনল্ড। ওই হাসিটা চেনে নাওমি। সাক্ষাৎ শয়তান হয়ে উঠলেই ওইভাবে হাসে সে। 'আপনার উত্তরে কি সন্তুষ্ট হবে জুরিরা? কতটা দূরত্ব ছিল তার খানিকটা তো জানা চাই।' সারা বিচার কক্ষে নজর বোলাল সে। 'আচ্ছা, ধরুন, সাক্ষীর চেয়ার থেকে আসামীর চেয়ার পর্যন্ত যতখানি দূরত্ব হবে–ঠিক ততটা?'

'অত সঠিকভাবে বলতে পারব না।'

'হ্যাঁ কি না? যে কোনও একটা বলুন, মি. ব্যাবকক।' চাবুকের মত আওয়াজ করল প্রশ্নটা।

'বেশ। হ্যাঁ। হ্যাঁ,' কেঁপে উঠল ব্যাবককের গলা।

'তা হলে আপনার ওই সাক্ষীর চেয়ার থেকে আসামীর চেয়ারের যে দূরত্ব–ঠিক এমন দূরত্বই ছিল দুর্ঘটনার জায়গা থেকে বেঞ্চটার দূরত্ব।'

'হ্যাঁ।'

'বেশ, এবার বলে যান–যা যা ঘটেছিল।

কী ঘটেছিল! আবার চিন্তায় ডুবে গেল নাওমি। আরনল্ড যা বলল, সত্যি কি তাই? সত্যি কি তাদের বিয়েটা শুধুই সুবিধাবাদের বিয়ে। শুধুই স্বার্থের। প্রেম নেই? ভালবাসা নেই? কিন্তু নাওমি তো আরনল্ডের প্রেমে মুগ্ধ হয়েই ওকে বিয়ে করেছিল। আরনল্ড তাকে ভালবাসল না–দোষ কি নাওমিরই? ও কি ভাল স্ত্রী হয়নি? ভাল মা হয়নি? এই ঘটনার পর কি আর আরনল্ডকে আগের মত ভালবাসা সম্ভব? তা হলে? জীবনের বাকি দিনগুলো কি অভিনয় করেই

কাটাতে হবে?

'আমি একটি জটিল প্রশ্নের সমাধান চাই, মি. ব্যাবকক।' আরনল্ডের গলা যেন ঘোরের মধ্যে কানে এল নাওমির। আপনি বলছেন, মৃত্যুর আগে আপনি কখনও মিসেস অ্যাগনেসকে দেখেননি। আপনি একটা বেঞ্চে বসে অপেক্ষা করছিলেন বাসের জন্য। মিসেস অ্যাগনেস পুবদিক থেকে চৌমাথায় এসে তখন পৌঁচেছেন, তাই না? মিসেস অ্যাগনেসের বয়েস হয়েছে। মোটাসোটা ভারি চেহারা। ওই রাস্তা পেরিয়ে গলির মাথায় তার বাড়ি। একা ফিরছিলেন। ক্লান্ত। রুগ্ন নাতিকে সেবা-যত্ন করে গভীর রাতে বাড়ি ফিরছিলেন তিনি। এমন নিস্তব্ধ গভীর রাতে কেন আপনি তার পায়ের আওয়াজ শুনতে পাননি?'

হকচকিয়ে গেল হেনরি ব্যাবকক। খোঁচা খোঁচা দাড়িতে হাতের তালু ঘষল। প্রত্যেকটি মানুষের চোখ তার দিকে।

'না-না, আমি তো বলিনি যে আমি তার পায়ের শব্দ শুনিনি...'

'হয়তো শুনেছিলাম। না...মানে আমার ঠিকমত মনে পড়ছে না। আসলে আমি তখন খুবই ক্লান্ত ছিলাম। কাজ শেষে ঘরে ফিরছিলাম কিনা।'

'সেঞ্চুরি ক্লাব থেকে?'

'হ্যাঁ। ওই ক্লাবটাতে আমি ধোয়া-মোছার কাজ করি। রাত দুটোয় ক্লাব খালি হলে আমার কাজ শুরু হয়।'

'রাত দুটো?'

'হ্যাঁ।'

'রাত দুটো' শুনেই আবার চিন্তাটা চাগিয়ে উঠল নাওমির মাথায়। সবেমাত্র জেরোমের কাজটা হাতে নিয়েছে আরনল্ড। গভীর রাত, বাড়ি ফেরেনি আরনল্ড। এমনসময় নীচের হলঘরে বেজে উঠল ফোন। নাওমি সিঁড়ির শেষ ধাপটা পার হতেই ঘরে ঢুকল আরনল্ড। ছুটে গিয়ে ধরল ফোন। স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল নাওমি। ইদানীং স্বামী সম্পর্কে ভয়ঙ্কর এক সন্দেহ কুরে কুরে

খাচ্ছে ওকে। প্রায় রাতেই বাড়ি ফেরে না আরনল্ড।

সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়েই নাওমি শুনল মধুর স্বরে কথা বলছে আরনল্ড। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ। আপনি চিন্তা করবেন না। কেসটা যখন আমার হাতে, আপনি নিশ্চিন্তে বসে থাকুন। আর হ্যাঁ, নতুন তথ্যটার জন্যে ধন্যবাদ।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে পরমুহূর্তে আবার তুলল আরনল্ড। ডায়াল করল। 'ফ্রান? আরনল্ড বলছি। অসময়ে বিরক্ত করছি, দুঃখিত। হ্যাঁ, শোনো, জেরোমের কেসটার কথা বলছি। ওর বিরুদ্ধে ভাল এক সাক্ষী দাঁড় করিয়েছে পুলিশ। লোকটার নাম হেনরি ব্যাবকক। সেঞ্চুরি ক্লাবে কাজ করে। ওর জীবন-বৃত্তান্ত বের করো। বুড়ো জেরোম এক ককটেল পার্টিতে শুনেছে, তার ছেলেকে ফাঁসানোর জন্য উঠে পড়ে লেগেছে পুলিশ। দুর্ঘটনার সময় নাকি এই ব্যাবকক বাসের জন্য পথের ধারে অপেক্ষা করছিল।'

ধন্যবাদ জানিয়ে ফোন নামিয়ে রাখল আরনল্ড। সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে আছে নাওমি। শূন্য দৃষ্টি তার চোখে।

'তোমার ভালবাসার মেয়েটি কি ওই ফ্রান? তোমার সেক্রেটারি?' জিজ্ঞেস করল নাওমি।

রাগে কুঁচকে গেল আরনল্ডের চোখ। হয়তো বুড়ো জেরোমের ফোন পেয়েই রেগে গেছে, ভাল নাওমি। কাছে গিয়ে আরনল্ডের কুঁচকে যাওয়া টাইটা সোজা করে দিল। সবসময় ফিটফাট থাকতে ভালবাসে আরনল্ড। নাওমিও তাই পছন্দ করে।

'কী, বললে না?' আবার জিজ্ঞেস করল নাওমি।

'বাজে বোকো না তো। আমি ক্লান্ত। ঘুমুতে যাচ্ছি,' বলে গটগট করে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল আরনল্ড। ওর চলার দৃপ্ত ভঙ্গির দিকে তাকিয়ে রইল নাওমি। বুকের মধ্যে টনটন করে উঠল। এই সুন্দর মানুষটি আজ ওর কেউ নয়। ওই লোকটির কাছে ওর কোনওই দাম নেই।

ভাবনার জগৎ থেকে যেন ধাক্কা দিয়ে নাওমিকে বাস্তবে ফিরিয়ে

আনল আরনল্ডের কণ্ঠ। 'তা হলে রাত তখন প্রায় সাড়ে তিনটে, এমন সময় আপনি ক্লাবের কাজ শেষ করে বাস স্টপে বাসের জন্য দাঁড়িয়েছিলেন? মি. ব্যাবকক, আপনি থাকেন কোথায়?'

প্রশ্নটা সরল। কিছুই না ভেবে ব্যাবকক বলল, 'ঈঙ্গল উডে।'

'আপনি কি একা থাকেন?'

'হ্যাঁ। তিন বছর আগে আমার স্ত্রী মারা গেছে। তারপর থেকে একাই থাকি।'

'তাই নাকি? সরি। সারাদিনের কাজকর্মের শেষে বাড়ি ফিরে এলে একা লাগে না?'

সরকারি উকিল উত্তেজিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। কিন্তু তিনি কিছু বলার আগেই ব্যাবকক উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, তা লাগে কিছুটা।'

'কিন্তু আপনার তো বন্ধুর অভাব নেই।'

'বন্ধু!' ব্যাবকক হতভম্ব।

'হ্যাঁ। যেখানে কাজ করেন সেখান তো অনেক সুন্দরী মেয়েও কাজ করে। মন পাবার জন্য আপনি তাদের অনেক কাজ করে দেন না?'

সরকারী উকিল এবার চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ইওর অনার, এইসব প্রশ্নের তীব্র প্রতিবাদ করছি। আমরা কি এখানে সাক্ষীর সামাজিক কিংবা ব্যক্তিগত জীবন ঘাঁটাঘাঁটি করতে এসেছি?'

সরকারী উকিলের দিকে ফিরে হাসল আরনল্ড। 'কেন নয়? সাক্ষী আমার মক্কেলের বিবৃতির বিরুদ্ধে উল্টো তথ্য দিচ্ছে। এই দুজনের যে কোনও একজন মিথ্যে বলছে। আমি সাক্ষীর চরিত্র জানতে চাই। আর তা জানার জন্য এসব প্রশ্ন মোটেই অপ্রাসঙ্গিক নয়।'

আরনল্ডের সঙ্গে সরকারী উকিলের তর্ক লেগে গেল। ওর কথার মারপ্যাঁচে হেরে গেল সরকারী উকিল।

জজ ও জুরিদের সামনের দেয়ালে একটা ব্ল্যাকবোর্ড টাঙানো। তাতে চক দিয়ে নিপুণভাবে আঁকা রয়েছে দুর্ঘটনার জায়গাটা।

ফুটপাতের পাশের যে বেঞ্চটাতে ব্যাবকক বসে ছিল এবং মিসেস অ্যাগনেস যেখানটাতে রাস্তা পার হচ্ছিলেন, তাও দেখানো আছে।

'অ্যাগনেস পুবদিক থেকে রাস্তা পার হচ্ছিলেন। তা হলে তিনি আপনার পেছন দিক থেকে এসেছিলেন। ঠিক না?'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে এই রাস্তাটা উত্তর দিক থেকে দক্ষিণে গেছে। আর বাস স্টপের বেঞ্চটা চৌমাথার দক্ষিণ-পুব দিকে, কেমন?' বলে আঙুল তুলে দেখাল আরনল্ড। ট্রাফিক সিগন্যালের আলো ছিল লাল। যখন আমার মক্কেলের গাড়ি মিসেস থমসনকে ধাক্কা মারে তখন আপনি বেঞ্চটায় বসেছিলেন, এবং সেখান থেকে ওই ট্রাফিক আলোর দূরত্ব প্রায় দশ ফুট। আপনার বেঞ্চটা রাস্তার ডান দিকে ছিল, না?'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে রাতভর খাটুনির পর আপনি বাসের জন্য রাস্তার ধারের ওই বেঞ্চে বসেছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'একা?'

'হ্যাঁ।'

ট্রাফিক আলোটা ছিল লাল। সবুজ হবার আগেই আমার মক্কেলের গাড়িটা ছুটন্ত বুলেটের মতো রাস্তা পেরোবার সময় মিসেস অ্যাগনেসকে ধাক্কা মারে। খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার যে আপনি আপনার মাথাটা ডানদিকে ঘুরিয়ে ট্রাফিক আলোটাকে লাল দেখলেন, অথচ মিসেস অ্যাগনেস যে ওইসময় রাস্তা পেরোচ্ছিলেন তাকে দেখতে পেলেন না! কেমন অদ্ভুত না?'

আদালত কক্ষে একটা চাপা গুঞ্জন উঠল। বিখ্যাত ব্যারিস্টার আরনল্ড শ্যানের বাকচাতুর্য এবার যে কোন্ পথে বাঁক নিচ্ছে কে জানে!

'আমি ঠিক বলতে পারছি না,' ইতস্তত করে বলল ব্যাবকক।

‘আমার মনে হচ্ছে উনি তখন ওখানটায় ছিলেন না।’

‘তা হলে ট্রাফিক সিগন্যাল থেকে আপনার দৃষ্টি ওই মুহূর্তে অন্যদিকে ছিল?’

ব্যাবকক রুমাল দিয়ে মুখ মুছল। নিশ্চিত বুঝে গেল ফাঁদে ফেলা হচ্ছে ওকে। ‘না, আমি সিগন্যালের দিকেই তাকিয়ে ছিলাম।’

‘তা হলে মিসেস থমসনকে দেখতে পেলেন না কেন?’

‘রাতটা অন্ধকার ছিল।’

‘ওই চৌমাথায় কিন্তু মিউনিসিপ্যালিটির আলো ছিল।’

‘হ্যাঁ, ছিল। তবে এতদূর পর্যন্ত তার আলো আসেনি।’

রাস্তা পেরোতে হলে মিসেস থমসনকে ওই আলোর নীচে পড়তেই হত, আর তা হলেই আপনি তাকে দেখতে পেতেন।’

‘হয়তো তিনি দ্রুত আসছিলেন। কিংবা দৌড়াতে দৌড়াতে...’

‘দৌড়াতে দৌড়াতে? কেন?’

এর আগে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়ায়নি ব্যাবকক। ভেবেছিল যা নিজে চোখে ঘটতে দেখেছে তা বলেই নিস্কৃতি পাবে। এখন বুঝল প্রতিপক্ষের উকিলের কথার মারপ্যাঁচে আটকা পড়ে গেছে সে। নিস্কৃতির উপায় নেই।

‘হয়তো ভয় পেয়েছিলেন।’

‘কিন্তু ভয়টাই বা পেয়েছিলেন কেন তিনি?’ প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে জুরিদের দিকে তাকাল আরনল্ড।

‘গভীর রাত, মানে কাগজে আমরা যা পড়ি সে সবই হয়তো...’ আমতা আমতা করতে থাকে ব্যাবকক।

কঠিন দৃষ্টিতে ব্যাবককের দিকে তাকাল আরনল্ড। ‘কী পড়ি, আর কী সে সব? খোলাখুলি বলুন?’

‘এই মানে ছিনতাই, হামলা...’

‘ও, এই সবই শুধু পড়েন? ক্লাবের কাজকর্ম সেরে, মেয়েদের ফুটফরমায়েশ খেটে অনেক রাতে বাসায় ফিরে এসব রোমহর্ষক

ঘটনাগুলো পড়েন? বিশেষ করে মেয়েদের ওপর অত্যাচারের ঘটনাগুলো আপনার কাছে বেশি আকর্ষণীয়, তাই না, মি. ব্যাবকক?'

'এসব প্রশ্নে আমার আপত্তি আছে, ইওর অনার,' চেঁচিয়ে উঠলেন সরকারী উকিল। 'আমার সাক্ষীর চরিত্রের ওপর কটাক্ষ করা হচ্ছে।'

সরকারী উকিলের দিকে তাকিয়ে অমায়িকভাবে হাসল আরনল্ড। নাওমি বুঝতে পারছে, নিরীহ সাক্ষীকে জজ ও জুরিদের সামনে ভয়ানক এক অপরাধী করে তুলবে আরনল্ড। আর এটাই তার প্রতিষ্ঠার গোপন ফর্মুলা।

আবার স্মৃতির অতলে হারিয়ে গেল নাওমি। 'আমি কারও সমালোচনার পাত্র হতে চাই না, নাওমি,' বলে চলেছে আরনল্ড। 'আমি তোমাকে ডিভোর্স করব না। আর আমি এ-ও চাই না যে তুমি আমার নামে ডিভোর্সের নালিশ আনো। ছেলেমেয়েদের ব্যাপারটা তোমার অবশ্যই ভাবা উচিত। আমাদের সামান্য অনুদারতার জন্য ওরা কিন্তু সাফার করবে। একজন প্রথম শ্রেণীর উকিল হিসেবে আমার প্রতিষ্ঠার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম।'

'আদালত কক্ষে নিরীহ লোকেদের অপরাধী প্রমাণ করাই আমার কাজ,' বলে চলেছে আরনল্ড। 'ইওর অনার, সাক্ষী সম্বন্ধে মাননীয় জুরিদের মনে বিরূপ ধারণা সৃষ্টির জন্য সত্যিই আমি দুঃখিত। আমার একেবারেই ইচ্ছে ছিল না যে সাক্ষীর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কটাক্ষ করি। কিন্তু এটা কি বিস্ময়কর ব্যাপার নয়, সাক্ষী মাথা ঘুরিয়ে ট্রাফিক সিগন্যাল দেখল, অথচ তখন রাস্তা পার হচ্ছিলেন মিসেস অ্যাগনেস তা তার চোখে পড়ল না!' বলেই সে নাটকীয় ভঙ্গিতে ঘুরে দাঁড়াল সাক্ষীর দিকে। 'মি. ব্যাবকক, আসলে ওই মহিলাকে আপনি ঠিকই দেখতে পেয়েছিলেন।'

সামনে ঝুঁকল ব্যাবকক। তারপর বলল, 'না, এটা ঠিক নয়।'

'আপনি সত্যি কথা বলছেন না, মি. ব্যাবকক। একটু আগে

বললেন আপনি তাকে দেখেননি। আবার বললেন, পায়ের শব্দ শুনেছেন। কোনটা সত্যি? আসলে আপনি তাকে দেখেছেন এবং কথাও বলেছেন তার সাথে...এটাই কি সত্যি না?'

'না, একেবারে মিথ্যে।'

'আপনি তার দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন?'

'আমি বাস স্টপের বেঞ্চ থেকে এক মুহূর্তের জন্যেও উঠিনি।'

'আপনি বেঞ্চ থেকে ওঠেননি, আবার অন্যদিক থেকে ছুটে আসছে গাড়ি–তা সত্ত্বেও মিসেস অ্যাগনেস কেন রাস্তা পার হতে চেষ্টা করলেন? কেন করলেন, বলুন মি. ব্যাবকক? তিনি রাস্তায় যদি হতবুদ্ধি হয়ে না পড়তেন, তা হলে এই দুর্ঘটনা ঘটত না। ওই সময় রাস্তায় কি ফুটপাতে আর কেউ ছিল?

'না, কেউ ছিল না।'

'মিসেস অ্যাগনেসকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন আপনি?'

'না-না। এসব একেবারে মিথ্যে! বানানো গল্প!' চেঁচিয়ে উঠল ব্যাবকক।

'আপনি শপথ নিয়েছিলেন মি. ব্যাবকক, দুর্ঘটনার রাতে যা যা ঘটেছে সবই আপনি বলবেন। কারণ সেখানে আপনি ছাড়া আর কেউ ছিল না। এখন ওসব উল্টাপাল্টা কথা বাদ দিয়ে সত্যি কথাটা বলে ফেলাই আপনার জন্য মঙ্গলজনক।'

ব্যাবকক কী বলে তা শোনার জন্য সমস্ত আদালত কক্ষ নিশ্চুপ হয়ে গেল। সবাই তাকিয়ে আছে তার দিকে।

'আমি নিজের চোখে যা দেখেছি, তাই বলেছি। আমার আর কিছু বলার নেই,' একটু রুক্ষস্বরে ভেঙে ভেঙে বলল ব্যাবকক।

'ধন্যবাদ, মি. ব্যাবকক,' বলেই পিছিয়ে এল আরনল্ড। নাওমি বুঝল এটাও ওর একটা অভিনয়। সহজে ও ছাড়বে না ব্যাবকককে। টেলিফোনে ফ্রানের সাথে ওর কথা সব শুনেছে সে। ব্যাবকক বেশ শক্তলোক। ধমকে বোকা বানানো যাবে না ওকে। ওর অতীত চরিত্রে কোনও দাগ নেই। তবে ওর সম্পর্কে সাংঘাতিক

কোনও একটা বিষয় বের করেছে ওরা। তাতেই রং লাগিয়ে ফাঁসাবে ওকে। এসব ষড়যন্ত্রের বাধা দিয়েছিল নাওমি।

'ওই গরিব মানুষটাকে অকারণে এত হেনস্তা করবে কেন তুমি? তোমার মক্কেল তো সত্যি অপরাধ করেছে।'

'হ্যাঁ, অপরাধ করেছে ঠিকই,' মাথা নেড়ে মিটিমিটি হেসে বলেছে আরনল্ড। 'তবে অপরাধী আর থাকবে না। কোর্টরুম একটা লড়াইয়ের মাঠ। আর লড়াইতে কে নিরীহ ভালমানুষ আর কে মন্দ মানুষ তা বিচার করা হয় না। এখানে মোটে দু'রকম মানুষ তুমি পাবে। এক হলো বুদ্ধি আর চতুরতায় প্রাণবন্ত আর অন্যটি হলো নিরীহ মরার মতই নির্জীব। আমি সেই বুদ্ধিমানের দলে–তাতেই তুমি এমন রাজকীয় ভাবে জীবন-যাপন করছ।'

হঠাৎ করে ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল আরনল্ড, 'আচ্ছা, মি. ব্যাবকক, আপনি কতদিন হলো সেঞ্চুরি ক্লাবে কাজ করছেন?'

একেবারে ভিন্ন ধরনের প্রশ্নে কিছুটা অবাক হলো ব্যাবকক। 'দশ মাস,' উত্তর দিল সে।

'ও। আমার তো মনে হয়, ওখানে আপনার মাইনে খুব একটা লোভনীয় নয়, তাই না?'

'বেশি টাকা আমার দরকার নেই।'

'তা হলেও কিন্তু একজন গণিত আর আর্কিটেক্ট ড্রইং মাস্টারের তুলনায় অতীব নগণ্য। ঠিক বলিনি, বলুন? আচ্ছা, মি. ব্যাবকক, ফ্রিম্যান হাইস্কুলে চোদ্দ বছর পড়িয়ে হঠাৎ চাকরি ছেড়ে এই সেঞ্চুরি ক্লাবের ঝাড়ুদার হলেন কেন? এর মধ্যে কি কোনও রহস্য নেই বলতে চান?'

এমন কথা শোনার জন্য যেন কেউ প্রস্তুত ছিল না। স্তব্ধ হয়ে গেল সবাই। ঝট্ করে ব্যাবককের চশমাটা খুলে নিয়ে নিজের জায়াগায় এসে দাঁড়াল আরনল্ড। পুরোপুরি অন্ধের মত হাতড়াতে লাগল ব্যাবকক।

'আমার চশমা! আমার চশমা ফেরত দিন!' আর্তচিৎকার বেরুল

ওর গলা থেকে।

'মি. ব্যাবকক, এবার সত্যি কথাটা বলুন তো, স্কুলের ওই ভাল চাকরি ছাড়লেন কেন? আপনার এই চোখের জন্যে, তাই না? ক্রমে অন্ধ হয়ে যাচ্ছিলেন আপনি।'

'না। ছানি পড়েছিল আমার চোখে।'

'আপনার দৃষ্টিশক্তি একেবারে খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। রঙের পার্থক্য আপনি ধরতে পারতেন না।'

মৃদু গুঞ্জন উঠল কোর্টরুমে। অন্যদিকে মোড় নিচ্ছে কেস। আরনল্ডের বিজয় গর্বিত মুখখানা দেখল নাওমি।

'আমার চোখ ভাল হয়ে যাবে। আবার আমি ফিরে যাব আমার পুরনো চাকরিতে। এরজন্য শুধু একটা বছর অপেক্ষা করতে হবে আমাকে। একটা চোখ এখন বাকি।'

'যে রাতে দুর্ঘটনা হয়েছিল, সে রাতে আপনার চোখ কি ভাল ছিল?'

'চশমা থাকলে রঙ চিনতে পারি।'

'দুচোখেই?'

'না। শুধু বাঁ চোখে। এটার অপারেশন হয়েছে।'

'ট্রাফিক আলো কিন্তু আপনার ডানে ছিল, মনে আছে?'

'আমি মাথা ঘুরিয়েছিলাম।'

'মিসেস অ্যাগনেসকে চোখে পড়েনি?'

'না, পড়েনি। কারণ আশপাশের কিছু আমি দেখতে পাই না। শুধু সামনের জিনিসই দেখতে পাই।'

'শুধু সামনের জিনিস, তাই না?' এরই মধ্যে যেন অপেক্ষা করছিল আরনল্ড। 'কতদূরের জিনিস? আপনার সাক্ষীর চেয়ার থেকে আসামী মি. জেরোমের চেয়ারের দূরত্ব পর্যন্ত, তাই না? আপনি কিন্তু আগে তাই বলেছেন।'

সামনের দিকে ঝুঁকে এল হেনরি ব্যাবকক। অদ্ভুত হাস্যকর একটা দৃশ্য। যেন কুয়াশার ভেতর দিয়ে কিছু যেন দেখার চেষ্টা

করছে এমন তার ভঙ্গি। কাতর স্বরে সে বলল, 'আমার চশমা...'

ব্যাবককের কাতরোক্তি ছাপিয়ে গম্ভীরভাবে ভেসে এল আরনল্ডের কণ্ঠ, 'ইওর অনার, সাক্ষী ব্যাবককের বিবৃতি যেন নাকচ করা হয়। যে সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে কাউকে দোষী সাব্যস্ত করা যেতে পারে সেরকম সাক্ষ্যপ্রমাণ ইনি দিতে পারবেন না। শপথ নেয়ার পর ইনি বলেছিলেন, দুর্ঘটনার সময় তিনি যেখানে বসেছিলেন সেখান থেকে দুর্ঘটনাস্থলের আনুমানিক দূরত্ব আসামী ও সাক্ষীর চেয়ারের দূরত্বের সমান। অর্থাৎ তিরিশ ফুটের মত। কিন্তু আমি নিজে গিয়ে মেপে এসেছি ওখানটার দূরত্ব বাষট্টি ফুট। তা হলেই বুঝুন, এই মি. ব্যাবকক শুধুই যে রঙ-কানা তাই নয়, ছানি পড়া চোখ দিয়ে শুধুই যে দেখতে পান না তা-ও নয়—সাধারণ দূরত্ব মাপার ক্ষমতাও ইনি হারিয়েছেন। যদি সত্যকে ইনি গোপন না করে থাকেন, বেঞ্চ থেকে উঠে মিসেস অ্যাগনেসকে তাড়া না দিয়ে থাকেন, তা হলে একটা সমাধানেই আমরা আসতে পারি তা হলো এই হতভাগ্য লোকটি প্রথমে তার স্ত্রীকে হারিয়ে এবং পরে চোখ দুটো হারিয়ে একেবারে ভেঙে পড়েন। আজ এতটাই তিনি দুর্বল যে কোর্টে সাক্ষী হিসেবে দাঁড়াতে একেবারেই অক্ষম।'

সরকারী উকিল প্রতিবাদ করার জন্য উঠে দাঁড়ালেন, কিন্তু আরনল্ড তার দিকে এমনভাবে তাকাল যেন এরই মধ্যে কেসটা নাকচ হয়ে গেছে।

পনেরো মিনিটের জন্য জুরিরা অন্যত্র গেলেন। ফিরে আসার পর রায় দিলেন, আসামী মি. জেরোম বেকসুর খালাস।

রায় ঘোষণার পর খালি হয়ে গেল আদালত কক্ষ। সবশেষে করিডর দিয়ে এগোতে লাগল ব্যাবকক। ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে নাওমি। ব্যাবককের চোখ পড়ল তার ওপর। নাওমি দেখল মৃত এক সৎ-নাগরিককে। আর ব্যাবকক দেখল একজোড়া সহানুভূতি মাখা চোখ।

অনেকের অভিনন্দন তাচ্ছিল্যভরে অবজ্ঞা করে বাইরের

বারান্দায় এগিয়ে এল আরনল্ড। দাঁড়াল নাওমির মুখোমুখি।

'বেচারির কথা মিথ্যা প্রমাণিত করার জন্য ওর চরিত্রে যে কলঙ্ক তুমি দিলে, তাতে কোনওদিনই আর শিক্ষকতার চাকরিটা ফিরে পাবে না। তুমি ওর সর্বনাশ করেছ, আরনল্ড।'

শয়তানী হাসি দিয়ে আরনল্ড বলল, 'এটা ওর সমস্যা। আমার তা দেখার ব্যাপার নয়।'

'কিন্তু তোমার সমস্যাটা আমি জানি। কী করে বউকে জীবন থেকে সরিয়ে নিষ্কৃতি পাবে, তাই ভাবনা তোমার,' হিসিয়ে উঠল নাওমি।

উত্তর দিল না আরনল্ড। পাশাপাশি হাঁটতে লাগল দু'জন। কোর্ট প্রাঙ্গণ খালি। উল্টো দিকে বাস স্টপ। দাঁড়িয়ে আছে হেনরি ব্যাবকক। চোখে পুরু চশমা। রুক্ষ, এলোমেলো চুল। জীবন যুদ্ধে পরাজিত এক বিধ্বস্ত সৈনিক। এক ঝলক তার দিকে তাকাল আরনল্ড। ওসব ছোট মাপের লোককে কে আর হিসেব করে।

পার্কিংলটের কাছে এসে আরনল্ড বলল, 'তুমি এসে ভালই করেছ, নাওমি। পাঁচটায় আমার জরুরি কাজ আছে। গাড়িটা লাগবে।'

'আমি ফুল দিতে চাই তোমাকে। মানে আমার অভিনন্দন। চল আগে ফুলের দোকানে যাই।'

'না, না। দেরি হয়ে যাবে আমার। তুমি বরং তাড়াতাড়ি গাড়িটা বের করো।'

গাড়িতে স্টার্ট দিল নাওমি। ওই তো সামনে দাঁড়িয়ে আরনল্ড। আত্মবিশ্বাসে ভরা চাহনি। কিন্তু অতবড় একটা শয়তানকে আর ক্ষমা করবে না সে। না, কিছুতেই না। গাড়ির নাক একটুও ঘোরাল না। সোজা চালিয়ে দিল আরনল্ডের দিকে...

পুলিশ কনস্টেবলরা গাড়ির নীচে থেকে তুলল আরনল্ডকে। থেঁতলে গেছে ওর মাথা!

অ্যাক্সিডেন্টের সময় কেউ ছিল না কাছেপিঠে। শুধু বাসস্টপে দাঁড়িয়ে হেনরি ব্যাবকক।

ভিড় জমে গেল। সাক্ষী একমাত্র ওই হেনরি ব্যাবকক। পুরু চশমার ভেতর দিয়ে তাকিয়ে রয়েছে। শান্ত। কোনও ভাবান্তর নেই। পুলিশ যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করল, বলল, 'আমাকে জিজ্ঞেস করছেন কেন? আমার কথার কী দাম আছে?' চশমা খুলে ঘোলাটে চোখে তাকাল। 'এই তো, একটু আগে আদালতে প্রমাণ হয়ে গেছে, সাক্ষী হিসেবে আমি পুরোপুরি অচল।'

চশমাটা আবার পরল ব্যাবকক। চোখ তুলে তাকাতেই চোখাচোখি হলো নাওমির সাথে। পরক্ষণেই সরিয়ে নিল আবার।

মূল: হেলেন নেলসন
রূপান্তর: ফারহানা নাতাশা

হারানো রোবট

রিমলেস গ্লাসের পেছনে চোখ জোড়া কুঁচকে আছে জোনাথন কুয়েলের, চেহারায় উদ্বেগের ছাপ। 'জেনারেল ম্যানেজার'-এর লেবেল সাঁটানো দরজা ঠেলে ঝড়ের বেগে ভেতরে ঢুকল সে। ডেস্কের ওপর হাতের ভাঁজ করা কাগজটা দিয়ে সশব্দে চাপড় মারল, ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বলল, 'এটা একবার দেখেন, বস্!'

ঠোঁটে ঝোলানো সিগারটা গালের একদিক থেকে আরেক দিকে ঠেলে দিল স্যাম টোবি, চাইল মুখ তুলে। খোঁচা খোঁচা দাড়িতে ঢাকা চোয়ালে হাত বোলাল। 'হয়েছে কী?' হঠাৎ বিস্ফোরিত হলো স্যাম। 'কী নিয়ে ওদের গুজুর-গুজুর ফুসুর-ফুসুর শুনি?'

'ওরা বলছে আমরা পাঁচটা এ-এল রোবট পাঠিয়েছি,' চেহারায় অস্বস্তি, ব্যাখা করল কুয়েল।

'পাঁচটা নয়, ছ'টা!' ভুল শুধরে দিল টোবি।

'জি, ছ'টা! কিন্তু ওরা ডেলিভারি পেয়েছে মাত্র পাঁচটা। সিরিয়াল নাম্বারও পাঠিয়ে দিয়েছে। আমাদের এ-এল সেভেনটি-সিক্স-এর কোন পাত্তা নেই।'

ভারী শরীর নিয়ে চেয়ারটা পেছন দিকে ঠেলে নিয়ে গেল স্যাম টোবি, তারপর বিশাল বপু নিয়ে উঠে দাঁড়াল, হনহন করে এগোল দরজার দিকে।

'পাঁচ ঘণ্টা পরে, ঘর্মাক্ত, উদভ্রান্ত টোবি সেণ্ট্রাল প্ল্যাণ্টের সমস্ত কর্মচারীর কাছে জরুরি মেসেজটা পাঠিয়ে দিল—'রোবট এ-এল সেভেনটি-সিক্স ইজ মিসিং!'

রীতিমত আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল সেন্ট্রাল প্ল্যান্টে। ইউনাইটেড স্টেটস রোবটস এবং মেকানিক্যাল মেন কর্পেরেশনের ইতিহাসে এই প্রথম কোনও রোবটের বাইরের পৃথিবীতে পলায়নের ঘটনা ঘটল। এ ধরনের রোবটকে তৈরি করা হয়েছে চাঁদে ডিজিণ্টো নামের একটি এয়ারক্রাফট চালানোর জন্যে। রোবটের পজিট্রনিক ব্রেন চাঁদের পরিবেশ ও আবহাওয়ার সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্যে সমন্বয় ঘটানো হয়েছে। যাঁরা এই রোবট তৈরি করেছেন, তাঁরা স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, শুধু চাঁদের পরিবেশের সাথেই খাপ খাইয়ে চলতে পারবে এ-এল সেভেনটি-সিক্স। পৃথিবীর পরিবেশের সাথে সে কখনোই নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারবে না। তবে পৃথিবীতে এলে রোবটের প্রতিক্রিয়া কী হবে সে সম্পর্কে গবেষণাবিদরা কোনও তথ্য দিতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। শুধু বলেছেন, প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আগাম কোনও মন্তব্য করা কিছুতেই সম্ভব নয়।

এ-এল সেভেনটি-সিক্স নিখোঁজ হবার ঘটনা জানাজানি হবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে একটি স্ট্রাটো-প্লেন ভার্জিনিয়া প্ল্যাণ্টের উদ্দেশে ছুটল। একটি মাত্র নির্দেশই দেয়া হয়েছে–'রোবটটাকে যত দ্রুত পারো ধরে নিয়ে এসো!'

রোবট এ-এল সেভেনটি-সিক্স বিমূঢ় হয়ে পড়েছে। অবশ্য তার মসৃণ, পজিট্রনিক ব্রেন শুধু উদভ্রান্তি বা বিমূঢ়তার মত অনুভূতির সাথে পরিচিত।

ব্যাপারটা শুরু হয়েছে যখন সে নিজেকে এই অচেনা, অজানা পরিবেশের মাঝে দেখতে পেল। তারপর থেকে সে কীভাবে এখানে এল কিছুতেই বুঝতে পারছে না। সবকিছু কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে।

ওর পায়ের নীচে সবুজের ছড়াছড়ি, তাকে চারপাশ থেকে ঘিরে আছে বাদামী রঙের পাহাড়, তার ওপরে আরও সবুজ। আকাশের

রঙ নীল। অথচ ওটা কালো হবার কথা ছিল। সূর্যের রঙ ঠিকই আছে, গোল, হলদে এবং উষ্ণ—কিন্তু পায়ের তলায় পাউডারের মত ঝামা পাথরের গুঁড়ো কোথায়? বিরাট পাহাড়ের মত আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের বলয়টাই বা কোথায় গেল?

শুধু নীচে দেখা যাচ্ছে সবুজ আর মাথার ওপরে নীল রঙের বিস্তৃতি। আশপাশ থেকে যে সব শব্দ ভেসে আসছে তাও তার কাছে অত্যন্ত অপরিচিত ঠেকছে। সে একটা ঝর্নার মধ্যে নেমে পড়ল, ডুবে গেল কোমর পর্যন্ত। পানিটা নীল, ঠাণ্ডা এবং ভেজা। হাঁটার সময় মাঝে মাঝে মানুষজনের সাথে সাক্ষাৎ হলো তার। রোবটটি অবাক হয়ে লক্ষ করল তাদের কারও গায়ে স্পেস-সুট নেই। অথচ সবার পরনে স্পেস-সুট থাকার কথা। আর কী আশ্চর্য, ওকে দেখা মাত্র লোকজন চিৎকার করে ছুটে পালাতে শুরু করেছে।

এক লোক তার দিকে বন্দুক ছুঁড়ল, বাতাসে শিস কেটে গুলিটা চলে গেল মাথার পাশ দিয়ে—আর তার পরপরই লোকটাও দিল দৌড়।

এ-এল সেভেনটি-সিক্স জানে না কতক্ষণ সে উদ্দেশ্যবিহীন হেঁটে বেড়িয়েছে। অবশেষে হ্যানাফোর্ড শহরের জঙ্গল থেকে মাইল দুই দূরে, র‍্যানডলফ পেনের কুটিরের কাছে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সে। র‍্যানডলফ পেনের এক হাতে স্ক্রু-ড্রাইভার, অন্যহাতে একটা পাইপ, দরজার বাইরে একটা ভাঙা-চোরা ভ্যাকুম ক্লিনারের সামনে উবু হয়ে বসে কাজ করছিল।

কাজ করতে করতে গুন গুন করে সুর ভাঁজছিল পেন। যখন ঘরে থাকে, পেনের মত সুখী মানুষ কেউ হয় না। হ্যানাফোর্ডে তার আরেকটা বাড়ি আছে। সাজানো-গোছানো, সুন্দর। তবে সে বাড়িটা দখল করে রেখেছে তার স্ত্রী। অবশ্য ওখানে থাকার কোন ইচ্ছেও নেই পেনের। সে তার এই কারখানাতে থাকতেই বেশি পছন্দ করে, স্বাধীনতা ও স্বস্তির স্বাদ পায়। এখানে সে শান্তিতে

সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে লোহা-লক্কড় নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে, নিত্য ব্যবহার্য ঘরোয়া জিনিসপত্র তৈরিতে মন দেয়। এটাই তার একমাত্র শখ।

তবে শুধু শখ দিয়ে তো আর পেট ভরে না। কেউ হয়তো তাকে একটা রেডিয়ো বা অ্যালার্ম ক্লক সারাতে দিল। এ থেকেও মাঝে মাঝে পয়সা-পাতি পায় র‍্যানডলফ পেন। তবে ওর দজ্জাল বউটার শকুনি নজর এড়িয়ে নিজের কাছে দু'দশ টাকা লুকিয়ে রাখার সুযোগ খুব কমই হয় তার। তবে পেন আশা করছে ভ্যাকুম ক্লিনারটা মেরামত করে দিতে পারলে ভাল অঙ্কের একটা টাকা পাবে। টাকাটা বউকে দেবে না বলে ঠিক করেছে পেন। কৌশলে মেরে দেবে।

মনের আনন্দে গান গাইতে গাইতে চোখ তুলে তাকিয়েছিল পেন, হঠাৎ জমে গেল। কেউ যেন ওর গলা টিপে ধরেছে, আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে গেছে গান, বিস্ফারিত মণি, কপালে ফুটল ঘামের রেখা। উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করল ও–ঝেড়ে দৌড় দেবে–কিন্তু পা জোড়া বিশ্বাসঘাতকতা করল। রীতিমত ঠকঠকানি শুরু হয়ে গেছে।

এ-এল সেভেনটি-সিক্স উবু হয়ে বসল ওর পাশে। জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, ওরা সবাই আমাকে দেখে ছুটে পালাচ্ছে কেন?'

পেন ভালই বুঝতে পারছে 'ওরা' কেন ছুটে পালিয়েছে, তবে প্রশ্নটার কোনও জবাব দিল না সে। নাক দিয়ে বিদঘুটে একটা শব্দ করে রোবটের কাছ থেকে সরে যেতে চেষ্টা করল।

দুঃখী দুঃখী গলায় এ-এল সেভেনটি-সিক্স বলে চলল, 'ওদের একজন আমাকে দেখে গুলি পর্যন্ত করল! আরেকটু হলেই আমার শোল্ডার প্লেটে আঘাত লাগত।'

'লো-লোকটা নিশ্চয়ই পা-পাগল ছিল,' বিড়বিড় করল পেন।

'হতে পারে,' সায় দিল রোবট। 'ভাল কথা, এখানে সবার হয়েছেটা কী?'

দ্রুত রোবটের দিকে একবার তাকাল পেন। বিকট এবং বিশালদেহী ধাতব দানবটার এত নরম কণ্ঠ ঠিক যেন মানাচ্ছে না। ওর মনে পড়ল কোথায় যেন শুনেছিল রোবটরা মানুষের কোনও ক্ষতি করতে পারে না। সেরকম নির্দেশই দেয়া আছে তাদেরকে। এতক্ষণে একটু স্বস্তি অনুভব করল পেন। 'কী আবার হবে? কিছুই হয়নি,' সাহস করে বলল সে।

'সত্যি বলছ তো?' সন্দেহের চোখে তাকাল এ-এল সেভেনটি-সিক্স। 'নাকি মিথ্যা বলছ? তোমার স্পেস-সুট কোথায়?'

'আমার কোনও স্পেস-সুট নেই।'

'তা হলে বেঁচে আছ কীভাবে?'

থমকে গেল পেন। 'আ-আমি ঠিক বলতে পারব না।'

'দেখলে তো!' রোবটের কণ্ঠে বিজয় উল্লাস। 'আমি ঠিকই ধরেছি, কিছু একটা গোলমাল আছে তোমাদের মধ্যে। এখানে মাউন্ট কোপার্নিকাস কোথায়? কোথায় লুনার স্টেশন-১৭? আর আমার ডিজিণ্টিটোটাকেই বা কেন দেখতে পাচ্ছি না? আমি বেকার বসে থাকতে পারব না। আমি কাজ চাই।' অস্থির লাগছে রোবটকে। উত্তেজিত গলায় বলতে লাগল, 'সেই কখন থেকে জানতে চাইছি আমার ডিজিণ্টোর খবর। কিন্তু কথা বলব কী? আমাকে দেখলেই সবাই পালিয়ে যাচ্ছে। শেডিউল থেকে এতক্ষণে হয়তো আমি অনেকটা পিছিয়ে পড়েছি। আমার সেকশনাল এক্সিকিউটিভ রেগে আগুন হয়ে যাবেন।'

এতক্ষণ মনে মনে বুদ্ধি পাকাচ্ছিল পেন, এবার জিজ্ঞেস করল রোবটটা, 'আচ্ছা, তোমার নাম কী? আমার সিরিয়াল নাম্বার হলো এ-এল সেভেনটি-সিক্স।'

'বুঝলাম। তবে তোমাকে আল নামেই ডাকব। ভাল কথা, আল, তুমি যে লুনার স্টেশন-১৭-র খোঁজ করছ, ওটা বোধহয় চাঁদে, না?'

মাথা ঝাঁকাল রোবট। 'হ্যাঁ। তবে আমি খুঁজছিলাম...

'তুমি যা খুঁজছ ওটা চাঁদে আছে। আর এটা চাঁদ নয়।'

হতভম্ব হয়ে গেল এ-এল সেভেনটি-সিক্স। পেনকে দেখল সে খানিকক্ষণ সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে, তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'এটা চাঁদ নয়, একথার মানে কী? অবশ্যই এটা চাঁদ। এটা চাঁদ না হলে কী, অ্যাঁ? বলো আমাকে!'

গলা দিয়ে অদ্ভুত শব্দ করল পেন, শ্বাস টানল জোরে। রোবটের দিকে একটা আঙুল বাগিয়ে ধরল সে, নাড়াল। 'দেখো,' বলল সে–আর তক্ষুণি দারুণ একটা বুদ্ধি মাথায় খেলে গেল পেনের, কথাটা শেষ করল হাঁপিয়ে ওঠার মত আওয়াজ করে, 'ওয়াও!'

ওকে চোখ রাঙাল এ-এল সেভেনটি-সিক্স। 'এটা কোনও জবাব হলো না। আমি মনে করি, একটি মার্জিত প্রশ্নের মার্জিত জবাব পাবার অধিকার আমার আছে।'

রোবটের কথা কানে যায়নি পেনের। এখনও নিজেকে নিয়ে বুঁদ হয়ে আছে ও। ব্যাপারটার মধ্যে কোনও দুই নম্বরী নেই। দিনের আলোর মত পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে রোবটটাকে চাঁদে যাত্রা করার জন্যে বিশেষভাবে প্রস্তুত করা হয়েছিল। যেভাবেই হোক ওটা সেখানে না গিয়ে পিছলে চলে এসেছে মাটির পৃথিবীতে। আর তাতে রোবটটা পড়ে গেছে মস্ত ধন্ধে। কারণ চাঁদের পরিবেশে খাপ খাওয়ানোর মত করে যাকে তৈরি করা হয়েছে, তার কাছে পৃথিবীর পারিপার্শ্বিকতা তো অর্থহীন মনে হবেই।

এখন পেন যদি কোনওমতে রোবটটাকে এখানে আটকে রাখতে পারে–অন্তত পিটার্সবোরোর ফ্যাক্টরির লোকদের সাথে যোগাযোগ করার আগ পর্যন্ত, তা হলেই কেল্লা ফতে। কে না জানে রোবটদের দাম অমূল্য। পেন শুনেছে সবচেয়ে সস্তাটাও নাকি পঞ্চাশ হাজারের কমে কেনা সম্ভব নয়। কিছু রোবটের দাম তো দশ লাখেরও ওপরে। তা হলে বিষয়টা নিয়ে ভাবো একবার!

উহ্, এটাকে বিক্রি করতে পারলে যে কত টাকা পাওয়া যাবে!

একটা টাকাও সে দজ্জাল মিরাণ্ডাকে দেবে না।

অবশেষে উঠে দাঁড়াল পেন। 'আল ভায়া!' ডাকল সে। 'আজ থেকে তুমি আর আমি জানের দোস্ত! বন্ধু! তোমাকে আমি আপন রক্তের ভাইয়ের মতই ভালবাসি।' ঝট্ করে একটা হাত বাড়িয়ে দিল সে। 'এসো, হাত মেলাই!'

ধাতব পাঞ্জায় মুঠো করে হাতটা ধরল রোবট, আস্তে চাপ দিল। ব্যাপারটা এখনও পরিষ্কার নয় তার কাছে। 'এর মানে কি তুমি আমাকে বলে দেবে কীভাবে আমি লুনার স্টেশন-১৭-তে পৌঁছুতে পারব?'

সামান্য অপ্রতিভ বোধ করল পেন। 'ন্-না, ঠিক তা নয়। সত্যি বলতে কী, তোমাকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে। তুমি যদি কটা দিন আমার এখানে বেড়িয়ে যাও খুব খুশি হব।'

'সর্বনাশ! তা কিছুতেই পারব না। আমাকে কাজে লেগে যেতে হবে।' এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল রোবট। 'প্রতি ঘণ্টায় কাজের নির্দিষ্ট শেডিউল থেকে পিছিয়ে পড়তে থাকলে কেমন লাগবে তোমার? আমি কাজ করতে চাই। আমাকে কাজে লাগতে হবে।'

এ ব্যাটা দেখি কাজ ছাড়া কিছু বোঝে না, মনে মনে ভাবল পেন। মুখে বলল, 'ঠিক আছে। তবে একটা ব্যাপার তোমাকে আগে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন–তোমার চাউনি দেখেই বুঝতে পেরেছি তুমি খুব বুদ্ধিমান লোক। তো হয়েছে কী, তোমার সেকশনাল এক্সিকিউটিভ আমাকে নির্দেশ পাঠিয়েছেন, তিনি চান আমি যেন কয়েকদিন তোমাকে এখানে রেখে দিই। মানে ওনার কাছ থেকে নতুন কোনও নির্দেশ না আসা পর্যন্ত আর কী!'

'কীসের নির্দেশ?' সন্দেহের সুরে প্রশ্ন করল রোবট।

'তা আমি বলতে পারব না। ব্যাপারটা নাকি সরকারি আর খুবই গোপনীয়।' বলল পেন, মনে মনে প্রার্থনা করল ব্যাটা যেন ওর ধড়িবাজি ধরতে না পারে, টোপটা গেলে। কিছু রোবট আছে সাংঘাতিক চালাক। তবে এটাকে দেখে তেমন কিছু মনে হচ্ছে না।

সম্ভবত অনেক আগের মডেল।

পেন মনে মনে প্রার্থনা করছে, ওদিকে এ-এল সেভেনটি-সিক্স পড়ে গেছে ভাবনায়। রোবটটির ব্রেন অ্যাডজাস্ট করা হয়েছে শুধু চাঁদে ডিজিণ্টো পরিচালনার জন্যে। বিমূর্ত চিন্তা-ভাবনার জন্যে নয়। এ-এল দেখল ও গভীরভাবে কিছু ভাবতে পারছে না, সব কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। অচেনা-অজানা পরিবেশ নিশ্চয়ই ওর ব্রেনের মধ্যে কিছু একটা ওলোট-পালোট ঘটিয়েছে।

তারপরও পরবর্তী যে প্রশ্নটা সে করল, তার মাঝে ধূর্ততার ছাপ প্রায় স্পষ্ট। সে চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'আমার সেকশনাল এক্সিকিউটিভের নাম কী?'

খাবি খেল পেন, কী বলা যায় ভাবছে। 'আল,' আহত হবার ভান করল পেন, 'তোমার সন্দেহ আমাকে সত্যি ব্যথিত করছে। তার নাম আমি প্রকাশ্যে বলতে পারব না। জানো না—গাছেরও কান আছে?'

এ-এল সেভেনটি-সিক্স চট্ করে তার কাছের গাছটার দিকে একবার চোখ বোলাল, তারপর অবিচলিত কণ্ঠে বলল, 'না, গাছের কান নেই।'

'আমি জানি আছে। আসলে আমি বলতে চাইছি এখানে গুপ্তচর থাকতে পারে।'

'গুপ্তচর?'

'তা হলে আর কী বলছি। আশা করি জানো, অনেক মন্দ লোক আছে, যারা লুনার স্টেশন ১৭-কে ধ্বংস করতে চায়।'

'তা কেন চাইবে?'

'কারণ ওরা লোক ভাল নয়। ওরা তোমাকেও নিকেশ করতে চায়। এ কারণেই তোমার এখানে কয়েকদিন লুকিয়ে থাকা দরকার। তা হলে আর ওরা তোমাকে খুঁজে পাবে না।'

'কিন্তু—কিন্তু আমাকে একটা ডিজিণ্টো পেতেই হবে। আমাকে আমার কাজের কোটা পূরণ করতেই হবে।'

‘পাবে। পাবে।’ ওকে আশ্বাস দিল পেন। ‘আগামীকাল ওরা তোমার জন্যে একটা ডিজিণ্টো পাঠিয়ে দেবে। হ্যাঁ, আগামীকালের মধ্যে পেয়ে যাবে।’ এর মধ্যে ফ্যাক্টরিতে খবর দিয়ে কাজ হাসিল করে পকেটে নোটের তাড়া পুরে ফেলবে পেন। কিন্তু পেনের প্রস্তাবে রাজি হলো না একগুঁয়ে রোবট। তার এখনই ডিজিণ্টো চাই।

পেন রোবটের শক্ত, ঠাণ্ডা কনুই ধরে ওকে বোঝাতে চেষ্টা করল, ‘শোনো। তোমাকে এখানে থাকতেই হচ্ছে...’

হঠাৎ রোবটের মনের ভেতর কী যেন পরিবর্তন ঘটে গেল। আশপাশের অচেনা, অজানা সব কিছু, গোটা পরিবেশ হঠাৎ যেন খুদে একটা গোলকে পরিণত হলো, পরক্ষণে বিস্ফোরণ ঘটল, ব্রেনের সাথে জিনিসটা যেন সেঁটে থাকল। রোবটের মনে হলো তার মস্তিষ্কের দক্ষতা হঠাৎ করেই বৃদ্ধি পেয়েছে অনেকখানি। দ্রুত ঘুরল সে পেনের দিকে। ‘এই তো পেয়েছি। আমি এখানে বসেই একটা ডিজিণ্টো তৈরি করতে পারি–তারপর ওটা নিয়ে কাজ শুরু করে দেব।’

ভুরু কোঁচকাল পেন। ‘তবে আমি বোধহয় তোমার কোন সাহায্যে আসতে পারব না।’ সবজান্তার ভাব করে শেষে আবার কোন্ বিপদে পড়ে যাবে ভেবে এ জবাবটা দিয়েছে সে।

‘তোমাকে কিছু করতে হবে না,’ এ-এল সেভেনটি-সিক্স টের পেল তার ব্রেনের পজিট্রনিক রাস্তায় নতুন এক প্যাটার্ন জাল বুনতে শুরু করেছে, অদ্ভুত উত্তেজনা বোধ করছে সে। ‘আমি নিজেই বানিয়ে নিতে পারব।’ পেনের সুসজ্জিত এবং প্রশস্ত কারখানার দিকে তাকাল সে প্রশংসার দৃষ্টিতে। ‘আমার যা যা দরকার সবই তোমার আছে দেখছি।’

র‍্যানডলফ পেন তার লোহা-লক্কড়ের জঞ্জালে চোখ বোলাল; নাড়িভুঁড়ি বের করা রেডিও, মুণ্ডুহীন রিফ্রিজারেটর, জং ধরা অটোমোবাইল ইঞ্জিন, ভাঙা গ্যাস রেঞ্জ, কয়েক মাইল লম্বা ক্ষয়ে যাওয়া তার এবং প্রায় পঞ্চাশ টন ওজনের নানা রকম ধাতব

জঞ্জালের বিরাট এক পাহাড়।

'সত্যি আছে?' জিজ্ঞেস করল সে দুর্বল গলায়।

ঘণ্টা দুই পরে, প্রায় একই সাথে দুটো ঘটনা ঘটল। ইউনাইটেড স্টেটস রোবটস এবং মেকানিকাল মেন কর্পোরেশনের পিটার্সবোরো শাখায় স্যাম টোবি একটা ডিজি ফোন কল পেল হ্যানাফোর্ড থেকে জনৈক র‍্যানডলফ পেনের। খবরটা হারানো রোবট সংক্রান্ত হলেও টোবি সম্পূর্ণ মেসেজ শোনার ধৈর্য হারিয়ে ফেলল, হুকুম দিল সমস্ত ফোন কল যেন আগে বাটনহোলের দায়িত্বে নিযুক্ত সিক্সথ অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ভাইস-প্রেসিডেণ্টের কাছে যায়।

অবশ্য কাজটা করার পেছনে যুক্তি আছে টোবির। রোবট এ-এল সেভেনটি-সিক্স নিখোঁজ হবার পর থেকে, গত কয়েক ঘণ্টায় সারা দেশ থেকে তার কাছে প্রচুর ফোন এসেছে। সবার বক্তব্য এক–তারা অমুক জায়গায় রোবটের সন্ধান পেয়েছে। পরে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে একেবারে ভুয়া খবর। এমন অবস্থায় মেজাজ ঠিক রাখতে পারে কেউ?

স্যাম টোবি ক্লান্তির চরমে পৌঁছে গেছে। কংগ্রেশনাল ইনভেস্টিগেশনের দাবিও উঠেছে ইতিমধ্যে। অথচ পৃথিবীর প্রতিটি বিখ্যাত রোবট বিজ্ঞানী এবং পদার্থ বিজ্ঞানী জানিয়েছেন হারানো রোবটটি মানুষের জন্যে মোটেই কোনও হুমকি নয়।

স্যাম টোবির মানসিক অবস্থা বিবেচনা করেই তার জেনারেল ম্যানেজার অনেকক্ষণ মুখ বুজে থাকল। কারণ র‍্যানডলফ পেনের খবরটা যে ভুয়া নয় তা সে ঠিকই ধরতে পেরেছে। ভুয়া হলে পেন কী করে জানল হারানো রোবটটার সিরিয়াল নম্বর এ-এল সেভেনটি-সিক্স এবং তাকে লুনার স্টেশন ১৭-তে পাঠানোর কথা? কোম্পানি হারানো রোবটের বিজ্ঞপ্তিতে এত তথ্য দেয়নি।

বসের মাথা একটু ঠাণ্ডা হলে জেনারেল ম্যানেজার ঘটনাটা

খুলে বলল। প্রায় দেড় মিনিট গুম হয়ে বসে থাকল টোবি, তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল কাজে।

ফোন আসা থেকে কাজে নেমে পড়ার আগ পর্যন্ত, ওই তিন ঘণ্টা সময়ের মধ্যে ঘটে গেল আরেকটি ঘটনা। র‍্যানডলফ পেন প্ল্যাণ্ট অফিসারের কাছে মেসেজ দিতে ফোন করতে গিয়েছিল। কিন্তু মাঝপথে অপর পক্ষ লাইন কেটে দিতে সে হতাশ হয়ে নিজের আস্তানায় ফিরে এল। এবার সঙ্গে একটা ক্যামেরা নিয়ে এসেছে পেন। মুখের কথায় বিশ্বাস না করুক, ছবি তো আর মিথ্যা বলবে না।

এ-এল সেভেনটি-সিক্স নিজের কাজ নিয়ে খুবই ব্যস্ত। পেনের কারখানার অর্ধেকেরও বেশি জিনিস সে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেছে। প্রায় দুই একর জমি ভরে গেছে বাতিল লোহার জঞ্জালে। তার মধ্যে উবু হয়ে বসে রোবট রেডিয়ো-টিউব, লোহার পাত, তামার তার আর জং পরা ইস্পাতের টুকরো-টাকরা নিয়ে একমনে কাজ করে যাচ্ছে। পেনের দিকে তার নজর নেই। ওদিকে পেন মাটির ওপর পেট দিয়ে শুয়ে পড়েছে, হাতে ক্যামেরা। দুর্দান্ত কয়েকটা শট নেয়ার অপেক্ষায়।

ঠিক এই সময় ট্রাক নিয়ে অকুস্থলে, রাস্তার মোড়ে এসে হাজির হলো সেমুয়েল অলিভার কুপার। সামনের দৃশ্যটা দেখে মুখ হাঁ হয়ে গেল তার বিস্ময়ে। পেনের কাছে আসছিল সে ইলেকট্রিক টোস্টার নামের মূর্তিমান যন্ত্রণাটাকে নিয়ে। হারামজাদার একটা অভ্যাস হয়েছে রুটি ঢোকালেই লাথি মেরে বের করে দেয়। আর সে রুটির এমন জঘন্য স্বাদ, কহতব্য নয়!

কিন্তু পেনের কুটিরের সামনে এসে টোস্টারের কথা বেমালুম ভুলে ট্রাক ঘুরিয়ে হাঁ-হাঁ করে সে কেন শহরের দিকে ছুটল তা ব্যাখ্যা করার নিশ্চয়ই প্রয়োজন নেই। শরতের ঝকঝকে সকালে, মৃদু-মন্দ হাওয়া খেতে খেতে ধীর স্থির ভাবে গাড়ি চালিয়ে আসছিল কুপার। কিন্তু ফিরতি পথ ধরল সে এমন স্পীডে যে তার ছুটে

পালানো দেখে সহকর্মী ড্রাইভারদের অনেকেই বিস্ময়ে ভুরু কোঁচকাল।

পথে কোথাও স্পীড কমাল না কুপার, প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে তার হ্যাট উড়ে গেল, টোস্টার কোথায় ছিটকে পড়ল তার হদিসও মিলল না। শেরিফ সণ্ডারসের অফিসের দেয়ালে গোত্তা খেয়ে অবশেষে হুঁশে এল কুপার।

বিধ্বস্ত ট্রাক থেকে ওকে কয়েকটা সদয়-হাত নেমে পড়তে সাহায্য করল। পরবর্তী ত্রিশ সেকেণ্ডে হাঁপাতে হাঁপাতে সে কয়েকবার মুখ খুলল কথা বলার জন্য। কিন্তু হাঁ করাই সার, স্বর বেরোল না গলা থেকে।

শেরিফের লোকজন ওকে সুস্থির হতে হুইস্কি দিল, বাতাস করল। শেষে যখন গলা থেকে আওয়াজ বেরুল কুপারের, অসংলগ্ন কথাগুলো ঠিক এমন শোনাল: 'দানব–সাত ফুট লম্বা–বাড়ি ভেঙে চুরমার–বেচারা রেনি পেন...' ইত্যাদি ইত্যাদি।

আস্তে আস্তে কুপারের কাছ থেকে জানা গেল সমস্ত ঘটনা: ওটা ছিল সাত ফুট লম্বা ধাতব এক দানব, আট বা নয় ফুট হওয়াও বিচিত্র নয়, র‍্যানডলফ পেনের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ছিল ওটা: র‍্যানডলফ পেন আহত হয়ে পড়ে ছিল লাশের মত, দরদর করে রক্ত ঝরছিল শরীর বেয়ে। আরও জানা গেল দানবটা পেনের বাড়িতে রীতিমত ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছিল, হঠাৎ সে কুপারের দিকে ঘুরে দাঁড়ায়, আর ভীত সন্ত্রস্ত কুপার এক চুলের জন্যে রক্ষা পায় নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে।

শেরিফ সণ্ডারস তার স্ফীত উদরে বেল্টটা টাইট করে বেঁধে বলল, 'এটা নির্ঘাত সেই যন্ত্র মানব যেটা পিটারসবোরোর ফ্যাক্টরি থেকে পালিয়েছে। এ ব্যাপারে আমাদেরকে ইতিমধ্যে সাবধান করেও দেয়া হয়েছে। হেই, জেক, হ্যানাফোর্ডে যারা বন্দুক ছুঁড়তে জানে তাদের সবাইকে ডেকে নিয়ে এসো। দুপুরের মধ্যে সবার চেহারা এখানে আমি দেখতে চাই। আর কুপারকে তার সাহসী

ভূমিকার জন্যে একটা ডেপুটি ব্যাজ পরিয়ে দাও। আর হ্যাঁ, বেরুবার আগে বিধবা মিসেস পেনের কাছে গিয়ে সুকৌশলে তাকে দুঃসংবাদটা জানিয়ে এসো। বেচারী না জানি আবার কত কান্না-কাটি করে!'

পরে জানা গেল, স্বামীর মৃত্যুর খবর শুনে প্রথমে মিরাণ্ডা পেনের তেমন কোন ভাবান্তর হয়নি। বরং দুঃসংবাদটা পাবার সঙ্গে সঙ্গে সে খবর নিয়েছে স্বামীর ইনসিওরেন্স পলিসিগুলো ঠিকঠাক আছে কিনা। পেন কেন তার পলিসির অ্যামাউন্ট দ্বিগুণ করে যায়নি এ জন্য সে প্রয়াত স্বামীর বোকামো নিয়ে ভর্ৎসনা করতেও ছাড়েনি। শেষে অপঘাতে মরা স্বামীর জন্যে ডাক ছেড়ে কাঁদতে বসেছে।

এদিকে নিজের করুণ মৃত্যু সম্পর্কে সম্পূর্ণ অসচেতন র‍্যানডলফ পেন অত্যন্ত সন্তুষ্টির সাথে তার তোলা ছবিগুলোর নেগেটিভ দেখছে ডার্করুমে বসে। রোবটের কার্যকলাপের চিত্তাকর্ষক দৃশ্যগুলো চমৎকার উঠে এসেছে ক্যামেরায়। এগুলো এখন নানা ক্যাপশন দেয়া যায়। যেমন: 'ভ্যাকুম টিউবের দিকে তাকিয়ে গভীর চিন্তামগ্ন রোবট', 'তার ছিঁড়ে দু'টুকরো করার কাজে ব্যস্ত রোবট', রোবট স্ক্রু ড্রাইভার ওয়েল্ডিং করছে,' 'ভয়ঙ্কর শক্তিতে রিফ্রিজারেটর ভেঙে ফেলছে রোবট', ইত্যাদি ইত্যাদি।

এখন শুধু ছবিগুলো প্রিন্ট করার অপেক্ষা। খুশি মনে নিজের ডার্করুম থেকে বেরিয়ে এল পেন, একটা সিগারেট ধরিয়ে খেজুরে আলাপ জুড়ে দিল এ-এল সেভেনটি-সিক্সের সাথে।

গল্পে মশগুল ছিল বলে র‍্যানডলফ পেন লক্ষ করেনি পাশের জঙ্গল দ্রুত ভরে যাচ্ছে গাঁয়ের কৃষকদের ভিড়ে। তাদের প্রত্যেকের চেহারায় ভয়ের ছাপ স্পষ্ট, হাতে অস্ত্র হিসেবে যে যা পারে নিয়ে এসেছে। দা-খোন্তা আর মান্ধাতা আমলের বন্দুক থেকে শুরু করে পোর্টেবল মেশিনগান পর্যন্ত। অবশ্য ভারী অস্ত্রটা শেরিফ নিজেই

বহন করছে। তার অবশ্য জানা নেই পিটার্সবোরো থেকে ইতিমধ্যে স্যাম টোবি জনা ছয় রোবট বিজ্ঞানী নিয়ে ঘণ্টায় একশো বিশ মাইল বেগে হাইওয়ে ধরে এদিক পানেই ছুটে আসছে। তারও উদ্দেশ্য হারানো রোবটটিকে কজা করা।

ঘটনা যখন গা টানটান করা চরম ক্লাইম্যাক্স-এ পৌঁছুতে যাচ্ছে, র‍্যানডলফ পেন তখন আত্ম-তৃপ্তির ঢেকুর তুলে ধোঁয়া ফুঁকছে আর এ-এল সেভেনটি-সিক্সের দিকে তাকিয়ে আছে কৌতূহলী দৃষ্টিতে।

রোবটটাকে তার খানিক পাগল মনে হচ্ছে। র‍্যানডলফ পেন একান্ত নিজের জন্যে নিত্য ব্যবহার্য যেসব জিনিসপত্র মাঝে মাঝে তৈরি করে, সেসব মানুষকে দেখালে তাদের চোখ কোটর ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইবে। এসব কাজে অত্যন্ত দক্ষ পেন। কিন্তু এ-এল সেভেনটি-সিক্স চোখের সামনে যে জিনিসটি তৈরি করে চলেছে তা পেনের চোদ্দগুষ্টিও পারবে না। রুব গোল্ডবার্গের মত যন্ত্রের যাদুকরও রোবটের কাজ দেখলে ঈর্ষায় খিঁচুনি দিতে দিতে মরে যেতেন। পিকাসো বেঁচে থাকলে চিত্র কলা বাদ দিয়ে দিতেন। কারণ রোবটের দক্ষতার কাছে নিজেকে তাঁর নিশ্চয়ই নস্যি মনে হত।

সত্যি বলতে কী, এমন জিনিস জীবনে দেখেনি পেন। একবার সেকেণ্ডহ্যাণ্ড একটা ট্রাক্টরের গায়ে একটা পুরানো কিন্তু শক্তিশালী আয়রন বেসের ছবি দেখেছিল র‍্যানডলফ পেন। তার চোখের সামনে যেন সেই জিনিসটাই দাঁড় করানো। তবে এটার গায়ে অসংখ্য তার, টিউব, হুইল ইত্যাদি এমনভাবে সংযুক্ত যে গোটা কাঠামোটাকে ভীতিকর ও রোমহর্ষক লাগল। সব মিলে জিনিসটা দেখতে হয়েছে একটা মেগাফোনের মত।

পেনের ইচ্ছে করল মেগাফোনের ভেতরে একবার উঁকি দিয়ে দেখে। কিন্তু নিজেকে সংযত করল সে। অনেক মেশিন কোনও পূর্বাভাস না দিয়েই অকস্মাৎ বিস্ফোরিত হয়েছে, এমন ঘটনা বহু

জানা আছে পেনের, স্বচক্ষে দেখার অভিজ্ঞতাও কম নয়। সে ডাকল, 'হেই, আল।'

মুখ তুলে চাইল রোবট। মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে এক টুকরো পাতলা ধাতব খণ্ড যন্ত্রের ভেতরে ঢোকাচ্ছিল সে। জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে, পেন?'

'এটা কী জিনিস?' দশ ফুট লম্বা পোলদুটোকে দেখিয়ে জানতে চাইল পেন।

'এটা দিয়েই ডিজিণ্টো বানাচ্ছি—তারপর আমার আসল কাজ শুরু করতে পারব। স্ট্যাণ্ডার্ড মডেলের একটা "ইমপ্রুভমেণ্ট" হচ্ছে এটা।' উঠে দাঁড়াল রোবট, হাঁটুর ধুলো ঝাড়ল, শব্দ উঠল ঠন্ ঠন, তারপর গর্বিত নজর বোলাল নিজের সৃষ্টির দিকে।

শিউরে উঠল পেন। ইমপ্রুভমেণ্ট! তা হলে চাঁদে যে জিনিসটা ওরা লুকিয়ে রেখেছে না জানি ওটা আরও কত ভয়ঙ্কর। হায়রে স্যাটেলাইট! তোর দিন শেষ!

'এতে কাজ হবে?'

'অবশ্যই।'

'কী করে বুঝলে?'

'কাজ হতেই হবে। কারণ নিজের হাতে এটাকে বানিয়েছি আমি। এখন শুধু আরেকটা জিনিস দরকার আমার। ফ্ল্যাশলাইট দিতে পারবে?'

'আছে বোধহয় একটা,' বলে চট করে ঘরের ভেতর ঢুকে গেল পেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এল একটা ফ্ল্যাশলাইট নিয়ে।

রোবট ফ্ল্যাশলাইটের তলা খুলে কাজ শুরু করে দিল। পাঁচ মিনিটের মধ্যে শেষ হয়ে গেল কাজ। এক পা পিছিয়ে এল সে। বলল, 'আর কোনও সমস্যা নেই। এখন এটা স্টার্ট দেব। তুমি ইচ্ছে করলে দেখতে পারো।'

প্রস্তাবটার লাভ-ক্ষতি মনে মনে বিচার করে এক মুহূর্ত পরে পেন বলল, 'এটা নিরাপদ তো?'

'একটা বাচ্চাও মেশিনটাকে চালাতে পারবে।'

'তাই!' কাষ্ঠ হাসি হাসল পেন, কাছের সবচেয়ে মোটা গাছটার পেছনে আড়াল নিয়ে বলল, 'শুরু করে দাও। তোমার ওপর আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে।'

এ-এল সেভেনটি-সিক্স ভীতিকর চেহারার লোহা-লক্কড়ের স্তূপটার দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলল, 'তা হলে দেখো!' তার হাতজোড়া এগিয়ে গেল মেশিনের দিকে।

ভার্জিনিয়ার হ্যানাফোর্ড কাউণ্টির কৃষকরা রীতিমত প্রতিরক্ষা ব্যূহ তৈরি করে এগিয়ে আসছে পেনের বাড়ির দিকে। তাদের বৃত্তটা ধীরে ধীরে ঘন হয়ে উঠছে। রক্তে তাদের যুদ্ধের উন্মাদনা জেগেছে, শির দাঁড়ায় বয়ে যাচ্ছে উত্তেজনার স্রোত।

শেরিফ সণ্ডারসের মুখ দিয়ে বিস্ফোরণের মত বেরিয়ে এল শব্দগুলো: 'সংকেত দিলেই গুলি ছুঁড়তে শুরু করবে—একমাত্র লক্ষ্য চোখ।'

জ্যাকব লিঙ্কার, শেরিফের ডেপুটি, তার বসের পাশে চলে এল। 'আপনার কি মনে হয় এই যন্ত্রমানবটা ভেগে যেতে পারে?' ভেগে গেলে যে খুশি হবে সে ভাবটুকু গোপন রাখতে পারল না জেক।

'জানি না,' খেঁকিয়ে উঠল শেরিফ। 'দরকার হলে জঙ্গলেই ওর মুখোমুখি হব আমরা।'

'কিন্তু কারও কোনও সাড়া-শব্দ তো পাচ্ছি না। কেমন অস্বাভাবিক নীরব চারদিক। মনে হচ্ছে পেনের বাড়ির কাছাকাছি চলে এসেছি আমরা।'

ব্যাপারটা মনে না করিয়ে দিলেও চলত। শেরিফ সণ্ডারসের গলায় মস্ত একটা ডেলা বাঁধল, তিন ঢোকে ওটাকে নীচে নামাতে হলো। 'নিজের জায়গায় যাও,' আদেশ করল সে, 'ট্রিগারে আঙুল রেখে প্রস্তুত হয়ে থাকো।'

বনভূমির কিনারায় চলে এসেছে ওরা। চট করে চোখ বন্ধ করে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে পড়ল শেরিফ। কয়েক মুহূর্ত ওভাবেই থাকল সে। কিছুই ঘটল না দেখে অবশেষে চোখ মেলল।

এবার যন্ত্র মানবটিকে চোখে পড়ল তার। শেরিফের দিকে পেছন ফিরে অদ্ভুত দর্শন একটা যন্ত্রের ওপর ঝুঁকে কী যেন করছে রোবট। যন্ত্রটা থেকে হেঁচকি তোলার মত শব্দ উঠছে। শেরিফ দেখতে পেল না অদূরে, আরেকটা গাছের আড়ালে র‍্যানডলফ পেন দাঁড়িয়ে ভয়ে থরথর করে কাঁপছে।

শেরিফ সগুারস বেরিয়ে এল খোলা জায়গায়, মেশিন গান তুলল। গুলি করবে। রোবট তখনও ঝুঁকে আছে, হঠাৎ কাকে যেন চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'এইবার দেখো!' শেরিফ মাত্র মুখ খুলেছে তার দলের লোকদেরকে গুলি করার হুকুম দেয়ার জন্যে, ঠিক সেই সময় ধাতব আঙুল দিয়ে একটা সুইচ টিপে দিল রোবট।

সত্তর জন প্রত্যক্ষদর্শীর উপস্থিতি সত্ত্বেও তারপর কী ঘটল সে বর্ণনা দেয়ার মত কাউকে পরে খুঁজে পাওয়া গেল না। শেরিফ গুলি করার হুকুম দেয়ার জন্যে মুখ খোলার পরে আসলে কী হয়েছে সে সম্পর্কে ওই সত্তর জনের কারুরই পেটে বোমা মেরে একটা শব্দ পর্যন্ত বের করা যায়নি। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর তারা এ ব্যাপারে একেবারে নিশ্চুপ হয়ে থাকল। কেউ প্রশ্ন করলে তাদের চেহারা হয়ে উঠত সবুজ, প্রশ্ন কর্তাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করার সুযোগ না দিয়ে দ্রুত কেটে পড়ত তারা।

তবু, বাতাসে ভেসে বেড়ানো দু'একটা গুজবকে জোড়া লাগিয়ে শেষে যে গল্পটা দাঁড় করানো গেল তা হলো এই:

শেরিফ সগুারস হাঁ করেছিল; এ-এল সেভেনটি-সিক্সও সঙ্গে সঙ্গে টিপে দিয়েছিল সুইচ। কাজ শুরু করে দিল ডিজিন্টো। চোখের পলকে জঙ্গলের পঁচাত্তরটি গাছ, দুটো খড়ের গাদা, তিনটে গরু এবং ডাকবিল মাউন্টেনের তিনটে চুড়ো স্রেফ বাষ্প হয়ে উড়ে

গেল বাতাসে।

শেরিফ সণ্ডারসের হাঁ করা মুখ হাঁ-ই থাকল যেন অনন্তকাল ধরে, কিন্তু হুকুম বা নির্দেশ কিছুই এল না তার কাছ থেকে। তারপর–

তারপর বাতাসে যেন প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি হলো, তীব্র শোঁ-ও-ও-ও শব্দ ভেসে এল, র‍্যানডলফ পেনের বাড়ির ঠিক মাঝখানে ঘন লাল রঙের বিদ্যুৎ চমকে উঠল পরপর কয়েকবার, এবং নিমিষে নেই হয়ে গেল শেরিফ বাহিনী।

শেরিফ বাহিনীর খানিক আগের অবস্থানের চিহ্ন বলতে শুধু পাওয়া গেল মাটিতে ছড়ানো-ছিটানো কতগুলো অস্ত্র, এরমধ্যে শেরিফের নিকেল প্লেটের, এক্সটা র‍্যাপিড ফায়ারের, সহজে বহনযোগ্য মেশিনগানটিও আছে। আরও রয়েছে প্রায় পঞ্চাশটি হ্যাট, কয়েকটি আধ-খাওয়া সিগার এবং আরও টুকিটাকি কিছু জিনিসপত্র। কিন্তু মানুষজনের কোনও চিহ্নই নেই।

তবে শেরিফ বাহিনীর শুধু একজনের খোঁজ পাওয়া গেল বনের মধ্যে। প্রায় অচেতন অবস্থায় পড়ে আছে। সে ল্যাঙ্ক জেক। সম্ভবত সবার পেছনে ছিল বলে আজব ঘূর্ণিঝড় তাকে উড়িয়ে নিতে পারেনি। তবে যেটুকু ধাক্কা খেয়েছে জেক, তাতেই প্রায় কম্ম সাবাড় হতে চলছিল।

তার সন্ধান পেল স্যাম টোবির লোকেরা। তারাও ইতিমধ্যে পিটার্সবোরো থেকে এসে পড়েছে। টোবি রুদ্ধশ্বাসে ল্যাঙ্ক জেককে জিজ্ঞেস্ করল, 'র‍্যানডলফ পেনের বাড়ি কোন্ দিকে?'

এক মুহূর্তের জন্য জেক তার প্রায় নিষ্প্রাণ চোখ জোড়া টোবির চোখে রাখল। তারপর বলল, 'ভায়া, আমি যেদিকে যাচ্ছি না সেদিকে আপনারা যান।'

কী অবাক কাণ্ড! বলতে না বলতে হাপিশ হয়ে গেল ল্যাঙ্ক জেক। দিগন্তে, গাছের ওপরে ক্রমশ ছোট হয়ে আসা বিন্দুটাই হয়তো জেক, অনুমান করল টোবি। তবে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হতে

পারল না। ওদিকে আরও ছোট ছোট বিন্দু দেখা যাচ্ছে, গাছের মগডালে যেন লটকে আছে। টোবির অবশ্য জানার কথা নয় ওরা শেরিফ বাহিনী, ঘূর্ণিঝড় উড়িয়ে নিয়ে ঝুলিয়ে দিয়ে গেছে তাদেরকে ওখানে।

কিন্তু আমাদের র‍্যানডলফ পেনের কী হলো?

সুইচ-টেপার পাঁচ সেকেণ্ড বিরতির পরে সে দেখল ডাকবিল মাউন্টেনের চুড়ো অদৃশ্য হয়ে গেছে চোখের সামনে থেকে। শুরুতে সে বড় বড় গাছের নীচে, ঘন ঝোপের আড়াল থেকে উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছিল; শেষের দিকে দেখা গেল সে গাছের একেবারে মগডালে উঠে গেছে, ঝুলছে ওখানে অসহায়ের মত। কী করে মাটি থেকে পঞ্চাশ ফুট ওপরে উঠে এল পেন জানে না। সে শুধু জানে রোবটটা তার এতদিনের সঞ্চিত সম্পদ একেবারে ধ্বংস করে দিয়েছে। চোখের সামনে থেকে পুরস্কারের টাকার চেহারা মুছে গিয়ে সেখানে উদয় হলো আদালত, পুলিশ, মার্ডার চার্জ, এবং মিরাণ্ডি পেনের ক্রোধে উন্মত্ত চেহারা। বিশেষ করে মিরাণ্ডির চিন্তা তাকে খুবই সন্ত্রস্ত এবং বিচলিত করে তুলল।

মগডাল থেকে কীভাবে নেমে এসেছে জানে না পেন। কারণ রাগে তার শরীর তখন তিড়বিড় করে জ্বলছে। কর্কশ গলায়, ষাঁড়ের মত চেঁচাতে শুরু করল সে, 'এই রোবট! এই হারামজাদা রোবট! তোর ওই অলক্ষুণে জিনিস এক্ষুণি ভেঙে ফ্যাল। চিরদিনের জন্যে ধ্বংস করে দে। তোর সাথে কোনওদিন আমার দেখা হয়েছিল সে কথাও ভুলে যা। তুই আমার কে রে? তোকে আমি চিনি না-জানি না! আমি চাই না এ নিয়ে কোনওদিন তুই কারও সাথে কথা বলিস। সব ভুলে যাবি। আমার কথা কানে ঢুকেছে?'

রোবটা তার আদেশ মানবে তা ভেবে কিন্তু এত কথা বলেনি পেন। গায়ের ঝাল ঝেড়েছে সে। এবং গালি-গালাজ করে এতক্ষণে একটু শান্তও হলো। তবে পেনের জানা ছিল না রোবটরা মানুষের আদেশ সব সময়ই মেনে চলতে বাধ্য। তবে অন্য কোনও

মানুষের ক্ষতি হয় এমন ধরনের আদেশ মানতে শুধু তাদের নিষেধ করা হয়েছে।

এ-এল সেভেনটি-সিক্স শান্ত ভঙ্গিতে র‍্যানডলফ পেনের হুকুম তামিল করল। দেখতে দেখতে ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল ডিজিণ্টো।

পায়ের তলায় শেষ টুকরোটাকেও পিষে গুঁড়ো করে দিচ্ছে রোবট, এমন সময় সেখানে স্যাম টোবি তার দলবল নিয়ে হাজির হয়ে গেল। দূর থেকে র‍্যানডলফ পেন ওদেরকে দেখেই বুঝে ফেলল রোবটের আসল মালিক চলে এসেছে, সে আর দেরি না করে ভোঁ দৌড় দিল যেদিকে দু'চোখ যায়, সেদিকে।

পুরস্কারের কথা বেমালুম ভুলে গেছে সে।

রোবটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার অস্টিন ওয়াইল্ড ঘুরে দাঁড়াল স্যাম টোবির দিকে। 'রোবটটার কাছ থেকে কিছু জানতে পারলেন?'

এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল টোবি, গলার গভীর থেকে ঘোঁৎঘোঁতানি বেরিয়ে এল। 'কিচ্ছু না। একেবারেই কিছু জানতে পারিনি। কারখানা থেকে বেরিয়ে আসার পর থেকে এ পর্যন্ত যা ঘটেছে তার কথা একেবারে ভুলে যাবার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। নইলে ওর স্মৃতিশক্তি এমনভাবে লোপ পেতে পারে না। ভাবছি লোহা-লক্কড়ের জঞ্জাল দিয়ে রোবটটা কী করছিল?'

'আমিও তাই ভাবছি! তবে আমার ধারণা রোবট আসলে একটা ডিজিণ্টো তৈরি করেছিল। পরে আবার ধ্বংস করে ফেলেছে। কোন্ হারামজাদা ওকে ডিজিণ্টো ধ্বংসের আদেশ দিয়েছে যদি জানতে পারতাম! ধরতে পারলে ব্যাটাকে স্লো টর্চারিং করে বারোটা বাজিয়ে দিতাম। আরে, ওদিকে দেখুন তো!'

ওরা বিস্মিত চোখে তাকাল ডাকবিল মাউণ্টেনের দিকে। এখন অবশ্য ওটাকে 'মাউণ্টেন' বলে চেনার উপায় নেই। চুড়োগুলো নিখুঁতভাবে যেন কেউ চেঁছে ফেলেছে।

'ডিজিণ্টো বানিয়েওছিল বটে একখানা!' বলল ইঞ্জিনিয়ার।

‘পাহাড়টাকে একেবারে সমান করে দিয়েছে।’

‘কিন্তু ওটা তৈরি করতে গেল কেন সে?’ কাঁধ নাচাল ওয়াইল্ড। ‘কী জানি! ডিজিণ্টো কীভাবে তৈরি করতে হয় সেই কারিগরি বিদ্যা ওর পজিট্রনিক ব্রেনে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছিল। তবে কেন সে ওটা তৈরি করতে গিয়েছিল তার জবাব বোধহয় কোনওদিনই পাওয়া যাবে না। আমরা ওই ডিজিণ্টোকেও কোনওদিন পাব না।’

‘তাতে কিছু যায় আসে না। রোবটটাকে তো পেয়েছি।’

‘তাতে অনেক কিছুই আসে যায়,’ ক্ষুব্ধ শোনাল ওয়াইল্ডের কণ্ঠ। ‘ডিজিণ্টো নিয়ে কখনও কাজ করেছেন আপনি? ওরা প্রচুর এনার্জি খায়। মিলিয়ন ভোল্টের পোটেনশিয়াল তৈরি না করা পর্যন্ত আপনি তো এ নিয়ে আর কোন কাজই শুরু করতে পারবেন না। তবে এই ডিজিণ্টোর কাজের ধারা ছিল আলাদা। আমি একটু আগে মাইক্রোস্কোপ দিয়ে এটার জঞ্জাল পরীক্ষা করে শক্তির আসল উৎসের কথা জেনে গেছি। জানেন কি আবিষ্কার করেছি?’

‘কী?’

‘এই যে এটা! এ জিনিস দিয়ে কী করে সে এতবড় জিনিস চালাল মাথায় ঢুকছে না আমার।’

অস্টিন ওয়াইল্ড হাতের তালুতে যে জিনিসটা দেখাল স্যাম টোবিকে, যা দিয়ে ডিজিণ্টো মহাশক্তিধর যন্ত্রে পরিণত হয়ে আধ সেকেণ্ডের মধ্যে আস্ত একটা পাহাড় উড়িয়ে দিয়েছে, তা আর কিছুই নয়—একজোড়া ফ্ল্যাশ লাইটের ব্যাটারি!

মূলঃ আইজাক আসিমভ
রূপান্তরঃ অনীশ দাস অপু

দাগী আসামী

'কাউয়া হাউজ' থেকে হোবার্ট শহরের দিকে চাইলে চোখ জুড়িয়ে যায়, এমনই অপরূপ দৃশ্য। পথ চলতি লোকজন প্রায়ই থমকে দাঁড়িয়ে এর সৌন্দর্য উপভোগ করে। হোবার্ট শহরের বুক চিরে সর্পিল গতিতে বয়ে চলেছে ডারওয়েন্ট নদী, স্বচ্ছ-নির্মল নীল আকাশের সাথে পাল্লা দিচ্ছে তার ঘন নীল জলরাশি। কিন্তু কাউয়া হাউজের বাইরে ঘোড়ার মাথায় হাত রেখে যে যুবকটি দাঁড়িয়ে, এসব দিকে তার ভ্রুক্ষেপ নেই। পরনে কর্মজীবীদের পোশাক, মনিবের ঘোড়াদের আর বাগান দেখেশুনে রাখাই তার কাজ। ওর যে উন্নতি হয়েছে, এ অবশ্য তারই প্রমাণ। কেননা যুবকটি এক দাগী আসামী। কারাবাসের প্রায় পুরোটা সময় পার করার পর, জেলখানার বাইরে চাকরি করার যোগ্যতা অর্জন করেছে সে। আগে, আসামী নম্বর ২১৩ ছিল যুবকটি, আর এখন তার একটা নাম আছেঃ রিচার্ড কোল। তারপরও কঠোর পরিশ্রম করতে হচ্ছে ওকে জীবনে। এই মুহূর্তে ভবিষ্যতের চিন্তা করছে, মুখটা জ্বলে উঠল চাবুকের বাড়ি পড়তেই। রাগত ভঙ্গিতে ঘুরে দাঁড়াল ও।

'আমি ইচ্ছে করে মারিনি, বিশ্বাস করো,' সভয়ে চেঁচিয়ে উঠল একটি বাচ্চা মেয়ে। 'ঘোড়ার পিঠে বসা মাছির গায়ে মারতে চেয়েছিলাম। ব্যথা লেগেছে?'

শরীরে ঢিল পড়ল। ট্রুকার বয়স নয় বছর, ওর মনিব উইলফ্রিড প্যাটনের কনিষ্ঠ কন্যা। ঘোড়ার পেছনে জোতা খুদে এক কার্ট, তার আসনে বসে মেয়েটি, গভীর উদ্বেগে লোকটির দিকে চেয়ে।

সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে হ্যাট খুলে নিল যুবক।

'তুমি ওই লোকটার সাথে কথা বলছ নাকি, ট্রুকা?' বাড়ির ভেতর থেকে শোনা গেল এক উচ্চকিত কণ্ঠ। লজ্জা পেয়ে গেল মেয়েটি। 'কথা বললে শোনো না কেন, মিস?'

বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে চেয়ে রয়েছে মহিলা। এই মহিলার বিশ্বাস, সে জীবনে কখনও ভুল করেনি, এখনও করছে না এবং ভবিষ্যতেও করবে না। ভদ্র আচরণ নিজে তো করেই, কেউ না করলে আরও স্পষ্টভাবে সেটা বুঝতে পারে।

প্রথম দর্শনে মহিলাকে শ্রদ্ধার যোগ্য আর কঠোর মনে হলেও, খুঁটিয়ে পরখ করলে বোঝা যায় এককালে সুন্দরী ছিল, তার ভাতিজীর জন্মের অনেক আগে। মিস প্যাটন আসলেও কঠোর আর শীতল মনের মানুষ। তাঁর ভাই আবার সম্পূর্ণ বিপরীত–বন্ধু-বান্ধব নিয়ে ফুর্তি করতে ভালবাসেন।

কিন্তু আসামীদের প্রতি ভয়ানক নিষ্ঠুর তিনি। চোখের সামনে মানুষকে ফাঁসিতে ঝুলতে দেখলেও বিকার হয় না তাঁর, স্বাভাবিকভাবে নাস্তা খেতে বাসায় ফিরে আসতে পারেন। তাসমানিয়ার সমাজে তাঁর যে অবস্থান, সেখানে অভিযুক্তদের জন্য বেদনা অনুভব করার কোন অবকাশ নেই। বলতে কী, জগৎটাকে তিনি দু'ভাগে ভাগ করে নিয়েছেন–অপরাধী আর নিরপরাধ। তাঁর কাছে আসামী যা সাপও তাই। দুটোই মানুষের জন্যে ক্ষতিকর।

মিস প্যাটন তাঁর ভাইয়ের চিন্তাধারার সাথে পুরোপুরি একমত। ট্রুকার মা মারা যাওয়ার পর, ইংল্যাণ্ড থেকে, বাড়ি আগলাতে বোনকে নিয়ে এসেছেন উইলফ্রিড প্যাটন। ভদ্রমহিলা দায়িত্ব বুঝে নিয়ে শীঘ্রিই জেলখানার নিয়ম চালাতে শুরু করলেন বাড়িতে। চাকর-বাকর কিংবা বাচ্চাদের সাধ্য নেই তাঁর আদেশ অমান্য করে। তাঁর অন্যতম কঠোর আইন হচ্ছে, প্যাটন পরিবারের কোন শিশু দাগী চাকরদের সাথে কথা বলতে পারবে না। আইনটা মেনে চলা বড়ই কঠিন, এবং ট্রুকা মানুষের সাথে গল্প করতে

ভালবাসে—ওর কপালে যে এখন শাস্তি জুটবে তাতে সন্দেহ নেই।

মালির সাথে কথা বলা নিয়মবিরুদ্ধ। আগুয়ান ফুফুর উদ্দেশে চেয়ে রয়েছে ট্রুকা, মিস প্যাটন যদিও ওর দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করলেন না।

'উইলফ্রিড, সাথে করে চাকরানি নিয়ে আসছ তো?' ভাইকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি। এটি যুগপৎ প্রশ্ন ও আদেশ। 'এর আগে যেটাকে এনেছিলে সেটা ছিল মাতাল। তার আগেরটা ছিল চোর। কোন্‌টার চেয়ে যে কোন্‌টা খারাপ ঈশ্বর জানেন। শয়তানদের মধ্যে থেকে ভাল কাউকে পাবেই বা কোথায়। যাকগে, আমার মনে হয় এবারে—আ-শিশু-হত্যাকারীদের মধ্যে খুঁজে দেখা যায়।'

ট্রুকা আর আসামীটির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন উনি, ওদের সামনে 'শিশু-হত্যাকারী' উচ্চারণ করতে বেধেছে বলে।

মাথা দোলালেন মি. প্যাটন। বোনের কথা মত, মহিলা কারাগার থেকে আগেও কয়েকবার চাকরানী বাছাই করে এনেছেন তিনি। কেন কে জানে, বোনের চাইতে তাঁর বাছা কাজের লোকেরাই বেশিদিন টেকে। তা ছাড়া, না টিকলে অন্যের ওপর দোষ চাপানোটাও সহজ হয় মিস প্যাটনের পক্ষে।

চমৎকার সেদিনের সকালটা। ঘোড়ায় চড়ার অনুমতি মিলেছে ট্রুকার, এবং রীতিমত ভাল চালাচ্ছে সে, ফলে ওর বাবা আয়েশ করে ধূমপান করতে লাগলেন। মাথায় হাজারও চিন্তা চলছে তাঁর। কখনও কখনও মনে হয় কেন যে মরতে এ তল্লাটে এসেছিলেন। বন্দিদের কথা বলে কী হবে। তিনি নিজেও কি এক ধরনের বন্দি নন? ইংল্যাণ্ডে সরকারি চাকরি করতেন, কেরানীর, বেতন যত দ্রুত বাড়বে আশা করতেন সে হারে বাড়ত না। ফলে, বাধ্য হয়ে সপরিবারে হোবার্ট টাউনে এসে ডেরা বাঁধতে হলো। জেলবন্দিদের মত পোশাক পরেন না তো কী হলো, লোকে স্বর্গের সাথে তাঁর বসতবাড়ির তুলনা করে তাতেই বা কী, আদতে তিনি তো একজন

বন্দি। আহা, এখানকার সমস্ত সৌন্দর্যের বিনিময়েও যদি লণ্ডনের প্রিয় ক্লাবটার সামনে একটুকরো ফুটপাথ পেতেন। মি. প্যাটনের মনে ভারি দুঃখ। বারো বছর ধরে বন্দিদের চাবকানো আর লটকানো দেখতে দেখতে মনটা কেমন জানি হয়ে গেছে তাঁর। বাড়িতেই বা শান্তি কোথায়। বোনটা যেমন জেদী তেমনি আবেগবর্জিত, তাঁর বাচ্চাগুলোও ফুফুর পথ ধরছে। ট্রুকাই যা একটু আলাদা।

আরেকটা সমস্যাও জ্বালাতন করছে তাঁকে। আর এক মাসের মধ্যে রিচার্ড কোল তাঁর চাকরি ছাড়ছে, সমাজে নিজের জায়গা পুনরুদ্ধার করবে সে। গত পাঁচ বছর যাবৎ ২১৩ নং নামে পরিচিত রিচার্ডের শাস্তির মেয়াদ ফুরিয়ে এল প্রায়। এক লোককে আঘাত করার দায়ে তাসমানিয়ায় আসামী হিসেবে পাঠানো হয় রিচার্ডকে। লোকটা রিচার্ডের বোনকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও বিয়ে করবে বলে শাসায়। দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার হচ্ছে, আঘাতটা একটু জোরে হয়ে যাওয়াতে লোকটি অক্কা পায়। ভাইকে বাঁচানোর চেষ্টায়, বিচারে মিথ্যে বলায় ওর বোনকেও দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং অস্ট্রেলিয়ায় অপরাধী হিসেবে চালান করা হয়। এরপর তার কী হয়েছে কেউ জানে না। মি. প্যাটন রিচার্ডের মত দক্ষ কাজের লোককে হাতছাড়া করতে চান না। মেয়াদ পূর্তির আগ দিয়ে লোকটাকে পেয়েছেন, ভেবে মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে তাঁর। রিচার্ড তার ব্যবহার দিয়ে আসলে মেয়াদ কমিয়েছে সাজার। এবং মি. প্যাটন সেজন্য প্রতারিত বোধ করছেন। রিচার্ড মুক্তিপ্রাপ্ত হলে তাকে চাকরিতে রাখবেন কিনা একবারও ভাবছেন না ভদ্রলোক। মুক্ত মানুষদের চাকর-বাকর হিসেবে ভাবতে পারেন না তিনি।

তবে একটা উপায় রয়েছে বটে, আসামী হিসেবে রিচার্ডকে ধরে রাখার, কিন্তু মি. প্যাটন পর্যন্ত ও পথ পরিহার করতে চান। অসম্ভব সব নিয়ম-কানুন মেনে চলেছে এতদিন ধরে লোকটা; ফলে কোনদিনই চাবকাতে হয়নি তাকে। কিন্তু চাবুক পেটা করা হলে

ওর সাজার মেয়াদ বেড়ে যাবে, এবং তাকে মি. প্যাটনের চাকর খেটে যেতে হবে। বেশি কিছু না, এর জন্য চাই খামে পোরা এক টুকরো কাগজ, নিকটবর্তী ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আসামী নিজেই যেটা বয়ে নিয়ে যাবে। মি. প্যাটন কেন চাবকালেন তার কারণ দর্শানোর কোন প্রয়োজন পড়বে না। রিচার্ডকে বেঁধে পেটালেই যথেষ্ট, কোন প্রতিশোধেরও সুযোগ নেই। রিচার্ডকে চাবকালে ও কি বুঝবে না কেন তার মনিব কাজটা করেছেন? বুদ্ধিমান লোক, নিশ্চয়ই উপলব্ধি করবে মনিব তাকে কত ভালবাসেন, হাতছাড়া করতে চান না।

ট্রুকার বাবা এসব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে মেয়েকে নিয়ে জেল গেটে এসে পৌঁছলেন। সাদা দেয়ালে ঘেরা বিশাল এক ফাঁকা বাড়ি, অদ্ভুত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মাঝে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে। ট্রুকা বাবার সঙ্গে ভেতরে ঢুকল, এবং এক লোক, পরনে কয়েদীর ছাই রঙা পোশাক, ঘোড়াটার দায়িত্ব বুঝে নিল।

মি. প্যাটনের কাজটা মোটেই সহজ নয়। বন্দি, তা সে নারী-পুরুষ যে-ই হোক না কেন, সদয় ব্যবহার আশা করতে পারে না তাঁর কাছে। সামনে লাইন বেঁধে দাঁড় করানো মহিলাদের শীতল দৃষ্টিতে জরিপ করলেন তিনি। এদের সবার গায়ে কয়েদীর কুৎসিত পোশাক। কারও কারও চোখে বন্ধুসুলভ দৃষ্টি, কিন্তু মুখ ফিরিয়ে নিলেন মি. প্যাটন। সবাইকে দেখার পর তাঁর পছন্দ স্থির হলো গোমড়ামুখো এক মহিলা আর বোকা-বোকা চেহারার এক তরুণীর ওপর। এরপর নতুন এক মুখ চোখে পড়ল তাঁর, বন্দিদের মাঝে, বৃষ্টিভেজা দিনে উজ্জ্বল সূর্যকিরণ ছড়াচ্ছে যেন যুবতী।

'কে ওটা?' জানতে চাইলেন ভদ্রলোক।

'২৭ নম্বর। অ্যামেলিয়া ক্লেয়ার—শেষ দলটার সাথে এসেছে।'

'ডাকো তো দেখি।'

যৌবনে ট্রুকার বাবা ইতালিয়ান অপেরার মহাভক্ত ছিলেন। ২৭ নম্বর ধীর পায়ে হেঁটে এলে, তার চলন ভঙ্গি, আর অপূর্ব সুন্দর

ধূসর চোখ জোড়া 'সোমনামবুলা' অপেরার আমিনার কথা মনে করিয়ে দিল। এমনই প্রভাব পড়ল তাঁর ওপর যে মহিলা হঠাৎ গান গেয়ে উঠলেও বিস্মিত হতেন না তিনি। বরঞ্চ নিজেও শিস বাজিয়ে সুর ধরতেন। মি. প্যাটন এবার বাস্তবে ফিরে এলেন। জানতে চাইলেন অ্যামেলিয়া কী কী কাজ পারে।

জবাব দিতে খানিক সময় নিল সে। কথা যখন বলল তার অনুচ্চ, নম্র কণ্ঠস্বর চমকে দিল মি. প্যাটনকে। সেলাই-ফোঁড়াইয়ের কাজে নাকি পটু সে। 'আগে আরও অনেক কিছু জানতাম, এখন ভুলে গেছি।' দীর্ঘশ্বাস মোচন করে বলল।

'আমরা পরীক্ষা নেব,' বললেন মি. প্যাটন, স্বভাববিরুদ্ধ মৃদু সুরে। 'আশা করি পস্তাতে হবে না।'

অ্যামেলিয়া তার নিজস্ব পোশাক পরে ফিরে এলে ফের অভিভূত হয়ে গেলেন মি. প্যাটন। অপরূপ এক ভদ্রমহিলা নয় সে কে বলবে? যেনতেনভাবে চুল কাটা সত্ত্বেও ছোট ছোট গোছা কুঁকড়ে ঝুলে রয়েছে মাথার কাছে। কালো জ্যাকেট আর খুদে হ্যাটে চমৎকার মানিয়েছে ওকে। বাড়ি ফেরার পথে লোকজন ঘুরে ঘুরে চাইছে অ্যামেলিয়ার উদ্দেশে, লক্ষ করলেন মি. প্যাটন, অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন।

ওঁরা কাউয়া হাউজে পৌঁছতে, যুবক মালিটি গেট খুলতে ছুটে এল; এবং অভাবিত এক ঘটনা ঘটে গেল এখানে। নতুন কাজের মহিলাকে দেখে অস্ফুট শব্দ করে উঠল রিচার্ড এবং ঘুরে দাঁড়াল মহিলা। পরস্পরের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই স্পষ্ট বোঝা গেল ওরা পূর্ব পরিচিত। পরমুহূর্তে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আবারও গম্ভীর আর বিষণ্ন হয়ে পড়ল দু'জনে। আলগোছে গেট লাগিয়ে দিল রিচার্ড এবং শূন্য দৃষ্টিতে মেঘ দেখতে লাগল অ্যামেলিয়া। মহিলার অনুভূতি চোখ এড়ায়নি মনিবের, উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন তিনি। ব্যাপারটা কী? ২১৩ নং আর ২৭ নং আগেও কোথাও মিলিত হয়েছে নাকি? তিনি বিশ্বাস করেন জেলঘুঘুরা পরস্পরের সঙ্গে

অভিনব পন্থায় যোগসূত্র রক্ষা করে থাকে। যুবক-যুবতী একে অন্যের প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হয়। মি. প্যাটন মনে মনে চাইলেন, সহবন্দি ছাড়া আর কোনরকম সম্পর্ক এদের মধ্যে না থাকুক। হৃদয়বৃত্তির ব্যাপার-স্যাপার সামাল দেয়ার কায়দা তাঁর জানা নেই। কেন কে জানে, রিচার্ডকে চাবকানোর ইচ্ছেটা চেগিয়ে উঠল তাঁর মনে। 'ধ্যেত, কী সব বাজে কথা ভাবছি,' চিন্তাটকে ঝেঁটিয়ে দূর করে দিলেন।

কিন্তু ভাবনাটা পরের ক'সপ্তাহে আরও জেঁকে বসল। তাঁর ছোট্ট মেয়েটি একদিন একটা বই হাতে ছুটে এলে মাত্রা ছাড়াল ভদ্রলোকের দুর্বুদ্ধি।

'বাবা, বাবা, দেখো! ঠিক অ্যামেলিয়ার মত না? স্নো-হোয়াইটের ছবিটা দেখো!'

'ধুর!' বললেন ভদ্রলোক, কিন্তু ছবিটা ঠিকই লক্ষ করলেন। ঠিকই বলেছে ট্রুকা। ছবির চোখজোড়া, মুখের চেহারা অবিকল অ্যামেলিয়া ক্লেয়ারের মত। ওকে এখানে আনাই উচিত হয়নি, ইদানীং মাঝে মাঝেই মনে হয় তাঁর। না, যুবতীর কোন দোষ ধরা পড়েনি। এমনকী তাঁর বোন, যিনি পরিপূর্ণ আনুগত্য দাবি করেন, তিনিও কোন ত্রুটি পাননি মেয়েটির মধ্যে। কিন্তু তবুও, গৃহকর্তাকে বেসামাল করে তুলেছে অ্যামেলিয়া নিজেরই অজান্তে। রিচার্ডের কাজকর্ম যদি হয় যন্ত্রচালিতের মত, তো অ্যামেলিয়ার ভূতের মত নিঃশব্দে। মেয়েটি যখন চুপচাপ ঘরের কাজ করে, তার দিক থেকে দৃষ্টি ফেরাতে পারেন না মি. প্যাটন।

কেটে যাচ্ছে একঘেয়ে দিনগুলো। ডিসেম্বর এসে চলেও গেল। দুই শয়তানের ফাঁদে আটকা পড়েছেন মি. প্যাটন। একটা কানে কানে বলে, 'রিচার্ড কোল ২৭ নম্বরের প্রেমে পড়েছে। তার মুক্তির দিন ঘনিয়ে আসছে। মুক্তি পেলেই তোমাকে ত্যাগ করে চলে যাবে, বিয়ে করবে অ্যামেলিয়াকে। এক আঘাতে সব যাবে তোমার। এত ভাল একটা কাজের লোক হারাবে তুমি, আর তোমার বোন হারাবে

এমন লক্ষ্মী এক চাকরানী। সবচেয়ে বড় কথা, এত বছর বাদে জীবনে যাওবা একটু রূপ-রস ফিরে পেলে তাও উবে যাবে। মেয়েটার চেহারায় কীসের আকর্ষণ বোঝো না তুমি, অথচ ওকে দেখলেই তোমার বুকটা কেমন ধড়ফড় করতে থাকে। ও চলে গেলে সেই আগেকার মত প্রেমহীন হয়ে পড়বে তোমার জীবন, বেঁচে থাকার আনন্দ পাবে না।' এই শয়তানটির কথার জবাবে মি. প্যাটন সদম্ভে বলেন, 'আমি রিচার্ডকে ২৭ নম্বরকে বিয়ে করতে দিলে তো। ও মুক্তি পাওয়া মাত্র ওকে দূরে পাঠিয়ে দেব, আর যাতে ফিরতে না পারে। আর অ্যামেলিয়া এখনও আমার বন্দি। কালই ওকে জেলখানায় পাঠিয়ে দেব, যদি দেখি দু'জনের মধ্যে কিছু নটঘট আছে।'

এ পর্যায়ে দু'নম্বর শয়তানটা কুমন্ত্রণা দেয়: 'অন্য আরেকটা উপায়ে সুন্দরভাবে এর সমাধান করা যায়। রিচার্ড কোলকে বেইজ্জত করো মেয়েটার সামনে। লোকটা আসলেই খুব অভদ্র। কিন্তু ভদ্রমানুষের ভান ধরে থাকে বলে বুঝতে পারো না। ওকে খেপিয়ে তুলতে থাকো, ভুলের পথে পা সে বাড়াবেই। তখন আর কী, আচ্ছা মত চাবকানি দেবে। ঘরের চাকর ঘরেই থাকল। মেয়েটার সাথে কোন সম্পর্ক থেকে থাকলে তাও ভেস্তে গেল। কিন্তু যা করার শীঘ্রি করো, নইলে লোকে বুঝে ফেলবে ওকে আটকানোর জন্যেই কাজটা করেছ তুমি।'

জানুয়ারির এক সন্ধেয়, মি. প্যাটনের ক্লাবে থাকার কথা। কিন্তু তার বদলে, বাগানের ঝোপে ছাওয়া এক অংশে, বেঞ্চিতে বসে ছিলেন তিনি। পরামর্শ করছিলেন দুই শয়তানের সঙ্গে। অলক্ষে কখন রাত নেমে এসেছে–উত্তপ্ত আর অন্ধকার এক রাত, পোকা-মাকড়ের কলতানে ভরপুর। সহসা পেছনে খচরমচর শব্দ উঠল খসে পড়া ডাল-পালার। কাঁধে আলতো স্পর্শ টের পেলেন মি. প্যাটন, পরক্ষণে নরম একখানা মুখ তাঁর গালে গাল ঠেকাল। একজোড়া উষ্ণ ঠোঁট দৃঢ়ভাবে চেপে বসল তাঁর গালে, এবং একটি

কণ্ঠস্বর, অ্যামেলিয়ার, বলে উঠল, 'লক্ষ্মী ডিক, বেশি দেরি করে ফেললাম?'

কেউ যদি বলত, ২১৩ নম্বরের সঙ্গে জীবন বিনিময় করবেন কিনা, তা হলে মৃত্যুকে শ্রেয় মানতেন মি. প্যাটন। কিন্তু এ মুহূর্তে নিজেকে ওই দাগী আসামীটির চাইতে কতই না অধম মনে হচ্ছে। শ্বাস নিতেও ভয় পাচ্ছেন, মেয়েটা বুঝে ফেলে যদি।

তাঁর নীরবতা উৎকণ্ঠিত করে তুলল মেয়েটিকে। 'চুপ করে আছ কেন, ডিক?' অসহিষ্ণু কণ্ঠে জবাব চাইল।

'বলার আছেটাই বা কী?' উত্তর দেন মনিব।

অ্যামেলিয়া তাঁকে আর কথা বলার সুযোগ দিল না। ভয়ার্ত চিৎকার ছেড়ে ঘুরেই দিল দৌড়, যেভাবে এসেছিল তেমনি সহসা, রহস্যময়ীর মত গা ঢাকা দিল আঁধারে।

'লক্ষ্মী ডিক' শব্দ দুটো এরপরও বহুক্ষণ কানে বাজল মি. প্যাটনের। যতবার শুনতে পেলেন ততবারই চাবকে চামড়া তুলে নিতে ইচ্ছে হলো রিচার্ডের। কতভাবেই না চেষ্টা করেছেন ওকে খেপিয়ে তুলতে, কিন্তু কীসের কী—আগের মতই বাধ্য আর নম্র আচরণ করে লোকটা। মনিবকে কোন সুযোগই দিতে রাজি নয় সে। শাস্তির মেয়াদ বাড়ানোয় ওদিকে দিনকে দিন রেগে কাঁই হয়ে উঠছেন মি. প্যাটন। এ মুহূর্তে অবশ্য একটা বুদ্ধি খেলে গেল তাঁর মাথায়। তাঁর আড়ালে তাঁরই চাকরানীর সঙ্গে প্রেম করার মজা টের পাইয়ে ছাড়বেন রিচার্ডকে। শয়তান দুটো এমনই প্ররোচনা দিল, পরদিন সকালে নাস্তার পর রিচার্ডকে ডেকে পাঠালেন তিনি।

'এই চিরকুটটা মি. মের্টনের কাছে নিয়ে যাও। জবাব নিয়ে ফিরবে।'

ঘুণাক্ষরেও কোন সন্দেহ জাগা উচিত ছিল না রিচার্ডের মনে। কেননা, মনিবের চিঠি নিয়ে এর আগে অন্তত বিশবার ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে গেছে সে, কিছুই মাথায় ঠাঁই দেয়নি। কিন্তু আজকের এই সকালটিতে, চিরকুটটা নিতে গিয়ে মড়ার মত ফ্যাকাসে হয়ে গেল

ওর মুখের ভাব। শিউরে উঠল আপাদমস্তক। অন্যান্যবারের মত নীরবে বিদায় নিল না ও। বরঞ্চ ওর দৃষ্টি স্থির হলো মনিবের মুখের ওপর, তার চোখের ভাষায় এমন একটা কিছু ছিল যার ফলে চোখ নামাতে বাধ্য হলেন মি. প্যাটন।

'একটা কথা বলতে পারি, স্যর?' অনুচ্চ, অনিশ্চিত কণ্ঠে শুধাল রিচার্ড।

এরকম পরিস্থিতি, এবারই প্রথম মনিবের মনে হলো, লোকটা দূর হচ্ছে না কেন।

কিন্তু গেল না রিচার্ড। উদ্ধত ভঙ্গিতে, চোখে কোণঠাসা জানোয়ারের দৃষ্টি নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ঠিক সে মুহূর্তে এক মহিলা দু'জনের মাঝখানে এসে দাঁড়াল। অ্যামেলিয়াকে এতখানি জাগ্রত আর প্রাণবন্ত আগে কখও দেখায়নি, মনিবের কাছ ঘেঁষে এল ও–চাকরিতে ঢোকার পর থেকে তাঁর সঙ্গে কোনদিন কথা বলেনি–ভাসা-ভাসা চোখজোড়া মেলে চাইল।

'হুজুর, আপনি ওর প্রতি–আমার ভাইয়ের প্রতি এতটা কঠোর হবেন না দয়া করে। কাল রাতে আমার ভুলের জন্যে ওকে এত বড় শাস্তি দেবেন না।'

'শাস্তি দেব কে বলল?' বললেন মি. প্যাটন। মাথা কাজ করছে না, এতটাই হতবিহ্বল। 'আর ও তোমার ভাই-ই যদি হবে, তো রাতের আঁধারে দেখা করতে গেছ কেন?'

অ্যামেলিয়া এতটুকু নড়ল না। 'দিনের বেলা ওর সাথে কথা বলার অনুমতি কি আছে আমার, স্যর?'

'পুরোটা ব্যাপার আমার ভেবে দেখতে হবে,' বললেন মনিব। ফিরে চাইলেন রিচার্ডের উদ্দেশে। 'ঘোড়া বের করো, আর ওই চিরকুটটা দাও। আমি নিজেই যাব।'

তিন হপ্তা পর। রিচার্ড কোল এখন স্বাধীন মানুষ। এবং চাকরি নেয়ার আট মাসের মাথায়, অ্যামেলিয়া মনিবের কাছে বিনীতভাবে

বিদায় নিতে এল। যে পোশাকে এসেছিল আজও সেটাই ওর পরনে, কিন্তু মস্ত এক পার্থক্য রয়েছে তারপরও—ও-ও এখন মুক্ত। কয়েকখানা কয়েন আর একগাদা সদুপদেশ বিতরণ করলেন মি. প্যাটন ওর উদ্দেশে। বিদায় নিতে তৈরি হলো অ্যামেলিয়া। মুখ ফুটে বলতে পারলেন না মনিব, থেকে যাও। ওর জীবন এখন সম্পূর্ণভাবেই ওর। ইংল্যাণ্ডের রাণীর চাইতে কোন অংশে কম নয় ওর মানবাধিকার। কাউয়া হাউজের ধুলো এখুনি পা থেকে ঝেড়ে ফেলতে চাইলে কিছু বলার নেই। কিন্তু ও যদি একটু বুঝত, মনিবের অনুভূতির কি দাম দিত না? ওকে মনের কথা কিছুই না জানিয়ে বিদায় দেয়াটা খুবই কষ্টকর ঠেকছে মি. প্যাটনের কাছে। শয়তানদের খপ্পরে ওর জন্যই কি পড়েননি তিনি? ওর জন্যই কি মস্ত বড় এক অপরাধের হাত থেকে বাঁচেননি? তিনি যে এখন আসামীদের প্রতি সহানুভূতিশীল সে জন্য কি অ্যামেলিয়া দায়ী নয়? সব কথা খোলসা করলে মেয়েটি নিশ্চয়ই উপলব্ধি করবে তাঁর মনের অবস্থা। কিন্তু সে যে অসম্ভব। মুখ ফুটে ভালবাসার কথা বলতে পারবেন না তিনি।

কাজেই অ্যামেলিয়া ক্লেয়ার নীরবে বিদায় নিল তাঁর জীবন থেকে।

ও চলে গেছে দু'হপ্তা। আগস্টের এক ঠাণ্ডা সন্ধেয় লাইব্রেরিতে বসে ছিলেন মি. প্যাটন। বিমর্ষচিত্তে ধূমপান করছেন, এমনি সময় একটা চিঠি এল। লেখাটা খুদে খুদে আর ভারি সুন্দর। পরিচিত লাগল তাঁর চোখে। খাম খুলে পড়লেন তিনি।

জনাব,

সবিনয়ে জানাচ্ছি গত সপ্তায় রিচার্ড কোলের সাথে আমার বিয়ে হয়ে গেছে। বুঝতেই পারছেন, ও আমার ভাই নয়। আপনাকে আমার হবু স্বামী সম্পর্কে ভুল না বুঝিয়ে উপায় ছিল না। ওর খোঁজে অস্ট্রেলিয়া এসেছিলাম। ওর জন্যে স্বেচ্ছায় আবারও নির্বাসনে যেতে রাজি আছি আমি। নিশ্চয়ই বুঝবেন, হবু স্বামীর

জীবন বাঁচাতে মিথ্যে বলতে বাধ্য হয়েছি। আমাকে ক্ষমা করবেন আশা করি।

আপনার বাধ্যগত
অ্যামেলিয়া কোল্

আসামীদের প্রতি মি. প্যাটনের আকস্মিক সহৃদয়তায় ছেদ পড়ল। আগের চাইতেও নিষ্ঠুর এখন তাঁর ব্যবহার। তাসমানিয়ায় নির্দয়তার জন্য কিংবদন্তী হয়ে আছেন তিনি।

মূলঃ জেসি কুভরিয়ার (তাসমা)
রূপান্তরঃ কাজী শাহনূর হোসেন

শুধুই...ফেনা

সেলুনে প্রবেশ করার সময় কিছুই বলেনি সে। চামাটিতে আমি আমার সবচেয়ে ভাল ক্ষুরটা ধার দিচ্ছিলাম। তাকে যখন দেখতে পেলাম তখনই ভয়ে কেঁপে উঠলাম আমি।

সে অবশ্য আমার কাঁপুনি লক্ষ করল না।

ভয় দূর করার জন্য ক্ষুরে শান দেওয়ার কাজটা চালিয়ে যেতে লাগলাম। ক্ষুরটা কেমন ধারালো হয়েছে তা বুড়ো আঙুল দিয়ে পরখ করে নিয়ে আলোর দিকে তুলে ধরলাম।

ঝিকিয়ে উঠল সেটা।

আর ঠিক এসময় সে তার বুলেট খচিত বেল্টে ঝোলানো হোলস্টারের ঢাকনা খুলে পিস্তলটা দেখল। তার পিস্তলসহ বেল্টটা খুলে দেয়ালের একটা পেরেকে ঝুলিয়ে দিয়ে উপরে সামরিক হ্যাটটা রাখল।

ফিরল আমার দিকে। টাইয়ের নট ঢিলা করে বলল, 'নরকের মত গরম পড়েছে। জলদি শেভটা করে দাও।' বলে চেয়ারে বসল সে।

আমার হিসাবে চারদিনের দাড়ি তার মুখে।

আমার সন্ধানে সর্বশেষ অভিযানের চারদিন পেরিয়ে গেছে।

রোদ্দুরে পুড়ে লালচে হয়ে গেছে তার মুখ।

সাবধানে ফেনা তৈরির কাজ শুরু করলাম আমি। সাবানের কয়েকটা ছোট টুকরো বাটিতে ফেললাম। সামান্য কুসুম গরম পানি তাতে ঢেলে ব্রাশ দিয়ে নাড়তে লাগলাম।

সঙ্গে সঙ্গে ফেনা উঠতে শুরু করল।

'দলের অন্য সবার মুখেও এমন বড় বড় দাড়ি হয়েছে।'

কোনও কথা বললাম না আমি। ব্রাশ নাড়তেই থাকলাম।

'কিন্তু জানো, আমরা সব ঠিক করে ফেলেছি। ওদের দলের প্রধানদের জ্যান্ত ধরেছি। বেশ কয়েকজনকে পেয়েছি মৃত অবস্থায়। কয়েকজন এখনও বেঁচে আছে। তবে শীঘ্রিই তারা মারা যাবে।'

'কয়জনকে পাকড়াও করেছেন আপনারা?' মুখ খুললাম আমি।

'চৌদ্দজনকে। ওদের ধরতে বেশ ধকল পোহাতে হয়েছে আমাদের। জঙ্গলের গভীরে যেতে হয়েছিল। এটা আনন্দের যে, কাজের কাজ করে এসেছি আমরা। জঙ্গল থেকে একজনও প্রাণ নিয়ে বেরিয়ে আসতে পারেনি, একজনও না।'

চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিল সে আমার হাতে ফেনা মাখানো ব্রাশ দেখে। এখনও তাকে চাদর পরাইনি আমি।

কোনও সন্দেহ নেই তাকে দেখে হকচকিয়ে গেছি আমি।

একটা সাদা চাদর নিয়ে খদ্দেরের গায়ে চড়ালাম। কথা থামায়নি সে, হয়তো ভেবে নিয়েছে তাদের দলের প্রতি সহানুভূতিশীল আমি।

সে বলল, 'সেদিন তার শহরের যে অবস্থা আমরা করেছি তাতে নিশ্চয় একটা শিক্ষা হয়েছে। তাই নয় কি?'

'হ্যাঁ।' তার ঘর্মাক্ত ঘাড়ে কাপড়ের গিঁটটা শক্ত করে বেঁধে উত্তর দিলাম।

'ওহ্! কাজটা করে দারুণ মজা পেয়েছি।'

'খুব ভাল।' ব্রাশ নেওয়ার জন্য পিছনে ফিরে উত্তর দিলাম আমি।

ক্লান্তির ভাব করে চোখ মুদল লোকটা এবং সাবানের ঠাণ্ডা আদরের জন্য অপেক্ষা করছে।

আমার এত কাছে তাকে আগে কখনও পাইনি।

স্কুলের সামনের চত্বরে যেদিন চারজন বিদ্রোহীর ফাঁসি দেয়ার জন্য শহরের প্রত্যেককে জমায়েত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, সেদিন এক মুহূর্তের জন্য তার মুখোমুখি হয়েছিলাম আমি।

একটু পরেই যে মুখটা আমি হাত দিয়ে স্পর্শ করতে যাচ্ছি, যার আদেশে প্রাণ দিতে হয়েছিল জলজ্যান্ত চারটা মানুষকে–সেই লোকটির মুখ দেখতে সায় দেয় না আমার মন।

এই মুখটা বড় অসুখকর।

দাড়ির কারণে তাকে স্বাভাবিকের চেয়ে বয়স্ক দেখাচ্ছে। তাতে মন্দ লাগছে না।

তরেশ ওর নাম।

ক্যাপ্টেন তরেশ।

মানুষটা কল্পনা করতে জানে বটে!

কল্পনা করতে যদি না-ই পারত তা হলে বিদ্রোহীদের ফাঁসিতে ঝুলিয়ে তাদের যন্ত্রণায় ছটফটরত দেহের বিশেষ বিশেষ অঙ্গ তাক করে ফায়ার করতে বলত?

তার মুখে সাবান মাখাতে শুরু করলাম আমি।

সে চোখ বন্ধ রেখেই বলল, 'আজ বিকালে অনেক কিছু করব।'

ফেনা মাখানো বন্ধ করলাম আমি। যেন কোনও কৌতূহল নেই এমন একটা ভাব করে বললাম, 'ফায়ারিং স্কোয়াড?'

'ব্যাপারটা ওই রকমেরই। তবে ছোটখাটো বৃষ্টি, মুষলধারে নয়।'

আবার তার মুখে সাবান মাখাতে লাগলাম।

আমার হাত কাঁপতে শুরু করল ভয়ে।

আমার হাত যে কাঁপছে তরেশ তা বুঝতে পারল। এই বুঝতে পারাটা আমার জন্য কল্যাণকর ছিল।

আমি মনে-প্রাণে চাইতাম, তরেশ যেন কখনও আমার দোকানে না আসে। কিন্তু পূর্ণ হয়নি আমার চাওয়া। সে দোকানে এসে আজ হাজির হয়েছে। অপেক্ষা করছে সুন্দর একটা শেভ নেওয়ার জন্য।

আমি জানি, আমাদের দলের অনেকেই তরেশকে দোকানে ঢুকতে দেখেছে। একজনের ছাদের নীচে শত্রুর অবস্থান নানা রকমের শর্ত আরোপ করে।

অন্য যে কোনও কাস্টমারের মত তরেশ ব্যাটার দাড়ি আমি সাবধানে ও যথেষ্ট যত্ন নিয়ে কামাতে পারি, যাতে দাড়ির কোনও গোড়া থেকে এক ফোঁটাও রক্ত বের না হয়।

সাবধানে থাকব লোমের কোনও গোছা যেন ক্ষুরকে বিপথে ঠেলে না দেয়। তার ত্বক পরিষ্কার। নরম ও স্বাস্থ্যকর দেখাবে–যাতে আমার হাতের পিঠ চালালে একটা রোমও না বাধে।

উল্টোদিকে...

হ্যাঁ, একজন গোপন বিদ্রোহী আমি।

আবার একজন বিবেকবান নরসুন্দরও।

এই পেশার যথার্থতা নিয়ে অহঙ্কার আছে আমার। আর চারদিনের ওই দাড়ি তো যথার্থ চ্যালেঞ্জ আমার জন্য।

এবার ক্ষুর তুলে নিয়ে কাজ শুরু করলাম আমি।

তরেশের দাড়ি রুক্ষ এবং শক্ত।

বেশি লম্বা নয়।

কিন্তু বেশ ঘন।

খসখস করে চলে আমার ক্ষুর।

একটু একটু করে উন্মুক্ত হয় চামড়া।

ক্ষুরে লেগে থাকা লোম ফেনার সঙ্গে মিশে যায়।

এক মুহূর্তের জন্য থামি আমি। চামাটি তুলে নিই ক্ষুরটা আবার শানিয়ে নেওয়ার জন্য। কারণ, আমি এমন এক নাপিত যে

কিনা তার কাজ চমৎকারভাবে সম্পন্ন করতে চায়।

চোখ খুলল তরেশ। চাদরের নীচ থেকে বের করে আনল একটা হাত। মুখের যে অংশ পরিষ্কার করা হয়েছে তাতে হাত বুলিয়ে নিয়ে বলল, 'আজ ছয়টায় স্কুল চত্বরে এসো।'

'অন্যান্য দিনের মত সেই একই ঘটনা?' ভয়ার্ত গলায় বললাম আমি।

'হ্যাঁ।'

'আপনাদের প্ল্যান কী?'

'সঠিক জানি না। প্ল্যান করিনিও কোনও। তবে এটুকু বলতে পারি, আমরা এখানে অনেক ফুর্তি করব।' বলে আবার সে চোখ মুদল।

হাতে ক্ষুর তুলে নিতে নিতে শঙ্কিত আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'ওদের সবাইকে শাস্তি দিবেন?'

'হ্যাঁ, সবাইকে।'

তার মুখে দেওয়া সাবানের ফেনা ক্রমেই শুকিয়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি শেভ শেষ করার জন্য আমাকে তাড়া দিল সে, 'জলদি শেষ কর।'

আয়নার মধ্যে দিয়ে রাস্তার দিকে তাকালাম আমি। সেই আগের মতই দু'তিনজন কাস্টমার নিয়ে মুদির দোকানটা চলছে। ঘড়ির দিকে নজর দিতে দেখতে পেলাম, দুপুর দুটো পঁচিশ।

আবার শুরু করলাম কাজ।

ক্ষুর চালাতে লাগলাম নীচের দিকে।

এবার অন্য গালে।

তরেশের উচিত ছিল কবি বা পুরোহিতদের মত দাড়ি কিছুটা বড় হতে দেওয়া। ভাল মানাত তাকে। কিছু কিছু মানুষ তাকে দেখেও চিনতে পারত না। এতে তার সুবিধা হত।

ওর কণ্ঠার উপরের লোম নরম হলেও একটু পাক দিয়ে

উপরের দিকে উঠেছে। কোঁকড়ানো দাড়ি। ওস্তাদের মত এখানে ক্ষুর চালাতে হবে। তা না হলে অন্তত একটা লোমকূপের চামড়া হলেও কেটে গিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসতে পারে।

লাল রক্ত।

ভাল একজন নাপিত হিসাবে আমার অহঙ্কার আছে, কোনও কাস্টমারের বেলায় যেন এমন কিছু না ঘটে। আর ইনি তো প্রথম শ্রেণীর কাস্টমার।

ভি.আই.পি।

আমাদের কতজনকে যে গুলি করার অর্ডার দিয়েছে সে!

আমাদের কতজনকে ক্ষত-বিক্ষত করেছে?

এসব নিয়ে চিন্তা না করাটাই বোধহয় ভাল হবে। আমি তো আর চিন্তাবিদ নই যে চিন্তা চালিয়ে যাব!

তরেশ জানে না আমি তার একজন শত্রু।

বাকিরাও জানে না।

এটা এমন একটা গোপনীয় ব্যাপার যা মাত্র হাতে গোনা কয়েকজনের জানা। যেমন একা একাই আমি বিদ্রোহীদের খবর দিতে যাই, শহরে নাদান তরেশটা কী করছে এবং কোন্ ধরনের প্ল্যান করে কখন বিদ্রোহীদের শিকার করার জন্য বের হবে অভিযানে।

সুতরাং বিদ্রোহীদের বোঝাতে বেশ কষ্ট হবে হাতের মুঠোয় জানোয়ারটাকে পেয়েও কেন প্রাণ নিয়ে চলে যেতে দিয়েছি।

দাড়ি কামানো প্রায় শেষ।

তরুণ তরুণ দেখাচ্ছে ওকে।

আমার ক্ষুরের স্পর্শে নবযৌবন পেয়েছে তরেশ।

নবযৌবন পাওয়ার কারণ এই আমি।

বলতে দ্বিধা নেই, শহরের মধ্যে সবচেয়ে দক্ষ এবং ভাল নরসুন্দর আমি।

একটু বেশি ফেনাই পড়েছে তার কণ্ঠমণি ও রক্তের ধমনীতে।

বাবারে, কী গরমটাই না পড়েছে!

আমার মতই তরেশ ঘামছে নিশ্চয়?

কিন্তু সে তো আমার মত ভয়ার্ত নয়। সে ঠাণ্ডা মেজাজের মানুষ। আজ বিকালে বন্দিদের নিয়ে কী করা হবে তাও সে ভেবে রাখেনি। ভাববে উপযুক্ত সময়ে।

চট জলদি।

চমকপ্রদ ভাবনা।

শিউরে ওঠার মত।

এদিকে আমি অতি সাবধানে ক্ষুর চালিয়ে যাচ্ছি যেন লোমকূপ থেকে এক বিন্দু রক্তও বের না হয়। তরেশকে খুন করার কথা পরিষ্কার ভাবে চিন্তাও করতে পারছি না।

কারণ...

আমি খুনি নই।

আমি একজন বিদ্রোহী।

ক্যাপ্টেন ব্যাটাকে যদি হত্যা করতে চাই, তা কত সহজেই না করা সম্ভব! ওর তো যোগ্য শিক্ষা পাওয়া উচিত।

তাই নয় কি?

কেউ চায় না কাউকে খুন করে নিজেকে মারতে। মানুষ খুন করে কী লাভ হয় এর?

তুই কি পারবি একটা মানুষ সৃষ্টি করতে?

জীবন দান করতে?

বলা যায় না, তরেশের গলাটা আমি কেটেও ফেলতে পারি। অভিযোগ করার সুযোগ দিব না ওকে। ন্যূনতম সময়ও না। আসামীদের অভিযোগ করার সুযোগ দিতে নেই, দিতে হয়ও না।

হারামজাদাটা যেহেতু চোখ বন্ধ করে রেখেছে সেহেতু ক্ষুরের চকচকে ফলা এবং আমার উত্তেজনায় চিকচিকে চোখ ও দেখতে পাবে না। পেশাদার খুনিদের মত উত্তেজনায় কাঁপছি

আমি।

তরেশের গলায় ক্ষুর চালালে কি রক্তের ফোয়ারা ছিটকে চাদরে, চেয়ারে, আমার হাতে এবং মেঝেতে গিয়ে পড়বে?

গলা কাটার আগে সেলুনের দরজাটা অবশ্য বন্ধ করে নিতে হবে।

তারপরেও মেঝেতে পড়ে রক্তের স্রোত ইঞ্চি ইঞ্চি করে গড়িয়ে যাবে, দরজার নীচের ফাঁক গলে চলে যাবে রাস্তা পর্যন্ত।

তরেশের গলায় এমনভাবে ক্ষুর চালাব যাতে ক্ষুরের ফলা ওর গলার গভীর পর্যন্ত সেঁধিয়ে যায়। যন্ত্রণায় চিৎকার দিতে পারবে না।

কিন্তু, ওর লাশটা আমি কী করব?

কোথায় নিয়ে লুকাব?

ওকে খুন করার পর সবকিছু ছেড়ে ছুড়ে আমাকে পালিয়ে যেতে হবে। দূরে, দূরে এবং বহুদূরে গিয়ে আশ্রয় নিতে হবে। মোট কথা ফেরারী হতে হবে।

কুকুর যেমন শেয়ালকে তাড়া করে তেমনি তরেশের বাহিনী তাড়া করবে আমাকে। লেজ গুটিয়ে পালাতে থাকা আমায় এক সময় ধরেও ফেলবে। তারা বলবে, 'তুই ক্যাপ্টেনের হত্যাকারী। তুই একটা কাপুরুষ! না হলে কি শেভ করতে গিয়ে তুই তার গলা ফাঁক করে দিতি?'

ব্যাপারটা মোটেও সুখকর নয়।

রীতিমত লজ্জাজনক।

অন্যদিকে বিদ্রোহীরা বলবে, 'আমাদের সবার হয়ে সে ক্যাপ্টেন তরেশের উপর প্রতিশোধ নিয়েছে। তার নামটা স্মরণযোগ্য। (এই পর্যায়ে তারা আমার নাম উল্লেখ করবে।) সে আমাদের আদর্শের মহান রক্ষক।'

এসবের মানে কী, কেউ কি বলতে পারেন?

একজন খুনি নাকি মহানায়ক?

আমার নিয়তি এই ক্ষুরের ধারের সাথে বাঁধা। হাতটা একটু ঘুরিয়ে ক্ষুরে বাড়তি চাপ প্রয়োগ করে লোকটাকে আমি হত্যা করতে পারি। গলার নরম চামড়া রেশমের মত দেবে যাবে ক্ষুরের ধারাল ফলার চাপে।

পৃথিবীতে মানুষের চামড়ার মত এমন কিছু নেই যার ভিতরের রক্ত সর্বদা মুখিয়ে থাকে বাইরে বেরিয়ে আসার জন্য। কাটা-কুটির কাজে আমার এই ক্ষুর কখনও হেরে যাবে না।

থাকবে তালিকার এক নাম্বারে।

কিন্তু না, জনাব, আমি হত্যাকারী হতে চাই না। আমি নরসুন্দর মানুষ। সম্মানের সাথে আমি আমার কাজ শেষ করতে চাই। রক্ত দিয়ে আমার হাত আমি কলুষিত করতে চাই না। শুধুই ফেনা...এই তো সব।

তুই তরেশ একজন ঘাতক। আর এই আমি কেবলই একজন নাপিত। কাজের ছকে প্রত্যেকেরই নিজস্ব একটা পজিশন আছে। আছে, ছিল এবং থাকবে।

ক্যাপ্টেনের চিবুক এখন ঝকঝকে পরিষ্কার এবং মসৃণ দেখাচ্ছে। উঠে দাঁড়াল সে। আয়নার দিকে তাকিয়ে দেখল নিজেকে। দু'হাত ত্বকে ঘষে নিয়ে মুখে ফুটিয়ে তুলল আনন্দের হাসি।

আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ক্যাপ, পিস্তল ও বেল্ট নেওয়ার জন্য দেয়ালের দিকে এগিয়ে গেল। ওর তুলনায় নিশ্চয় পাণ্ডুর দেখাচ্ছে আমাকে! গায়ের শার্ট ঘামে ভিজে সপসপে।

তরেশ কোমরে বেল্ট পেঁচিয়ে তাতে পিস্তল ভরা হোলস্টারটা ঝুলাল। মাথায় ক্যাপ চড়িয়ে পকেট থেকে টাকা বের করে আমার পয়সা চুকিয়ে দিল।

দোকান থেকে বেরিয়ে যেতে গিয়েও দরজার কাছে থমকে দাঁড়াল সে। আমার দিকে তাকিয়ে ভাবলেশহীন মুখে বলল, 'ওরা বলেছিল, আমাকে নাকি তুমি হত্যা করবে। কিন্তু, মানুষ খুন করা

সহজ কাজ নয়। জেনে রেখ, সবাই মানুষ খুন করতে পারে না।’

আর কোনও কথা না বলে রাস্তায় নামল সে।

তার পায়ের তোড়ে রাস্তার ধুলো উড়তে লাগল।

মূল এরানদো তাজেশ

অনুবাদ মোঃ শাওন হোসেন রাজু

[বিঃ দ্রঃ এরানদো তাজেশ কলাম্বিয়ান লেখক। Dond J A yates তাজেশের এই গল্পটি ইংরেজিতে রূপান্তরিত করেছেন। এবার বাংলায় অনূদিত হলো।]